সেকালের দারোগার কাহিনী

অলোক রায় অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত



পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৫৭

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
প্রবীর সেন

মুদ্রাকর
শীতল চক্রবর্তী
শ্রীনারায়ণ প্রিন্টার্স
৩/১বি মোহনবাগান লেন
কলকাতা-৭০০০০৪

ভূমিকা

আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা—সাহিত্যের এই দুটি ধারার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকলেও রচনার উদ্দেশ্য ও উপায়ের দিক থেকে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। আত্মজীবনীতে পাই ব্যক্তিজীবনের ধারাবাহিক বিবরণ এবং সর্বদা না হলেও সেখানে কখনও মেলে লেখকের অন্তর্জীবনের পরিচয়। আত্মজীবনীও স্মৃতিনির্ভর, কিন্তু স্মৃতিকথার মতো বহির্মুখী রচনা নয়। স্মৃতিকথায় লেখক অনেকটাই প্রচ্ছন্ন, সেখানে পরিপার্শ্ব এবং বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনা বা চিত্র প্রাধান্য পায়। অবশ্য আত্মজীবনীর মধ্যেও কখনো দেশ-কালের বিচিত্র ছবি ধরা পড়ে, ব্যক্তিজীবন তখন বৃহত্তর সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঐতিহাসিক তাৎপর্য লাভ করে। বাংলা দেশে উনিশ শতক থেকে আত্মজীবনী লেখা সুরু হয়েছে, যার সঙ্গে নবজাগ্রত ব্যক্তিচেতনার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। স্বতন্ত্রভাবে স্মৃতিকথা লেখার প্রয়াস তুলনায় কম। অবশ্য আত্মজীবনীর মধ্যেই দেখা গেছে দুই ধারার সংযোগ-সংমিশ্রণ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বরচিত জীবন চরিত' (১৮৯৮) 'তাঁহার বাল্যেই ধর্ম্মানুরাগ, তাঁহার বৈরাগ্য, উপনিষদ্ শিক্ষা, ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ ও সমাজ গঠন, ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রণয়ন, পরলোক ও মুক্তি এবং শিমলা ভ্রমণাদি অনেক বিষয় নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশের জন্য মূল্যবান, কিন্তু সেখানে অন্য প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত। অন্যদিকে কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'আত্ম-জীবনচরিত' (১৯০৪) 'বিশিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র, চিন্তা এবং কার্য্যাবলী সংশ্লিষ্ট হইলেও, ইহাতে বঙ্গের পঁচাত্তর বৎসর ব্যাপী সামাজিক ইতিহাস প্রতিফলিত।' নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন'ও (১৯০৮-১৩) আত্মকথা ও স্মৃতিকথার সম্মিলিত রূপ। তবু এগুলিকে যথার্থ স্মৃতিকথা বলা যায় না, ইউরোপে যে-ধারা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে এবং বাংলা সাহিত্যেও সম্প্রতিকালে যার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।

স্মৃতিকথার সাহিত্যিক মূল্য কম না হলেও, নিছক সাহিত্যকর্ম হিসাবে সাধারণত স্মৃতিকথাকে বিচার করা হয় না। ইউরোপে স্মৃতিকথার একাধিক শিল্পরূপ প্রচলিত—ডায়রি, জার্নাল, ট্রাভেল্স থেকে সুরু করে উপন্যাসের আঙ্গিকও গ্রহণ করা হয়। তবে সবচেয়ে প্রচলিত রূপ হলো কাহিনী ও

চরিত্রের সাহায্যে আখ্যান রচনা। বলাবাহুল্য, সাহিত্যিকের লেখা স্মৃতিকথা অনেক পরিমাণে সাহিত্য লক্ষণাক্রান্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্মৃতিরসে জারিত হয়ে যখন সাহিত্যের উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তার মধ্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। কালগত দূরত্ব এমনিতেই প্রত্যক্ষতা বিরোধী, কবির ভাষায় 'Distance lends enchantment to the view.' সেই সঙ্গে বিস্মৃতির ভূমিকাও স্বীকার্য। স্মৃতি থেকে যে অংশ হারিয়ে যায়, সেই অংশ লেখক কল্পনা দিয়ে ভরে নেন। পরিণত বয়সে নিজের শৈশব-যৌবনের পরিচয় দিতে গেলে তাই নানা ধরনের বিকৃতি তথা প্রক্ষেপ অনিবার্য হয়। আসলে অসম্পূর্ণ চিত্রকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা, পরিণত বয়সের চিন্তা ও মতামতের প্রভাব, কিছু গোপন করা বা ইচ্ছাপূরণের প্রয়োজনে সংযোজন করা ইত্যাদি পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না।

তাই সাহিত্য হিসাবে স্মৃতিকথা উপভোগ্য হলেও, ইতিহাসের উপাদান হিসাবে তা কতটা গ্রাহ্য বিচার করে দেখা প্রয়োজন। স্মৃতিকথার মধ্যে বিশেষ একটি দেশকাল জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ লেখকের অভিজ্ঞতা নির্বিশেষ সমাজের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য পেতে পারে। স্মৃতিকথায় লেখক যেখানে একান্তভাবে নিজের কথা বলছেন না, সেখানে তা অন্য অনেকের কাহিনী হিসাবে মূল্যবান হতে পারে। কিন্তু সব সময় স্মৃতিকথা সমান নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্মৃতিকথাকে তাই ইতিহাসের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজিতে প্রচুর স্মৃতিকথা লেখা হয়, যার মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছে রবার্ট কেরী, আর্ল অফ মনমাউথ, রেরিসবি, কেনেল্‌ম ডিগবি, অ্যাণ্টনি হ্যামিল্‌টন, লেডী ফ্যান্‌শ', মিসেস হাচিনসন্‌ এবং ডাচেস অফ নিউক্যাসল্‌-এর রচনা। কিন্তু রচনারীতি ও ঐতিহাসিক মূল্যের দিক থেকে এগুলি একই জাতের লেখা নয়,—ডিগ্‌বি তাঁর *Private Memoirs*-এ পরিচিত ব্যক্তিদের ছদ্মনামে উপস্থিত করে যথেচ্ছ কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন; অ্যাণ্টনি হ্যামিল্‌টনের স্মৃতিকথা 'কেচ্ছাকাহিনী' হিসাবে উপভোগ্য হলেও ইতিহাসের ধার দিয়েও যায় নি; লেডী ফ্যান্‌শ'র লেখা কিছুটা উদ্দেশ্যহীন হলেও, এবং সালতারিখের ব্যাপারে অনির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যুগচিত্র

হিসাবে মূল্যবান ; ডাচেস অফ নিউকাস্‌ল্‌ ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় না দিলেও পরিপার্শ্বকে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য অনস্বীকার্য। আসলে স্মৃতিকথা থেকে আমরা অনেক কিছু পেতে পারি, কিন্তু তার উপর একান্ত নির্ভরতা বিপজ্জনক। নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' গ্রন্থে, যা ঘটেছে এবং যা ঘটতে পারে, দুয়ের একত্র পরিবেশন অনেক সময়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। তবু এই ধরনের আত্মকথায় যেটুকু পরিপার্শ্ব-স্মৃতি পাওয়া যায় তা কম মূল্যবান নয়। রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' (১৮৬৯ ?), রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (১৯০৯), অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'পিতা পুত্র' (১৯০৪ ,, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' (১৯১৮) উনিশ শতককে জানতে আমাদের সাহায্য করে। তবে আধুনিক কালের স্মৃতিকথায় লেখকের যে সচেতন আত্মগোপন প্রয়াস বা ইতিহাসনিষ্ঠা দেখা যায়, পুরনো যুগের রচনায় তা প্রত্যাশা করে লাভ নেই।

২

গিরিশচন্দ্র বসু প্রবীণ বয়সে তাঁর প্রথম যৌবনের কর্মজীবনের স্মৃতিকথা লিখেছেন। কর্মজীবনের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করার এই সচেতন প্রয়াস সেকালে খুব সুলভ ছিল না। (দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে প্রচারিত 'আমার জীবন-চরিত' কয়েক বছর পরে 'জন্মভূমি' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে, ১২৯৮)। গিরিশচন্দ্র জানতেন 'আমাদের দেশে ইতিহাসের সম্পূর্ণ অভাব আছে। পূর্ব্বকালের কথা দূরে যাউক, আমাদের মধ্যে জীবিত বৃদ্ধ লোকের প্রথম কিম্বা মধ্য বয়সে দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল, ভবিষ্যতে তাহারও ঠিক বৃত্তান্ত পাওয়া দুর্ল্লভ হইবে। ইংরাজের অধীনে দেশীয় কত শত বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় স্বীয় বিভাগে বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন কিন্তু কেহই বঙ্গভাষায় তাঁহার বহুদর্শিতার ফল লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক কিম্বা আহ্লাদের কার্য্য বিবেচনা করেন নাই।' 'সেকালের দারোগার কাহিনী' তাই নিছক দারোগার চোর-ডাকাত ধরার রোমাঞ্চকর কাহিনী নয়, এর পিছনে লেখকের সমাজ-ইতিহাস রচনার বিশেষ প্ররোচনা কাজ করেছে, 'যিনি ভাবীকালের বঙ্গদেশের ইতিহাস লিখিবেন তিনি দেখিবেন

যে অনেক তুচ্ছ সংবাদ অভাবে সম্পূর্ণ ইতিহাস অঙ্গহীন থাকিবে। এই বিবেচনায় কেবল বর্ত্তমান পাঠকের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নহে, কিন্তু ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকদিগের সাহায্যের উদ্দেশে, এই দেশের দস্যুদিগের কীর্ত্তি-কলাপের এবং সেই সঙ্গে ভূতপূর্ব্ব পুলিশের কার্য্যপ্রণালীর যতদূর পারি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।' গিরিশচন্দ্র যে উদ্দেশ্যে স্মৃতিকথা লেখেন তা বহুল পরিমাণে সিদ্ধ হয়েছে; আধুনিক ঐতিহাসিক তাঁর রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, 'This is a book of exceptional worth, containing valuable information about the dacoits of mid-nineteenth century'. (Basudev Chatterji, 'The Darogah and country-side : the imposition of police control in Bengal and its impact', "The Indian Economic and Social History Review," vol. 18, no. 1, Jan-Mar., 1981.)

'সেকালের দারোগার কাহিনী'তে 'সেকাল' হলো উনিশ শতকের ছয়ের দশক। গিরিশচন্দ্র বসু ১৮৫৩ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ নবদ্বীপ-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে পুলিসের দারোগা ছিলেন। এই সময়কার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর বর্ণনীয় বিষয়। তারপর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উনিশ শতকের নয়ের দশকে স্মৃতিকাহিনীর আকারে এই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন (১৮৮৬)। হয়তো কালের ব্যবধান সত্যই খুব বেশি নয়, কিন্তু এই সময়টা ছিল খুবই অস্থির, অত্যন্ত দ্রুত সব কিছুর পরিবর্তন ঘটেছে—"লোকে বলে যে 'ঘড়িকে ঘোড়া ছুটে'। সত্য সত্যই গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে তাহাই বঙ্গদেশের অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্মে বিশ্বাস, বাণিজ্য, বিদ্যা-শিক্ষা, পূর্ত্ত-কার্য্য, শিল্প-কার্য্য, গৃহাদি নির্ম্মাণের প্রকরণ প্রভৃতি সমস্তই প্রলোড়িত হইয়াছে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ন্যায় 'পরিবর্ত্তন' তাহার হস্ত বিস্তার করিয়া 'স্থায়িত্ব'কে বিনাশ করত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভেদ করিতেছে।" লেখক অবশ্য রাজনারায়ণ বসুর মতো 'সে কাল আর এ কাল'-এর তুলনায় প্রবৃত্ত হন নি, প্রসঙ্গত কখনো একালের কথা এলেও তাঁর লক্ষ্য সেকালের গ্রাম ও মফঃস্বল শহরে বাঙালী সমাজের কয়েকটি স্তরের চিত্রাঙ্কন।

পুলিসের দারোগা হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে গিরিশচন্দ্রের রচনায় চোর-ডাকাতের চিত্রই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। উনিশ শতকের

দ্বিতীয়ার্ধেও পল্লীগ্রামে মধ্যযুগীয় রীতিতে নিয়মিত ডাকাতি হতো। ঠগীদের কীর্তিকাহিনী আমরা সকলেই জানি; বেন্টিঙ্কের আমলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ঠগ ও অন্যান্য ডাকাত-দমনের উদ্দেশ্যে একটি নতুন শাসন বিভাগ স্থাপিত হয়, যা ঠগী কমিশন নামে বিখ্যাত। স্লীম্যানের চেষ্টায় প্রায় পনেরো/ষোল বৎসর পরে ঠগী দমন সম্ভব হয়। ইংরেজ আমলের সূচনায় অনেকদিন পর্যন্ত গ্রামে জমিদারি পুলিস এবং সরকারি পুলিস স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। "কর্ণওয়ালিস প্রত্যেক চারশত স্কোয়ার মাইলের জন্য একটি থানা স্থাপন করেন। থানাগুলির এলাকা বহুগুণ বর্ধিত করা হয়। পূর্বতন দারোগাদের এলাকা এই থানার এলাকায় পরিণত হলো। 'থানাদার' পদ উঠিয়ে তাদের 'দারোগা' করা হলো। পূর্বে দারোগারা থানাদারদের ঊর্ধ্বতন ছিলেন। গ্রামীণ চৌকিদারদের নতুন দারোগাদের অধীন করা হলো। থানাদার ও ঘটিয়াল-পদ রহিত হয়। কিন্তু পাইক প্রভৃতি অন্য পদগুলি কিছুকাল পূর্বের অনুরূপ থাকে। এদের সকলকে প্রতিটি জেলাতে চব্বিশ পরগণার মতো জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীন করা হয়।" (পঞ্চানন ঘোষাল, পুলিশ কাহিনী, ১ম খণ্ড, ১৩৪৩, পৃ ১৪১)। ভারতবর্ষে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পুলিসের কাজে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকদের পাওয়া যায় নি। ঊর্ধ্বতন পদগুলিতে সাহেবরা থাকতেন, তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা কিছু কিছু লিখে গেছেন (দ্র W. N. Sleeman, "Rambles and recollections of an Indian official," London, 1844; R. Reid, "Everyman his own detective," Calcutta, 1887)। কিন্তু ভারতীয় পুলিস-কর্মচারীদের জীবনী বা স্মৃতিকথা বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। এর একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে, ভারতীয় যাঁরা পুলিসের কাজ গ্রহণ করতেন, তাঁরা লেখাপড়া জানতেন না—শুধু সইটুকু করতে পারলেই তখন দারোগার চাকরি পর্যন্ত মিলতো।

মিয়াজান নামে এক দারোগার 'স্বীকারোক্তি' বলে যে বইটি প্রচারিত হয়েছে, তা থেকে জানতে পারি কিভাবে কলেক্টর-সাহেবের আর্দালির কৃপায় তিনি কুড়ি বছর বয়সে পুলিস দারোগা পদে নিযুক্ত হন, এর জন্য কতজনকে ঘুষ দিতে হয়েছে এবং কতরকম পাপকর্মে লিপ্ত হতে হয়েছে (মিয়াজানের বোন কলেক্টর-সাহেবের রক্ষিতা, সেই সূত্রেই ভগিনীপতির চেষ্টায় ও কলেক্টরের আনুকূল্যে কর্মজীবনে তাঁর উন্নতি)। মিয়াজান অনেকটা ঠক চাচার মতোই

বলে, 'আর দুনিয়াদারি করিতে গেলে ভাল বুরা দুই চাই—দুনিয়া সাচ্চা নয়—মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো ?' মিয়াজানের বিশ্বাস, বিচারক থেকে সুরু করে আমলা মোক্তার পুলিস-কর্মচারী সকলেই ঘুষ নেয়, মিথ্যা বলে,— কাজেই সেও কেন সেই পথ অনুসরণ করবে না ?—'It only made me believe more strongly that all the world was corrupt, and that it was no great sin for a darogah, on twenty-five rupees per month, to take bribes, when judges on the bench, like the moulvie, took them.' ("The Confessions of Meajahn," Darogah of Police, dictated by him, and translated by a Mofussilite, Calcutta, Wyman & Co, Publishers, Hare Street, 1869, p. 91)। মিয়াজানের বিবরণ যদি সত্য হয়, তাহলে ১৮৩৯-৪০ সাল নাগাদ তিনি পুলিসের দারোগা ছিলেন। সেই সময়কার পুলিস ও বিচারব্যবস্থার দুর্নীতির দলিল হিসাবে বইটি বিশেষ মূল্যবান। অন্যদিকে ভারতীয় পুলিস-কর্মচারীর স্মৃতিকথা হিসাবেও মিয়াজানের 'স্বীকারোক্তি' গুরুত্বপূর্ণ রচনা, এর সঙ্গে গিরিশচন্দ্র বসুর স্মৃতিকথার তুলনা করলে দুই যুগের পার্থক্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়, যাতে বাঁকাউল্লা নামে ঠগী কমিশনের সময়ের একজন গোয়েন্দা দারোগার বিচিত্র অভিজ্ঞতা উত্তমপুরুষের জবানিতে বর্ণিত হয়েছে। বাঁকাউল্লা মাদ্রাসার ছাত্র থাকার সময় নিতান্ত অল্পবয়সে পুলিসে কাজ পান। বাঁকাউল্লা সম্ভবত মিয়াজানের সমসাময়িক, তিনি সামান্য লেখাপড়া জানতেন, অপরাধী-সন্ধানে তাঁর পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। তবে বাঁকাউল্লাকে 'দপ্তরে'র রচয়িতা বলা যাবে কি না তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন, দারোগার নাম বরকতুল্লা এবং প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় 'বাঁকাউল্লার দপ্তরে'র সম্ভাব্য লেখক। ডঃ সেন তাঁর 'অনুমানে'র কথা বলেছেন, কিন্তু তা তথ্যসমর্থিত নয়। অন্যদিকে 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' সম্বন্ধে তাঁর এই ধরনের মন্তব্য—'ভালো পুলিসী ডিটেক্‌টিভ রিপোর্টের গল্পের বই ইংরেজীতে অনেক আছে। বাংলায় এই একটি মাত্র।' ('বাঁকাউল্লার দপ্তর', সম্পাদক সুকুমার সেন, ১৩৪৯)—প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বা গিরিশচন্দ্র বসুর লেখার কথা মনে রাখলে সঙ্গত বিবেচিত হয় না।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯১৭) 'আদরিণী' (১৮৮৭), 'ডিটেকটিভ পুলিস, ১ম কাণ্ড' (১৮৮৭), 'পাহাড়ে মেয়ে' (১৮৮৯), 'বনমালী দাসের হত্যা (১৮৯১) প্রভৃতি বইগুলি লেখেন। এদিক থেকে প্রিয়নাথ গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক। প্রিয়নাথের সর্বাধিক পরিচিত রচনা 'দারোগার দপ্তর' ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ধারাবাহিকভাবে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর এই ধরনের রচনাও অভিজ্ঞতাভিত্তিক, যদিও এগুলিকে ঠিক আক্ষরিক অর্থে স্মৃতিকথা বলা যাবে না। তবে প্রিয়নাথ পরবর্তীকালে স্মৃতিকথা তথা আত্মজীবনীও লিখেছেন—'তেত্রিশ বৎসরের পুলিস-কাহিনী বা প্রিয়নাথ জীবনী' (১৯১২)।

গিরিশচন্দ্রের বই প্রিয়নাথ জীবনীর আগে প্রকাশিত, তাঁর কাহিনীও প্রিয়নাথের আগের যুগের কাহিনী। গিরিশচন্দ্র পুলিসের দারোগার কাজে যোগ দেন ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। (যদিও নীলকমিশনের সাক্ষ্যে তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে নদীয়া জেলায় দারোগার কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন, কিন্তু তার আগে তিনি নবদ্বীপ থানায় কাজ করেছেন এমন কথা 'সেকালের দারোগার কাহিনী' থেকে জানা যায়। হিন্দু পেট্রিয়টে ১৮৬০ সালে নীল কমিশনের সাক্ষ্যদানের সংবাদ পরিবেশন কালে গিরিশচন্দ্রের সাত বছর দারোগার কাজ করার কথা বলা হয়েছে।) ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুলিস কমিশনের আগে পর্যন্ত এদেশে পুলিস-ব্যবস্থা ছিল প্রাচীন ও আধুনিক ধারার এক মিশ্ররূপ। (দ্র· "History of the police organization in India and Indian village police : being select chapters of the Report of the Indian Police Commission, for 1902-03," Calcutta, University of Calcutta, 1913)। তবে ১৮৫০ থেকেই দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ যুবকেরা পুলিসবাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পুলিস রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'Many of course of the old occupants are inefficient and corrupt. The increase of pay has not rendered, and could not make all the darogahs honest and active, but a better feeling has been instilled into the force.' (Police Report, 1845, p. 82).

গিরিশচন্দ্র তাঁর কাহিনীর ভূমিকায় জানিয়েছেন, 'আমি যে কালের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সেই সময়ে বঙ্গদেশের প্রায় সকল জেলাতে ডাকাইতির প্রাদুর্ভাব ছিল এবং যদিও ইংবাজ শাসনের প্রথমাবস্থায় রঘুনাথ, বৈদ্যনাথ কিম্বা বিশ্বনাথ প্রভৃতি দস্যুগণ যেরূপ অকুতোভয়ে গৃহস্বামীকে পূর্ব্বে সংবাদ পাঠাইয়া ডাকাইতি করিত, এই সময়ে সেই প্রথার অনেক লাঘব হইয়াছিল, তথাপি ডাকাইতি ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল এবং কখনও কখনও অতি নিষ্ঠুর এবং নৃশংস ঘটনা সহকারে তাহা নির্ব্বাহিত হইত।' নবদ্বীপ থানায় তাঁর প্রথম নিয়োগ, পরে অন্যান্য কযেকটি থানায় কাজ করার পব সদর কোতোয়ালি থানার দারোগা হন। 'ডাকাইতি ব্যবসা'য় এই অঞ্চলে গোয়ালাদেরই প্রাধান্য ছিল, "কৃষ্ণনগর জেলায় অধিকন্তু গোয়ালারাই ডাকাইতি করিত। এই জেলায় গোপ-জাতীয বহুলোকের বাস তন্মধ্যে 'গড়ো গোয়ালারা' শারীরিক গঠন, বল ও সাহসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন যশোহর জেলার মুসলমানেরা শড়কিওয়ালা বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সেইরূপ কৃষ্ণনগর জেলার গোয়ালারা লাঠিয়াল বলিয়া আদরিত ছিল।" অনেক পরে প্রসন্নময়ী দেবীও (১৮৫৭-১৯৩৯) তাঁর স্মৃতিকথায় কৃষ্ণনগরের এই লাঠিয়াল গোয়ালাদের কথা বলেছেন, 'তখনকার দিনে রাজসাহী হইতে নৌকা যোগে কলিকাতা গমনাগমন যে কত বিপদসঙ্কুল তাহা এদিনে বুঝান বড় শক্ত। পথে পদে পদে লুটেড়া ডাকাত, রাহাগির ও ঠগী। জীবন হাতে করিয়া পথ চলিতে হইত। · নদীয়ার গড়োগোযালারা সব ডাকাত এবং জমীদারের জ্ঞাতসারেই এ কার্য্য করিত। ডাকাতেরা দিনে গৃহস্থ ব্যক্তির মত নদীতীরে বসিয়া থাকিত, যমদূত বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না। (পূর্ব্বকথা, ১৩২৪, পৃ. ১১-১২, ১৪)। 'সেকালের দারোগার কাহিনী'তে এই ডাকাতদের কীর্তিকলাপ বর্ণিত হয়েছে।

ডাকাত দমনে দারোগা গিরিশচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। রোমাঞ্চকর রহস্যোদ্ঘাটনের কাহিনী হিসাবে এগুলি যেমন উপভোগ্য, তেমনি এর মধ্যে লেখকের সমাজ পর্যবেক্ষণমূলক মন্তব্যগুলি ইতিহাসের ছাত্রের কাছে মূল্যবান। উনিশ শতকের মধ্যভাগের একজন শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণ হিসাবেই এগুলি গ্রহণ করতে হবে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বা সিদ্ধান্ত অনেক সময় একালের নব্যপন্থীদের পছন্দ হবে না, কিন্তু সেজন্য তাঁকে দোষ দেওয়া বৃথা। দৃষ্টান্ত হিসাবে ভূমিকার একটি মন্তব্য ও কাহিনীর উল্লেখ করতে পারি;

গিরিশচন্দ্র বলেছেন, 'কেবল গ্রামবাসীদিগের ভীরু স্বভাববশতঃ ডাকাইতরা অনায়াসে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইত। যে যে স্থানে গ্রামের লোকেরা একত্রিত হইয়া দস্যুদিগের প্রতিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইত, সেই সেই স্থানে অধিবাসীরা জয় লাভ করিত।' তারপর তিনি উলার মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের [গিরিশচন্দ্র অবশ্য মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম করেন নি] বাড়িতে প্রাচীনকালের এক ডাকাতির গল্প বলেছেন, যাতে কর্তার বুদ্ধি ও গ্রামবাসীর প্রতিরোধে ডাকাতদল ধরা পড়ে—'এই অবধি উলা বীরনগর আখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে।' সুরেননাথ মিত্র মুস্তৌফী প্রণীত 'উলা বা বীরনগর' গ্রন্থে (১৩৩৩) এই 'বীরত্বের' কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে এবং সরকারি নথিপত্রের সাহায্যে গ্রামের নামপরিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে (পৃ. ১৯-২২)। আধুনিক ঐতিহাসিক এই কাহিনীকে সামান্য পরিবর্তিত আকারে পরিবেশন করে মন্তব্য করেন- "ডাকাতদের মধ্যে অনেকে যাবজ্জীবন কারাবাস ও দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হয়। ডাকাত ধরার এই বীরত্বের জন্য সাহেবরা উলোর নাম দেন 'বীরনগর'। কিন্তু গরীব প্রজাদের ঘরের চাল উপড়ে নিয়ে এসে আগুন জ্বালিয়ে ডাকাতদের পালাবার পথ বন্ধ করে দেওয়া অথবা লড়াইয়ের ফলে উভয়পক্ষে আহত-নিহত হওয়ার মধ্যে 'বীরত্ব' কোথায় তা আমরা জানি না, শাসক-বিচারক সাহেবরা জানতেন।" (বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ৩য় খণ্ড, ১৯৪০, পৃ. ১১১)। একই ঘটনা স্বতন্ত্র দৃষ্টি থেকে দেখার ফলে আগের দিনের বীরত্ব আজকের দিনে কৌতুককর বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু বীরত্বের ধারণাও যে দেশকালভেদে এক থাকে না তা আমাদের বোঝা উচিত।

এই ধরনের বিচার-বিভ্রাট যে শুধু শতাব্দীর ব্যবধানে ঘটে তাই নয়, পঁচিশ-তিরিশ বছরের মধ্যেই মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটতে পারে, এবং তা একই ব্যক্তির জীবনে ঘটা সম্ভব। নদীয়া/কৃষ্ণনগর সেকালে নীলচাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। নীলচাষের বিরুদ্ধে প্রজার বিক্ষোভও এই অঞ্চলে খুব তীব্র রূপ লাভ করে। গিরিশচন্দ্র বসু দারোগা হিসাবে নীলকুঠি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং ন্যায়নিষ্ঠ হৃদয়বান মানুষ হিসাবে সে সময়ে চাষীদের পক্ষ অবলম্বন করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় তিনি প্রজাদের পক্ষ অবলম্বনে অনেক চিঠি লেখেন। 'ইণ্ডিগো কমিশনে' তাঁর সাক্ষ্যদান সেকালে প্রবল

আলোড়ন সৃষ্টি করে; ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই 'হিন্দু পেট্রিয়টে' তাঁর সাক্ষ্য সম্বন্ধে লেখা হয়, "The next witness examined was Baboo Greesh Chunder Bose, Daroga of Kishnaghur, who gave his evidence in a most upright and straight-forward manner. Supported as his evidence was by seven long years' experience in the indigo districts, it forcibly exposed the rottenness of the indigo system. He was acknowledged by even the planters themselves as an authority, and we are very happy to find that he had the moral courage to speak out the result of his experiences on the question. He clearly proved that the dislike to cultivate indigo is not of yesterday's growth, and that a general dislike has been existing since the last five years. He gives a list of the principal cases he had to investigate, in all of which the planters appear to have been the aggressors. He said that he had intimacy and acquaintance with almost all the European planters of the Nuddea district and their Amla, and that in the generality of cases he met with opposition from the factory while investigating them on the spot. In one instance, he informed the Commission, Mr. Tripp of Bamundee told him that he had twelve barrels loaded for him if he dared to enter his bungalow. He next produced before the Commission an instrument made of leather with which the planters torture the ryots. He said that he got it from the Joyrampore factory of Mr. Mears, and that he has seen similar instruments at the Katcheekatta and Lokenathpore factories. We believe the planters will deny that they have such instrument, made purposely to torture the unfortunate

ryots, but there was the thing itself, made of the pump leather of the factory and it has been, we are informed, in the Joyrampore factory since the last five or six years.… It appears that the Daroga of Kishnaghur was the most important witness that possibly could be found, and it is a matter of regret that sufficient time was not allowed him and that more questions time not put to him. Thus we see an educated first grade Police Officer, who is spoken highly of by both parties, condemning the indigo system as a system of oppression and corruption. (Benoy Ghose, "Selections from English periodicals of 19th century Bengal," vol. 5, Calcutta. কিন্তু তিনিই বৃদ্ধ বয়সে 'সেকালের দারোগার কাহিনী' লেখবার সময় কুঠিয়াল সাহেবদের সপক্ষে এমন অনেক কথা বলেন, যা অভিজ্ঞতা-সমর্থিত কি না সন্দেহজনক। এমন হতে পারে, স্মৃতিকথায় তিনি নিরপেক্ষভাবে নীলকর সাহেবদের দোষ-গুণ দেখাতে চান, ফলে ভারসাম্য রাখার জন্য দোষের অংশ কমাতে হয়েছে ; অথবা অনেক কিছু তিনি ভুলে গেছেন ; অথবা কালের ব্যবধানে তাঁর মত পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি আলোচনার সূচনায় 'নীলদর্পণে'র প্রসঙ্গ তুলেছেন, কিন্তু জানিয়েছেন, 'যাঁহারা বাবু দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নীলকর সাহেবের চরিত্রের কেবল দোষের ভাগই জানিতে পারিয়াছেন। · কিন্তু তাহা বলিয়া যে নীলকর সাহেবদিগের চরিত্রে কোনও প্রশংসার বিষয় ছিল না এবং সকল নীলকরই মিত্রজার বর্ণিত সাহেবের ন্যায় পামর এবং অত্যাচারী ছিলেন, তাহা নয়। নীলকর সাহেবদিগের যেমন দোষ ছিল, তেমন পক্ষান্তরে অনেক গুণও ছিল এবং তাঁহাদের প্রাধান্যের সময় তাঁহারা দেশের অনেক উপকারও করিয়াছিলেন। … আমি নাটক কিম্বা কবিতা লিখিতেছি না, সাদা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাই আমার উদ্দেশ্য ; অতএব আমি পক্ষপাত না করিয়া নীলকর সাহেবদিগের দোষ ও গুণ সমভাবে বিবৃত করিতে বাধ্য এবং তাহা করিতেও সাধ্যমতে চেষ্টা করিব।' কিন্তু নীলকুঠির সাহেবদের 'গুণে'র যে বিবরণ গিরিশচন্দ্র দিয়েছেন তার সত্যতা স্বীকার করলেও, তাকে

'গুণ' বলা যাবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে (যেমন দারোগাকে হাজার টাকার নোট বখ্‌শীশ, কিংবা 'খোদ মাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম অমান্য করিয়া নীলকরের আদেশানুযায়ী' প্রজার কাজ)। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, কিছুটা জোর দিয়ে যখন তিনি বলেন 'নীলদর্পণে দেশীয় স্ত্রীলোকের প্রতি নীলকর সাহেবের দৌরাত্ম্যের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা নিতান্তই অমূলক। আমি অনেক অনুসন্ধানেও ঐ কথার কোন ভিত্তি পাই নাই···আমি কোনও স্থানে বলপ্রকাশের দৃষ্টান্ত দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই।' কিন্তু হরমণি অপহরণের সংবাদ এবং 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র মন্তব্য কি গিরিশচন্দ্র দেখেন নি ? হার্সেল-এর রিপোর্টও তাঁর দেখবার বা জানবার কথা। 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় 'ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বলাৎকার প্রভৃতি'র যে খবর বেরিয়েছে তা সবই কি বানানো ? — 'এই সময় গরীব প্রজাগণকে যেরূপ কষ্ট দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, নয়ন হইতে অনবরত অশ্রুধারা নিপাতিত হইতে থাকে। এই অবকাশে দুইটি পতিপ্রাণা রূপবতী যুবতীকে বলাৎকার করা হইয়াছিল। সেই দুইটী রমণীর একটার কোলে একটী শিশুকন্যা ছিল। টানাটানি করিবার সময় সেই কন্যাটির প্রাণ বিয়োগ হইল।···' (সোমপ্রকাশ, ২ বৈশাখ ১২৬৯)। মনে হয় বৃদ্ধ বয়সে গিরিশচন্দ্র অনেক ঘটনাই বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু তবু নীলকর সাহেবদের সমর্থনে তাঁর অত্যুৎসাহ কিছুটা বিস্ময়কর মনে হয়।

'সেকালের দারোগার কাহিনী'র সব বিবরণ তাই সমান মূল্যবান না হতে পারে। তবে চরিত্র চিত্রণেই গিরিশচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। নীলকুঠির নায়েব-গোমস্তাদের চরিত্র তিনি কয়েকটি রেখায় জীবন্ত করে তুলেছেন—তাদের বিত্ত ও প্রতাপ, দান ও অত্যাচার, শাসন ও লুণ্ঠন কোনো কিছুই তাঁর বর্ণনা থেকে বাদ পড়ে নি। সেকালের জমিদারদের ছবিও তাঁর লেখায় খুব ভালো ফুটেছে। দারোগা হিসাবে জমিদার বা দেওয়ানদের সঙ্গে তাঁর কখনো বিরোধ ঘটেছে সত্য, তাঁদের বেআইনী কার্যকলাপ দমনে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে বটে, তবু সাধারন ভাবে তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতির সম্পর্ক বর্তমান ছিল।

'সেকালের দারোগার কাহিনী' গ্রন্থে যে একধিক জমিদার পরিবারের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অধ্যাপক বাসুদেব

চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Penetration of authority in the interior: a case study of the zemindary of Nakashipara, 1850-1860' নামের গবেষণাপত্রে নাকাশীপাড়ার জমিদার পরিবারের আলোচনাকালে গিরিশচন্দ্র বসুর বইয়ের উপর খুবই নির্ভর করেছেন। এই পরিবারের শ্রীযুক্ত সমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় তাঁর পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে যে লিখিত বিবরণ আমাদের পাঠিয়েছেন তা থেকে মনে হয় গিরিশচন্দ্র মূল সংবাদাদির ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য, তবে বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিচারণার ভঙ্গিতে লেখার ফলে কিছু ঘটনা বা নাম পরিত্যক্ত হয়েছে। নাকাশীপাড়ার সিংহ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রাজপুতানা থেকে আগত বাবরাম সিংহ। তাঁর পুত্র বিনোদবিহারী এবং বিনোদবিহারীর পুত্র নীলকণ্ঠের আমলেও বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটেনি। নীলকণ্ঠের ছয় পুত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র নিধিরামের সন্তান চন্দ্রমোহন, কেশবচন্দ্র এবং বিহারীর কথা 'সেকালের দারোগার কাহিনী'তে পাওয়া যায়। নীলকণ্ঠের চতুর্থ সন্তান আলমকে নাকাশীপাড়ার জমিদারী স্থাপনের প্রধান পুরুষ বলা যায়। নদীয়ার তৎকালীন মহারাজার দেহরক্ষী আলমের পুত্র গোলাম, তাঁর দুই পুত্র সর্ব এবং ঈশান। কেশববাবু হলেন ঈশানবাবুর অন্যতম জ্যেষ্ঠভ্রাত। কেশববাবুর সময় যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয় তাতেই এই বংশের সমৃদ্ধিক্ষয় এবং দ্রুত পতন ঘটে।

অনুরূপভাবে শান্তিপুরের প্রতাপান্বিত জমিদার উমেশচন্দ্র রায় (যিনি 'মতিবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন) এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের বিরোধের কাহিনী আজকের দিনে ইতিহাসগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। —"ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মতিবাবুকে বাঙ্গালার 'বিসমার্ক' বলিতেন; ইঁহাদের মধ্যে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত, কিন্তু ঈশ্বরবাবু কূটবুদ্ধিতে মতিবাবুর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না।' (কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শান্তিপুর-পরিচয়, ১ম ভাগ, ১৩৪৪, পৃ. ২০৬)।

আসলে 'সেকালের দারোগার কাহিনী' কতকগুলি গল্প বা গল্পের রেখাভাস হলেও কোনো চরিত্রই কাল্পনিক নয়; ঘটনা ও সংলাপও যথাসম্ভব বাস্তবানুসারী অর্থাৎ অভিজ্ঞতা-নির্ভর। মনোহর ঘোষ, বা নীলকুঠির সাহেবদের নাম সেকালের সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। ড্যাম্পিয়ার, মণ্টি্সর, এলিয়ট, প্রভৃতি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্র। সেকালের 'হাকিম ও

আমলাদের কথা' বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি নিজের বাল্য ও কৈশোরকালে ফিরে গেছেন। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য শোকসভা (১৮৪২), কুমার কৃষ্ণনাথের আত্মহত্যা (১৮৪৪) প্রভৃতি তাঁর ছাত্রজীবনের ঘটনা। দ্বারকানাথ ঠাকুরের চব্বিশ পরগণার নিমকমহালে দেওয়ানীর সময়কার (১৮২৩-১৮৩৪) যে সমস্ত গল্প তিনি বলেছেন তার অধিকাংশই শোনা কথা। আসলে বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিচারণের কালে পুরনো যুগ সম্বন্ধে এক ধরনের শ্রদ্ধা-ভালবাসা মিশ্রিত আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। ফলে উনিশ শতকের সূচনায় হাইলেবেরি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত সিভিলিয়ানদের সঙ্গে শতাব্দীর শেষার্ধের সিভিলিয়ানদের তুলনায় তাঁর আগ্রহ দেখা দিয়েছে। এখানে প্রাচীন সিভিলিয়ানদের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। বলাবাহুল্য একে ঠিক ঐতিহাসিক বিচার বলা যায় না। যদিও তিনি বলেছেন, সেকাল ও একালের তুলনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অনেক সময়েই নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি এই ধরনের তুলনায় প্রণোদিত হয়েছেন, এবং সেকালের প্রতি তাঁর পক্ষপাত প্রকাশ পেয়েছে। আসলে স্মৃতিকথা কখনোই নিরপেক্ষ ইতিহাসের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। সেকালের সাহেব হাকিম বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্যবহার তাঁর কাছে প্রশংসনীয় মনে হয়েছে। দেশী কেরানীদের সঙ্গে সাহেবদের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। রাজনারায়ণ বসুর মতোই তিনি দেশী কেরানীদের স্বল্প ইংরাজী-জ্ঞান নিয়ে অনেকগুলি গল্প বলেছেন। উনিশ শতকের শেষ পাদে সাহেব উপরওয়ালা এবং নিম্নপদস্থ দেশী কর্মচারীর তিক্ত সম্পর্ক তাঁকে পীড়িত করেছে বলেই অতীতের পরস্পর-নির্ভরতার গল্প তাঁর কাছে ভারি মধুর মনে হয়েছে। বলাবাহুল্য দারোগা হিসাবে কাজ করার সময় ইংরেজ কর্মচারীদের কাছ থেকে তিনি সবসময় সুবিচার বা সদয় ব্যবহার পেয়েছেন কি না, তা কিন্তু তিনি বলেন নি। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে সাহেব হাকিমের বিচারের বাস্তব চিত্র পাওয়া যাবে 'আলালের ঘরের দুলালে'। কিন্তু সেখানে প্যারীচাঁদ মিত্র সাহেব হাকিমের দেওয়ান-সেরেস্তাদারের উপর নির্ভরতা প্রায়ই কি ধরনের অবিচার ঘটাতো তার ছবি এঁকেছেন। সাহেব থেকে সুরু করে দেশী কর্মচারীদের মধ্যে ঘুষ নেওয়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও প্রবণতাও প্যারীচাঁদের ব্যঙ্গের বিষয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেকালের প্রশস্তি রচনায় মাঝে মাঝে এমনই আত্মবিস্মৃত যে ঘুষ নেওয়া ও ঘুষ দেওয়ার সমর্থনেও তিনি প্রচুর বাক্যব্যয় করেন। তাঁর

অভিজ্ঞতা, 'টাকা লওয়াটা সাধারণ প্রথা ছিল এবং পূর্ব্বে সাহেবেরা অনেকেই এই দোষে মুক্ত ছিলেন না। বর্ত্তমান সময়ে ঘুস লওয়াকে আমরা যেমন দুষ্কর্ম্ম মনে করি তখন লোকের সে জ্ঞান ছিল না। ঘুষ না দিলে কোনও কার্য্য হইত না।' কিন্তু তারপর নানা দৃষ্টান্ত সহযোগে তাঁর সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর: 'এক্ষণে সেই দোষের হ্রাস হইয়াছে বলিয়া অর্থী প্রত্যর্থীগণের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। আমলারা ঘুস লয়েন না বলিয়া লোকের বিশেষ সুবিধা কিম্বা উপকার বৰ্দ্ধিত হয় নাই বরং অসুবিধা এবং অনুপকারের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।' গিরিশচন্দ্রের এই বক্তব্য কিছুটা কৌতুককর মনে হলেও বাঙালী মধ্যবিত্ত মানসিকতার দৃষ্টান্ত হিসাবে এর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। দারোগা হিসাবে তিনি নিজে হয়তো ঘুষ নিতেন না, কিন্তু কার্যসিদ্ধির উপায় হিসাবে ঘুষের উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত। 'সেকালের দারোগার কাহিনী' তাই শুধু বিশেষ দারোগার কাহিনী থাকে নি, সেকালের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সরকারী কর্মচারীর অভিজ্ঞতা, প্রত্যয় ও সমাজ বিশ্লেষণের নিদর্শন হিসাবেও তাৎপর্য লাভ করেছে।

৩

'সেকালের দারোগার কাহিনী' গ্রন্থের রচয়িতা গিরিশচন্দ্র বসুর কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। তবে তাঁর জীবদ্দশায় 'জন্মভূমি' পত্রিকায় (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩০৩, পৃ. ২৭৯-৮৩) 'বাঙ্গলা ভাষার লেখক' নামের প্রবন্ধমালায় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়; সম্ভবত প্রবন্ধের লেখক গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তাই জীবনীটি নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হতে পারে। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'নব্যভারত' পত্রিকায় (২৫শ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩১৪, পৃ ৫৫২-৫৫) 'স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বসু' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, প্রবন্ধটি পরে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের (১৩১৬, পৃ ২১২-২১৬) অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রবন্ধটি থেকে গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে পারি। আদিনাথ সেন রচিত 'স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ব্ববঙ্গ' গ্রন্থেও (২য় খণ্ড, ১৯৪৮, পৃ ৩৩৯-৪৩) গিরিশচন্দ্র বসুর

জীবনকথা সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এছাড়া শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কারের 'জীবনীকোষ' গ্রন্থেও (২য় খণ্ড, ১৩৪৬, পৃ. ৩৮১-৮২) অল্প পরিসরে তাঁর জীবনী সংকলিত হয়েছে। আমরা এই প্রবন্ধগুলি অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র বসুর জীবনালেখ্য রচনা করেছি।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার মালখানগর গ্রামে বসু-পরিবার অন্তত তিনশো বছর আগে বসতি স্থাপন করে। দেবীদাস বসু ঔরঙ্গজেবের সময় ঢাকার নাওয়াড়া মহলের কানুনগো হিসাবে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। রাজা রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার একদা এঁদের বাড়িতে গোমস্তা ও মুহুরির কাজ করেছেন। দেবীদাস প্রথমে মালখানগর গ্রামে কাছারির জন্য একটি 'সেঘরা' বা তিন কামরাযুক্ত ইঁটের বাড়ি তৈরি করেন। ঢাকাতেও দেবীদাস অনেক ভূসম্পত্তি করেছিলেন। দেবীদাসের পুত্র রুদ্রদাস, রুদ্রদাসের অনেকগুলি পুত্রের মধ্যে অন্যতম রামেশ্বর, রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানী, ভবানীর দুই পুত্র নবকিশোর ও শম্ভুচন্দ্র। শম্ভুচন্দ্রের পুত্র গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্রের পৌত্র শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসু। এঁরা বঙ্গজ কায়স্থ। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করায় এই বংশ পরবর্তীকালে মালখানগরের 'বসুঠাকুর' পরিবার নামে পরিচিত।

গিরিশচন্দ্রের জন্মের তারিখ জানা যায় না। 'জন্মভূমি' পত্রিকায় বলা হয়েছে তাঁর জন্মসন ১২৩৩ সাল, আশ্বিন মাস [সেপ্টেম্বর ১৮২৬]। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত জানিয়েছেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৪ বৎসর, তাহলে জন্মসন হয় ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ, শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার এবং আদিনাথ সেনও এই বিবরণ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমরা 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ অধিকতর গ্রাহ্য মনে করি। গিরিশচন্দ্রের মাতুল ছিলেন কৃষ্ণনগরের 'সদর-আলা' রায়বাহাদুর রামলোচন ঘোষ। (রামলোচনের দুই পুত্র মনোমোহন ঘোষ এবং লালমোহন ঘোষ ব্যারিস্টার এবং বাগ্মী হিসাবে বিখ্যাত)। গিরিশচন্দ্র মাতুল রামলোচনের কাছে শৈশবে প্রতিপালিত হন, এবং মাতুলের ইচ্ছায় আট বৎসর বয়সে (১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতায় হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এই সময় রামতনু লাহিড়ী হিন্দু কলেজে দশম শিক্ষক, তাঁর কাছেই গিরিশচন্দ্রের ইংরেজি শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় তিনি ডেভিড হেয়ারের বিশেষ স্নেহানুকূল্য লাভ করেন, তাঁর অসুস্থতার সময় হেয়ার অনেক দিন তাঁর সেবাশুশ্রূষা করেছেন। প্রায় পনেরো বছর গিরিশচন্দ্র হিন্দু কলেজে

পড়েন ; কৃতী ছাত্র হিসাবে তিনি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'গঙ্গানারায়ণ দাস সিনিয়র বারো টাকা বৃত্তি' এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশ টাকার সিনিয়র স্কলারসিপ লাভ করেন। (দ্র. Presidency College Register, Calcutta, 1927, p 449)। কিন্তু এক বছর সিনিয়র স্কলারসিপ পাওয়ার পর, আকস্মিক পিতৃবিয়োগের ফলে, তাঁকে কলেজ ত্যাগ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়।

কলেজে পড়বার সময়েই তিনি ইংরেজি ও বাংলায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ও তাঁর ভাই বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যঙ্গ করে তিনি এই সময়ে ক্ষুদ্র পুস্তিকা লেখেন। মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডাফ যখন 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় লেখেন হিন্দুরা তাঁকে মারবার চক্রান্ত করছে, তখন গিরিশচন্দ্র 'ম্যাকবাম্বু' ছদ্মনামে একটি দীর্ঘ পত্রে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই ধরনের বিতর্কমূলক রচনা দিয়েই গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের সূচনা। কাশীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' (১৮৪৬) পত্রিকার তিনি প্রধান লেখক ছিলেন, সম্ভবত পত্রিকা প্রকাশেও তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

বাংলা রচনাতেও তাঁর এই সময় আগ্রহ দেখা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকায় তাঁর কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তারপর দীর্ঘদিন বাংলায় আর কিছু লেখেন নি। বৃদ্ধ বয়সে আবার বাংলায় লেখা শুরু করলেন, তারই নিদর্শন 'সেকালের দারোগার কাহিনী' বা 'সিরাজউদ্দৌলা'।

কলেজ পরিত্যাগের পর তিনি কিছুদিন তমলুকে সল্ট এজেন্সিতে 'হেড রাইটার' পদে নিযুক্ত ছিলেন ; 'সেকালের দারোগার কাহিনী'তে তিনি জানিয়েছেন, 'আমি কিছুকাল তমলুকের নিমক মহলের হেড কেরাণী ছিলাম।' ঠিক কতদিন তমলুকে ছিলেন জানা যায় নি। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নবদ্বীপ থানার দারোগা হিসাবে নতুন কর্মভার গ্রহণ করেন। দারোগা থাকার সময়েই তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়টে' স্বনামে ও ছদ্মনামে প্রবন্ধ ও পত্রাদি লিখতে থাকেন, এবং নীলবিদ্রোহের সময়ে যে জন্য তিনি খ্যাতি বা অখ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় একটি পত্রে কৃষ্ণনগরের একজন নীলকর সাহেব ইংরেজি-শিক্ষিত নতুন শ্রেণীর বাঙালী দারোগাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন, "It gave some examples, among them a

ভূ ২

darogha styled 'Grease Booze'(Ghirish Bose)who, the writer says, deliberately misconstrued the *parwana* of April 19 which Herschel intended to be his private instructions, by riding around the villages and telling the ryots to sow paddy under the magistrate's orders. 'He has been mainly the cause of the bitter feeling now existing between the Ryots and Planters in this Thannah" (Blair B. Kling, "The

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে যে মাসে নীলচাষ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য গভর্নমেণ্ট একটি কমিশন গঠন করলেন। নীল কমিশনের সদস্য ছিলেন ডবলিউ. এস. সীটনকার (সভাপতি), রিচার্ড টেম্পল, পাদরি জে. সেল, ডবলিউ. এফ. ফার্গুসন এবং চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতায় এবং কৃষ্ণনগরে কমিশন বিভিন্ন জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ জুলাই কৃষ্ণনগরে কমিশনের আহ্বানে গিরিশচন্দ্র বসু সাক্ষ্য প্রদান করেন। প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি—

Minutes of Evidence taken before the Indigo Commission at Kishnagur.

Witness examined at Kishnagur.

Grihish Chunder Bose, First Class Darogah of the Kotwalli Thana of Zillah Nuddea called in, and examined on oath.

no. 3453···I have been a Police Darogah since September 1855, in this district and have done service in almost all Indigo Thannas,

no. 3467. Mr. Sale] You stated that the ryots were not treated as free agents, will you be good enough to state what you mean by that ?—The planters do just as they like with the ryots. The ryots have no voice in their transactions with the planters ; and it is my belief that the universal cry which had been set up by the ryots

against the factory, is not without foundation

no 3468. Mr. Fergusson] Had they not always had as much voice before as they have now, or in what is the difference ?—I cannot speak of former years; my experience extends so far as I have been Darogah of this district.

no. 3469. Baboo C. M. Chatterjee] A ryot has stated in his evidence that some of the planters have a kind of leather with which they beat the ryots, have you ever seen such instruments ?—Yes. I beg to produce one which I procured at the Joyrampore factory lately. I saw similar instruments at Katchikatta and Lokenathpore, hanging up before the *naibe's* cutcherry, but I could not capture them.

("Report of the Indigo Commission appointed under Act XI of 1860, with the minutes of evidence and appendix," Calcutta, 1860, p. 80-81).

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীল কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার অনতিপরে গিরিশচন্দ্র দারোগাপদে ইস্তফা দেন। আদিনাথ সেন জানিয়েছেন, নীল-আন্দোলনের সময়ে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' তিনি চিঠি লিখতেন, এবং সেজন্য তাঁর 'চাকুরী যায়'। অন্যত্র বলা হয়েছে, শারীরিক কারণে তিনি দারোগার কর্ম পরিত্যাগ করেন।

আদিনাথ সেন আরও জানিয়েছেন, 'কিন্তু পরে উৎকৃষ্ট লেখক হিসাবে পুনরায় সেক্রেটারিয়েটে আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রারের কাজ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে উহা ছাড়িয়া মুর্শিদাবাদে নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং অতি যোগ্যতার সহিত কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের অভিভাবক ও ম্যানেজারের কাজ করেন। 'শরীর অসুস্থ হওয়ায়, ১২৮০ সালে গিরিশবাবু কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।'

গিরিশচন্দ্র তাঁর শেষ জীবন কাটান মালখানগর গ্রামে। নিজের গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তিনি সবিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। মালখানগরে ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্কুলটি প্রথমে মাইনর স্কুল

ছিল (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে), গিরিশচন্দ্রের চেষ্টায় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্কুল এনট্রান্স স্কুলে পরিণত হয়। গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনেও তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়। তাঁরই চেষ্টায় মালখানগরে পোস্ট অফিস স্থাপিত হয়েছে। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি 'শক্তি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা (১৮৮৮) করেন, তবে পত্রিকাটি অল্পদিন প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

৪

'সেকালের দারোগার কাহিনী' অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ ১২৯৩-শ্রাবণ ১২৯৪), পরে ১২৯৫ সালে [১৮৮৮] ঢাকা থেকে রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের আখ্যাপত্র এইরূপ—

সেকালের দারোগার কাহিনী/শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু/প্রণীত।/ এল, এম, দাস কোম্পানী কর্তৃক/প্রকাশিত। / Dacca/Adrasha Press/Printed by Lauchmon Bysak/১২৯৫। ৪,২১০ পৃষ্ঠার এই বইটির দাম ছিল এক টাকা। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকা থেকে জানা যায় বইটি প্রথম সংস্করণে এক হাজার কপি ছাপা হয়েছিল ; প্রকাশের তারিখ ৭ নভেম্বর ১৮৮৮।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সেকালের দারোগার কাহিনী' বইয়ের একটি পরিচিতি-মূলক 'ভূমিকা' লেখেন। এই প্রবন্ধটি প্রথমে 'নবজীবন' পত্রিকায় (আষাঢ় ১২৯৫) 'সেকালের দারোগার কাহিনী : পরিচয়ে সমালোচনা' নামে ছাপা হয়। বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে অক্ষয়চন্দ্রের রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

গিরিশচন্দ্রের অন্য দুটি রচনা 'জন্মভূমি' পত্রিকায় (ভাদ্র ১২৯৮, ভাদ্র ১২৯৯) প্রকাশিত হয়েছিল। 'মুরশিদাবাদের নবাব' প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্রের নবাবী দরবারে চাকরি জীবনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। 'সিরাজউদ্দৌলা' প্রবন্ধে সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে কিছু তথ্য ও কিংবদন্তী পাওয়া যায়। পরিশিষ্টে গিরিশচন্দ্রের এই বিস্মৃতপ্রায় প্রবন্ধদুটিও সংকলিত হয়েছে।

'সেকালের দারোগার কাহিনী' পুনর্মুদ্রণকালে আমরা সাধারণভাবে 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পাঠ' গ্রহণ করেছি। তবে পত্রিকার 'পাঠে' যে সব ছাপার ভুল ছিল সেগুলি বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করা হয়েছে। পুরনো বইয়ের পুনর্মুদ্রণে ভাষা ও বানান অবিকৃত রাখা প্রযোজন। তাই বর্তমানে অপ্রচলিত বানান ও সেযুগের উচ্চারণবিধি অনুসারে বিদেশী শব্দের লিপ্যন্তর পরিবর্তিত করা হয় নি। তবে একই শব্দের একাধিক বানান (যার অনেকগুলি নিশ্চয় ছাপাব ভুল) দেখা গেলে সর্বাধিক ব্যবহৃত বানান রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

'সেকালের দাবোগার কাহিনী' বইটি পুনর্মুদ্রণের জন্য নির্বাচন, পত্রিকার 'পাঠ' মেলানো, গিবিশচন্দ্র বসুব জীবনী এবং আনুষঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ এবং সম্পাদনার অধিকাংশ দায়িত্ব গ্রহণ কবেছেন শ্রীঅশোক উপাধ্যায়। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' বইটির সন্ধান দেন বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের কর্মী শ্রীশঙ্কবলাল ভট্টাচার্য ; শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবব্রত বসু, শ্রীঅরুণচাঁদ দত্ত নানাভাবে তথ্যসংগ্রহে সহায়তা করেছেন। নাকাশীপাড়ার জমিদার বংশের শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় পারিবারিক ইতিহাস জানিয়েছেন এবং 'সেকালের দাবোগাব কাহিনী' বইটির প্রথম সংস্করণ ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। সকলকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

অলোক রায়

ভূমিকা

লোকে বলে যে "ঘড়িকে ঘোড়া ছুটে"। সত্য সত্যই গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে তাহাই বঙ্গদেশের অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্মে বিশ্বাস, বাণিজ্য, বিদ্যা-শিক্ষা, পূর্ত্ত-কার্য্য, শিল্প-কার্য্য, গৃহাদি নির্ম্মাণের প্রকরণ প্রভৃতি সমস্তই প্রলোড়িত হইয়াছে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ন্যায় "পরিবর্ত্তন" তাহার হস্ত বিস্তার করিয়া "স্থায়িত্বকে" বিনাশ করত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভেদ করিতেছে। বাষ্পীয় রথ, বাষ্পীয় জলযান, বিদ্যুৎসার, "দূর" শব্দকে লোপ করিয়া বাণিজ্যের উন্নতিসাধন ও ভ্রমণের কষ্ট ও বিঘ্ন বিনাশ করিয়াছে, পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রচারে জনসমূহের জ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়াছে, উন্নত শাসন-প্রণালী ব্যবহারে দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। ফলে আমাদের জন্মভূমি ক্রমশঃ কিন্তু দ্রুতবেগে সমগ্ররূপে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্ব পঞ্চাশ বৎসরের সময়ের অবস্থার বর্ণনা শুনিলে, তাহা অবিশ্বাস-যোগ্য অত্যুক্তি বলিয়া লোকের বিবেচনা করা বড় বিচিত্র হইবে না। কত বিষয়ে এইক্ষণ আমাদের সুবিধা হইয়াছে, কত নূতন দ্রব্য আমাদের সুলভ-প্রাপ্য হইয়াছে,—তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। দুইটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। পূর্ব্বে বাড়ীর বিধবাদিগের কোন্ দিবস একাদশীর উপবাস হইবে, তাহা জানিবার নিমিত্ত গ্রামান্তরে টোলের ভট্টাচার্য্য ঠাকুরের নিকট গমন না করিলে উপায় ছিল না। কিন্তু এইক্ষণ চারি পয়সার একখানা বটতলার ছাপার পঞ্জিকা গৃহে রাখিলে বালক বালিকারাও তাহা বলিতে পারে। রাত্রিকালে টিকা কিম্বা

প্রদীপ জ্বালিবার নিমিত্ত অনেকক্ষণ যাবৎ ঠক্ ঠক্ করিয়া শোলায় চকমকি ঠুকিতে হয় না, এক পয়সার এক বাক্স বিলাতি দিয়াশলাই কিনিয়া রাখিলেই এক মাসের অভাব পূরণ হয়। এই প্রকার শত সহস্র দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে, কিন্তু তাহা করিয়া এই প্রবন্ধের কায়া-বৃদ্ধি করার আবশ্যক নাই। যে বিষয় বর্ণনা করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইলেই আমার প্রস্তাবের প্রচুর পোষকতা হইবে।

তবে, আর এক কথা এই যে আমাদের দেশে ইতিহাসের সম্পূর্ণ অভাব আছে। পূর্ব্বকালেব কথা দূরে যাউক, আমাদের মধ্যে জীবিত বৃদ্ধ লোকের প্রথম কিম্বা মধ্য বয়সে দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল, ভবিষ্যতে তাহাবও ঠিক বৃত্তান্ত পাওয়া দুর্ল্লভ হইবে। ইংরাজের অধীনে দেশীয় কত শত বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় স্বীয় বিভাগে বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন কিন্তু কেহই বঙ্গভাবায় তাঁহার বহুদর্শিতার ফল লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক কিম্বা আহ্লাদের কার্য্য বিবেচনা করেন নাই। আজকাল কত জন কত রূপক, কত নাটক, কত কবিতা লিখিতেছেন : কিন্তু কেহই দেশের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের বৃত্তান্ত সমস্ত আপন আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে বিবৃত করিতে লেখনী ধারণ করেন নাই। অনেকে অনেক বিষয় লেখা অযোগ্য বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারেন, কিন্তু যিনি ভাবীকালে বঙ্গদেশের ইতিহাস লিখিবেন তিনি দেখিবেন যে অনেক তুচ্ছ সংবাদ অভাবে সম্পূর্ণ ইতিহাস অঙ্গহীন থাকিবে। এই বিবেচনায় কেবল বর্ত্তমান পাঠকগণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নহে, কিন্তু ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকদিগের সাহায্যের উদ্দেশে, এই দেশের দস্যুদিগের কীর্ত্তিকলাপের এবং সেই সঙ্গে ভূতপূর্ব্ব পুলিসের কার্য্য-প্রণালীর যতদূর পারি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমি যে কালের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সেই সময়ে বঙ্গদেশের প্রায় সকল জেলাতে ডাকাইতির প্রাচুর্ভাব ছিল এবং

যদিও ইংরাজ শাসনের প্রথমাবস্থায় রঘুনাথ, বৈদ্যনাথ কিম্বা বিশ্বনাথ প্রভৃতি দস্যুগণ যেরূপ অকুতোভয়ে গৃহস্বামীকে পূর্ব্বে সংবাদ পাঠাইয়া ডাকাইতি করিত, এই সময়ে সেই প্রথার অনেক লাঘব হইয়াছিল, তথাপি ডাকাইতি ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল এবং কথনও কথনও অতি নিষ্ঠুর এবং নৃশংস ঘটনা সহকারে তাহা নির্ব্বাহিত হইত। চৌর্য্যভয়ে ধনপ্রবাদ—ছিল বিষম প্রমাদ। সমস্ত জীবনে বহু কষ্টে যে ধন উপার্জ্জিত হইত তাহা এক রাত্রিতে অপহৃত হইত, কিন্তু কেবল ধন লইয়া টানাটানি হইত, এমন নহে, কর্ত্তার এবং পুরজন সকলেরই প্রাণ-বিনাশের আশঙ্কা ছিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া হাড়ভাঙ্গা মুষ্ট্যাঘাত এবং পদাঘাত করিয়া যদি দুরাত্মারা ক্ষান্ত থাকিত তাহা হইলেও যাহা হউক, কিন্তু অল্প ধনে যেমন তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইত না, তেমন গৃহবাসীদিগকে অল্প প্রহার করিয়াও তাহাদের তৃপ্তি হইত না। আকাঙ্ক্ষা পূরিয়া ধন না পাইলে অস্ত্রাঘাত এবং মশাল দিয়া শরীর দগ্ধ করাও তাহাদের অসাধারণ প্রথা ছিল না, এবং এইরূপ গুরুতর এবং নিষ্ঠুর প্রহারের ফল যে কি হইত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। নিষ্ঠুরাচরণ সম্বন্ধে ডাকাইতরা বালক বৃদ্ধ বণিতার বিচার করিত না। অন্তঃকরণে দয়ার কবাট দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া তাহারা ডাকাইতি করিতে যাত্রা করিত। তাহাদের ভয়ে স্ত্রীলোক নাসিকায় নত এবং কর্ণে ঝুমকা কিম্বা অন্যপ্রকার অলঙ্কার পরিয়া রাত্রিতে শয়ন করিত না; কারণ ডাকাইতের হস্তে ধরা পড়িলে দুরাত্মারা তাহাদিগকে অলঙ্কার খুলিবার অবকাশ না দিয়া, সজোরে টানিয়া মাংস ছেদন করত তাহা আত্মসাৎ করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। আমি এইরূপ ছিন্ন-নাসিকা-কর্ণ-বিশিষ্ট দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি। আমার সহিত তাঁহাদের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁহারা উভয়ই বৃদ্ধা ছিলেন, শুনিলাম যে তাঁহাদের যৌবনকালে এই ঘটনা হইয়াছিল।

ডাকাইতি যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল, তাহা তোমাদের এইক্ষণে

সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হওয়া কঠিন। ডাকাইত পড়িয়াছে শুনিলে আক্রান্ত গৃহের লোকের ত কথাই নাই, গ্রামস্থ সর্ব্বলোকের বর্ণনাতিরিক্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইত। বিত্তশালী যাবতীয় মনুষ্য পরিবারদিগকে সঙ্গে করিয়া স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ করত বনের মধ্যে এবং দুর্গম স্থানে যাইয়া লুকাইত। "যাউক ধন, থাকুক প্রাণ" এই নীতি অবলম্বন করিয়া যাহাতে প্রাণ রক্ষা পায়, কেবল তাহারই চেষ্টা করিত। ধন কিম্বা গৃহের দ্রব্য সমস্তের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি করিত না। আমি শুনিয়াছি, যে এক গ্রামে এক বাড়ীতে ডাকাইত পড়িয়াছে বলিয়া পৌষ মাসের রাত্রিতে রব উঠিলে পর, প্রতিবাসী আর একজন ধনী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার স্ত্রী যুবতী কন্যা ও একটি শিশু বালককে কোলে লইয়া গৃহ পরিত্যাগ করত গ্রামের প্রান্তে একটা শৈবালপূর্ণ পুষ্করিণীর জলে প্রবেশ করিল এবং যে পর্য্যন্ত গ্রাম নীরব না হইল, সে পর্য্যন্ত তাহারা সকলে গলা জলে কেবল মাথা জাগাইয়া দুরন্ত শীত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিল।

কেবল গ্রামবাসীদিগের ভীরু স্বভাববশতঃ ডাকাইতরা অনায়াসে তাহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইত। যে যে স্থানে গ্রামের লোকেরা একত্রিত হইয়া দস্যুদিগকে প্রতিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইত, সেই সেই স্থানে অধিবাসীরা জয়লাভ করিত। চোর ও সাধুতে অনেক প্রভেদ। চোরের চিরস্বভাব এই যে তাহারা দুর্ব্বলের যম সবলের গোলাম। অতএব সাধুরা অল্পমাত্র সাহস দেখাইতে পারিলেই চোরে পলাইতে পথ পায় না। ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উলা গ্রাম।

বঙ্গদেশে উলার নাম কে না জানেন এবং উলার বারোয়ারি পূজার কথা কে না শুনিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণে এই গ্রাম স্থিত, এবং কৃষ্ণনগর জেলার নিজ কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও রাণাঘাটের ন্যায় উলাও একটি বৃহৎ জনপদ। ইহাতে বহুসংখ্যক

কুলীন ব্রাহ্মণের বাস এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধনী এবং সম্পত্তি-শালী। বিশেষতঃ বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের ঘর, দেওয়ান মুখোপাধ্যায়দিগের এবং মুস্তৌফিদিগের ঘর খুব প্রসিদ্ধ। বামন-দাস বাবু বড় জমিদার. দেওয়ান মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরাও বিত্তশালী; বিশেষতঃ ইঁহারা বড় বলবান এবং ব্যায়াম-বিদ্যায় নিপুণ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে খ্যাতনামা বলবান রাধা গোয়ালা, দেওয়ান মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের অন্ন খাইয়া এবং তাহাদিগের নিকট ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া মানুষ হইয়াছিল। মুস্তৌফি মহাশয়েরা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ মধ্যে মিত্রবংশোদ্ভব এবং অত্যন্ত মানী এবং সম্পত্তিশালী; এবং ঐ শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে কুলীনও ছিলেন। কিন্তু প্রবাদ আছে যে তাঁহারা কোন সময়ে মাধব বসু নামক একজন কায়স্থ-কুলের ঘটকের মাথা মুণ্ডন করিয়া ঘোল ঢালিয়া দিযাছিলেন এবং সেই আক্রোশে ঘটক মহাশয় প্রতিশোধ লইবার মানসে কুলজী পুথিতে নিম্ন কবিতা ছন্দ লিখিয়া তাঁহাদের কুলে খোঁটা দিয়াছেন—

মুড়ালে মাথা উঠিবে চুল।
তবু না হ'বে মুস্তৌফির কুল ॥

আমি দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ নহি, অতএব ঠিক বলিতে পারি না যে মুস্তৌফি মহাশয়েরা এখনও কুলীন বলিয়া পরিগণিত কি না। যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমনি লিখিলাম।

উলা একটি বিলক্ষণ গণ্ডগ্রাম এবং ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহে পরিপূর্ণ। মহামারীর পূর্ব্বে আমি একদিন অধিক রাত্রিতে কাঁটা-আড়ির ঘাট হইতে বামনদাস বাবুর বাড়ী যাইতে পথিমধ্যে বহু লোক দেখিয়াছিলাম এবং রাস্তায় উভয় পার্শ্বস্থিত বাড়ীতে গীত-বাদ্য শুনিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার কয়েক বৎসর পরে দিবসে সেই পথ দিয়া যাইতে—হায়! কি শোচনীয় দৃশ্য দেখিলাম! পথে লোক নাই, গৃহ সমস্ত জনশূন্য, রবের মধ্যে কেবল এক স্থানে এক দল শৃগালের চীৎকার শুনিলাম।

বামনদাস বাবুব এক পূর্ব্বপুরুষের সময় তাঁহার বাড়ীতে ডাকাইতি হইয়াছিল। ডাকাইত কে তাহা শুনিয়াও পাঠকের বিস্ময় জন্মিবে। সে ভদ্রবংশোদ্ভব এবং কৃষ্ণনগর জেলার একজন উচ্চ কর্ম্মচারীর পুত্র। বালককাল হইতে কুসংসর্গ দোষে কুক্রিয়া সমস্তে রত হইয়া বন্ধুবান্ধব ও বাড়ীঘর পরিত্যাগ করত ডাকাইতেব দলভুক্ত হইয়া ডাকাইতের একজন সর্দ্দার হইয়াছিল। এই ব্যক্তি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে বহু অস্ত্রধারী দস্যু সমভিব্যাহারে ডাকাইতি করিতে প্রবিষ্ট হইল। বাটীর মধ্যে প্রবেশ কবিবার পবে উঠানে একখানা চৌকী আনাইয়া তদুপবি উপবিষ্ট হইল এবং বাড়ীর কর্ত্তাকে ডাকিয়া তাঁহার সমুদয় নগদ টাকা প্রদান করিতে আজ্ঞা করিল। কর্ত্তা চতুরতার সহিত দোতালাব শিঁড়িব দ্বার বন্ধ করিয়া এক তোড়া টাকা লইয়া বাবেন্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থান হইতে এক মুষ্টি এক মুষ্টি কবিয়া উঠানে তাহা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহিব বাডীর প্রাঙ্গণ শানবাঁধান ছিল, অতএব উচ্চ হইতে নিক্ষিপ্ত মুদ্রা সকল উঠানেব চতুর্দ্দিকে ছত্রাকার হইয়া পতিত হওয়াতে ডাকাইতেরা এক একটি করিয়া তাহা তুলিয়া লইতে বাধ্য হইল। কর্ত্তা বুঝিয়াছিলেন যে এই প্রণালীর কার্য্যে ডাকাইতদিগের অনেক সময় ক্ষয় হইবে এবং যত বিলম্ব হয়, ততই ডাকাইতদিগের অমঙ্গল ঘটিবে। ইত্যবসবে গ্রামের লোকেরা যোটবদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ আক্রান্ত বাড়ীর চতুর্দ্দিকে জমা হইতে লাগিল। দশ পাঁচ জন লোক নহে, বহু অস্ত্রধারী মনুষ্য ডাকাইতদিগের চক্ষে পড়িল। বাহির ঘাঁটির পাইক এইরূপ বিভ্রাট দেখিয়া সর্দ্দার বাবুকে জ্ঞাপন করিল। সে তাহাদের সকলকে বাড়ীর ভিতর আসিতে আদেশ করিল। গ্রামস্থ লোকেরা সদব দরজায় এবং গৃহ হইতে বহির্গমনের সমস্ত পথে খড় ও শুষ্ক বাঁশ প্রভৃতি জ্বালনীয় দ্রব্যাদি একত্র করিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া ডাকাইতদিগের পলায়নের পথ অবরুদ্ধ করিয়া প্রত্যেক স্থানে অনেক লোক পাহাঁরা দিতে এবং দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে,

প্রস্তুত হইয়া রহিল। দস্যুরা অপ্রতিভ হইয়া সমস্ত রাত্রি সেই প্রাঙ্গণে কাল যাপন করিল এবং সম্পূর্ণ অনুপায় দেখিয়া প্রাতে আক্রমণকারীদিগের হস্তে ধরা দিয়া অবশেষে কৃষ্ণনগর প্রেরিত হইল। এই অবধি উলা বীরনগর আখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

মুস্তৌফি মহাশয়দিগের বাড়ীতেও এক অসাধারণ ঘটনা হয়। আশাশুনী নামক শান্তিপুরের এক ব্যক্তি সিন্ধ চোরের রাজা হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ব্যাটার দৌরাত্ম্যে কালনা, গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর রাণাঘাট, এবং উলা প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীরা শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আশাশুনী কিন্তু সিন্ধ চুরি ভিন্ন অন্য কোন প্রকার চৌর্য্যবৃত্তিতে রত হইত না, এবং সিন্ধ চুরিতে তাহার অসাধারণ প্রাখর্য্য ছিল। লোকের মনে এমন এক সংস্কার ছিল যে আশাশুনী কি এক মোহিনী-মন্ত্র জানিত এবং সে তদ্দারা জাগ্রত ব্যক্তিকেও অজ্ঞান করিয়া তাহার দ্রব্যাদি অপহরণ করিত, তাহার কোন ব্যাঘাত হইত না: ফলেও সে সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইত। ধনী মনুষ্য ভিন্ন ডাকাইতের ভয় করে না, কিন্তু সকল অবস্থার লোকেই আশাশুনীর ভয় করিত। বর্ণিত সময়ে সকল বিত্তশালী ব্যক্তির গৃহে বিত্ত অনুযায়ী এক কি ততোধিক প্রহরী রাখার প্রথা ছিল এবং মুস্তৌফি মহাশয়দিগের বাড়ীতেও কয়েকজন দেশী সদ্দার ছিল। আশাশুনীর আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছিল এবং সে কুক্ষণে এক রাত্রিতে চুরি করার মানসে তাঁহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ধরা পড়ে। ধৃত ব্যক্তি আশাশুনী বলিয়া ব্যক্ত হওয়াতে মুস্তৌফি মহাশয়েরা তাহাকে কৃষ্ণনগর চালান করার অভিপ্রায় করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বহুকালের প্রহরীরা তৎপ্রতি প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে. তাহা “আমরা কখনও করিতে দিব না। এই ব্যাটার ভয়ে আমরা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারি না, এবং সমস্ত দেশের লোক ইহার ভয়ে সশঙ্কিত। হাকিমের কাছে পাঠাইলে চারি কি পাঁচ বৎসর কারারুদ্ধ থাকিয়া আশাশুনী ফিরিয়া আসিবে

এবং পুনরায় সকলকে জ্বালাতন করিবে, অতএব তাহাকে আমরা বিশেষ শাস্তি দিব যে সে আর কখনও চুরি না করিতে পারে। আপনারা ঘরে যাউন আমরা যাহা জানি তাহা করিব।" এই বলিয়া আশাশুনীকে মণ্ডপঘরের সম্মুখস্থিত যূপকাষ্ঠে ফেলিয়া সন্ধিপূজার ছাগলের ন্যায় 'প্রহরীরা' তাহাকে বলি দিয়া সেই রাত্রিতেই তাহার দেহ জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিল। এখন অনেকে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতে পারেন কিন্তু ধীর ভাবে তৎসাময়িক দেশের অবস্থা সমালোচনা করিয়া দেখিলে, প্রহরীদিগের এই নৃশংস কার্য্য নিতান্ত অযুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ করিবেন না। প্রহরীরা কেবল তাহাদের নিজ শত্রু দূর করিয়াছিল এমন নহে, সাধারণের শত্রুও বিনাশ করিয়াছিল। কথিত হইতে পারে যে প্রহরীরা যেন তাহাদের ইতর-বুদ্ধি অনুযায়ী ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছিল কিন্তু মুস্তৌফি বাড়ীর কর্ত্তাদিগের তাহাতে সম্মতি প্রদান করা উচিত হয় নাই। তাহা সত্য বটে, কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে সেই শান্তি বিপ্লব সময়ে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রহরীর পরামর্শ তাচ্ছিল্য করিতে পারেন নাই; এবং ইহাও নিতান্ত সম্ভব যে প্রহরীরা আশাশুনীকে বলি দিবে বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন নাই।

উলার এই দুই ঘটনার কোন্ ঘটনা অগ্রে, কোন্ ঘটনা পরে হইয়াছিল, তাহা আমি অবগত নহি, কিন্তু এই পর্য্যন্ত জানি, যে উভয় ঘটনাই দীর্ঘ কালের কথা।

ডাকাইতি হইতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত ধনী লোকে অধিক বেতন দিয়া সুশিক্ষিত অস্ত্রধারী খোট্টা এবং দেশীয় প্রহরী নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিরাই "ঘরের ঢেঁকি কুমীর" হইয়া অন্য ডাকাইতকে আহ্বান করিয়া মুনিবের গৃহ আক্রমণ করিতে দিত, এই সকল ঘটনায় গৃহস্বামীর নিস্তার থাকিত না, কারণ ইহারা গৃহের সমস্ত ছিদ্র সন্ধান অবগত হইয়া অক্লেশে এবং সুন্দররূপে অভীষ্ট-সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইত।

উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ইষ্টকালয়ও ডাকাইতি নিবারণের আর এক উপায় ছিল। কাষ্ঠের কবাটে ঘন ঘন মোটা লৌহ পেরেক মারিয়া রাখার প্রথা ছিল, যে দস্যুরা কুঠারাঘাতে তাহা শীঘ্র ছেদন করিতে না পারে। দ্বিতলে উঠিতে সঙ্কীর্ণ শিঁড়ির মাথায় চাপা কবাট ফেলিয়া দৃঢ় কাষ্ঠের হুড়কা দ্বারা তাহা আবদ্ধ রাখিলে নিম্ন হইতে উপরে যাওয়ার পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ থাকিত। এবং ছাদের উপরে ছোট বড় ঝামা ও ইট স্তূপ করিয়া রাখা হইত, যে ডাকাইত পড়িলে ছাদের উপর হইতে তাহা নিক্ষেপ করিলে দস্যুদিগকে দূরীকৃত করিবার এক সহজ এবং সুন্দর উপায় হইত। পল্লীগ্রামে বোধ হয় এখনও অনেক পুরাতন বাটীতে চাপা কবাট এবং লৌহাচ্ছাদিত কবাট দেখিতে পাওয়া যায়

নীচ জাতীয় লোক দ্বারা ডাকাইতের দল গঠিত হয়। মুসলমান, বাগদি, কাওরা, চণ্ডাল, মুচি এবং গোয়ালারা সাধারণতঃ এই অপকার্য্যে অধিক রত।

কৃষ্ণনগর জেলায় অধিকন্তু গোয়ালারাই ডাকাইতি করিত। এই জেলায় গোপ-জাতীয় বহুলোকের বাস; তন্মধ্যে "গড়ো গোয়ালারা" শরীরের গঠন, বল ও সাহসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই নিমিত্ত "গোড় গোয়ালা" উপমার বাক্য হইয়া উঠিয়াছে। শান্তিপুরের গড হইতে এই বংশীয় গোয়ালারা "গোড় গোয়ালা" আখ্যাতি প্রাপ্ত হয়। বোধহয় পূর্ব্বকালে ঐ গড় রক্ষার্থে একদল গোয়ালাকে তাহার মধ্যে বাস করিবার স্থান প্রদত্ত হইয়াছিল, কাল সহকারে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হওয়াতে কৃষ্ণনগর জেলার নানা স্থানে তাহারা বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এইক্ষণ ঐ প্রদেশের এমন গ্রাম নাই যাহাতে দুই চারি ঘর গোয়ালার বাস নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহাদের আকার প্রকৃতি সমান রহিয়াছে। দীর্ঘচ্ছন্দ, ক্ষীণকটি, প্রশস্ত বক্ষ, শ্যামবর্ণ, ইহাই তাহাদের সাধারণ আকৃতি। ইহারা যেমন দ্রুতবেগে দৌড়িতে পারে, লাঠির ভর করিয়া লম্ফ দিতে পারে,

এবং লাঠি খেলায় স্ফূর্ত্তি দেখায়, বাঙ্গালীর মধ্যে তেমন অন্য কোন জাতিই পারে না, এবং এই নিমিত্ত গোয়ালারা বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর জেলার গোয়ালারা উৎকৃষ্ট লাঠিয়াল বলিয়া পরিগণিত। যেমন যশোহর জেলার মুসলমানেরা শড়কিওয়ালা বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সেইরূপ কৃষ্ণনগর জেলার গোয়ালারা লাঠিয়াল বলিয়া আদরিত ছিল। জাতীয় ব্যবসায়ে গোয়ালাদিগের অন্য জাতীয় পুরুষ হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রম করিতে হয়। ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্য অধিকাংশই স্ত্রীলোক দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, পুরুষেরা কেবল একগাছা পাচন (লাঠি) হস্তে করিয়া গরু কিম্বা মহিষের পাল লইয়া মাঠে মাঠে ভ্রমণ করে। সর্ব্বদা অনাবৃত নূতন নূতন স্থানে নির্ম্মল বায়ু সেবন করে, পশ্বাদির পশ্চাতে দৌড়ঝাঁপ করে এবং উদর পূর্ণ করিয়া দুগ্ধ পান করে; এমন কি পান্তাভাতের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া খায়। ইহার সকল কার্য্যই স্বাস্থ্যকর এবং বল-প্রদায়ক, কাজেই লাঠিয়ালি করিতে তাহাদের বিশিষ্ট উপযোগিতা হয়: ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন প্রচলনের পূর্ব্বে যখন জমিদার ও নীলকরদিগের সর্ব্বদা দাঙ্গা হাঙ্গামা করার রীতি ছিল, তখন এই সকল লোকের বিস্তর আদর ছিল, সুতরাং অনেকেই অধিক বেতন এবং লুটের লোভে এই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত; এবং ব্যক্তি বিশেষের প্রকৃতি অনুসারে এক কুবৃত্তি হইতে অব্যবহিত অধম কার্য্যে অধোগমন করা বড় বিচিত্র কিম্বা কঠিন ব্যাপার ছিল না। দিবসে লাঠিয়ালি, রাত্রিতে ডাকাইতি, উভয় কার্য্যই এই সকল ব্যক্তির নিকট আদরণীয় এবং অনায়াস-সাধ্য ছিল। বিশেষতঃ আপদে বিপদে ইহারা জমিদার এবং নীলকরের নিকট বিস্তর সহায়তা পাইত। কোনও মোকদ্দমায় নামাঙ্কিত হইলে পুলিসের হস্তে রক্ষা করার নিমিত্ত তাঁহারা প্রথমে লাঠিয়ালদিগকে স্বীয় স্বীয় বাড়ীতে কিম্বা কুঠিতে আশ্রয় দিয়া গোপন করিয়া রাখিতেন, অবশেষে ধৃত হইলে কর্ম্মচারীর দ্বারা সাফাই সাক্ষ্য দেওয়াইয়া,

তাহাদিগকে আদালত হইতে খালাস করাইতে যত্ন করিতেন। এইরূপ প্রশ্রয় পাইয়া দুরাত্মারা ক্রমশঃ পাকা ডাকাইত হইয়া উঠিত এবং কি প্রণালীতে কার্য্য কবিলে পুলিসেব হস্তে অব্যাহতি পাওয়ার সম্ভাবনা, তাহা তাহারা বিলক্ষণ বুঝিয়া লইত, সুতরাং অনেক সময় ইহাদের চতুবতা নিবন্ধন পুলিসের চেষ্টা নিষ্ফলা হইত, এবং দুষ্টেবা গায় ফুঁ দিয়া যাবজ্জীবন নিরাপদে বেড়াইয়া বেড়াইত।

কৃষ্ণনগব জেলার মধ্যে শান্তিপুর, কৃষ্ণপুব, মায়াকোল, বাহাদুরপুর, ধবুলিয়া, মহাবাজপুর, বিক্রমপুর প্রভৃতি গ্রামেব গোয়ালারা শ্রেষ্ঠ লাঠিয়াল এবং সেই সময়ে মনোহর, মাণিক, নয়ান, গলাকাটা হরিশ প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ডাকাইত ছিল।

কৃষ্ণনগর জেলাব মধ্য দিয়া তিনটি সুন্দর নদী বহমান আছে। প্রথম পবিত্র ভাগীবথী, দ্বিতীয় জলঙ্গী অথবা খড়িয়া এবং তৃতীয় মাথাভাঙ্গা,—উহা কোনও স্থানে পাঙ্গাসিয়া নামে এবং হাঁসখালী ও ও রাণাঘাট অঞ্চলে চূর্ণী নদী বলিয়া অভিহিত। এ তিন নদী পদ্মা নদী হইতে বহির্গত হইয়াছে। এইক্ষণ পদ্মার দক্ষিণ কূলে চডা পড়িয়া তিন নদীবই মোহানা বন্ধ হওয়াতে শুষ্ককালে এই সকল নদীর মধ্য দিয়া নৌকা যাতায়াতের কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন মোহানা খোলা ছিল, এবং রেলের রাস্তা এবং কলের জাহাজ না থাকাতে, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের সমুদয় পণ্যদ্রব্যাদি নৌকা যোগে এই তিন নদী দিয়া কলিকাতায় আসিত এবং তথা হইতে নানা স্থানে যাইত। বিশেষতঃ পদ্মার এবং এই তিন নদীর উভয় তটে বহু হাট বাজার ও গঞ্জ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই সকল স্থলে যাত্রী এবং নাবিকদিগের খাদ্য এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাইত, কাজেই লোকে সুন্দরবনের কষ্টজনক পথ উপেক্ষা করিয়া এই সকল পথ অবলম্বন করিত। সুতরাং ভাগীরথী ও খড়িয়া ও চূর্ণীর গর্ভ, সকল সময়ে সকল প্রকার নৌকায় পরিপূর্ণ থাকিত এবং তাহাতে

দস্যুদিগেরও প্রলোভন জন্মিত। নির্জ্জন স্থানে এবং অসাবধান অবস্থায় পাইলে দস্যুরা নৌকা আক্রমণ করিতে এবং যাত্রীদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে ত্রুটি কবিত না। এইজন্য কৃষ্ণনগর জেলায় যেমন ডাঙ্গাতে, সেইরূপ জলপথেও ডাকাইতির অভাব ছিল না। কিন্তু শেষোক্ত ঘটনা সকল সর্ব্বদা জেলার কর্ত্তাদিগের কর্ণ-গোচর হইত না, কারণ বিদেশী যাত্রীরা কোথায় হাকিম, তাহার অনুসন্ধানে সময় নষ্ট করা এবং জানিতে পারিলেও নালিশ করা—কেবল পণ্ডশ্রম বিবেচনা করিয়া যত শীঘ্র পারে, স্বীয় স্বীয় বাঞ্ছিত স্থানে গমন করিত।

আমি নবদ্বীপের দারোগা হই

আমি ইংরাজী ১৮৫৩ সালেব ভাদ্র মাসে নবদ্বীপ থানার দাবোগা হই। থানা নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর জেলাব শান্তিপুর মহকুমাব অধীন, এবং কৃষ্ণনগবেব পশ্চিম চাবি ক্রোশের মধ্যে ভাগীবথী ও খড়িয়া নদীব সম্মিলন স্থানে, ভাগীবথীর পশ্চিম পারে নবদ্বীপ স্থিত। কিন্তু যে স্থানে বত্তমান নবদ্বীপ বিবাজমান সে স্থানে নিশ্চয়ই প্রাচীন নবদ্বীপ ছিল না। আধুনিক নগরের কোন্ দিকে আদিশূব প্রভৃতি হিন্দু বাজাদিগেব বাসস্থান ছিল, তাহার কিছুমাত্র ঠিকানা নাই। জনশ্রুতি আছে যে বল্লালদীঘি নামে নবদ্বীপের উত্তবে যে একখানা ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, সেই স্থানে উক্ত বাজাদিগের আবাস ছিল, এবং সেই গ্রামেব সম্মুখস্থিত মাটিব এক বৃহৎ স্তূপ দেখাইয়া লোকে বলে, যে এই স্তূপ বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশিষ্ট। এরূপ একটি কিম্বদন্তী আছে যে পূর্ব্বে কৃষকেরা ঐ স্থলের মৃত্তিকা কর্ষণ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে মুদ্রা এবং রত্নাদি পাইত। এই অঞ্চলের মনুষ্যেব মধ্যে এই কথায় এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে তাহা শুনিয়া স্বজনপুরের নীলকুঠীর মালিক মেঃ ডুবেপ ডি ডম্বল নামক একজন ফরাসীস সাহেবের এক পুত্র এই স্তূপ ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, যে তাহা হইলে তিনি তাঁহার স্বদেশীয় বিদ্বান মণ্ডলীতে বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের অধিকারী বলিয়া গৌববান্বিত হইবেন এবং সেই অভিপ্রায়ে তিনি বাস্তবিক আমার দ্বারা মহারাজা সতীশচন্দ্র বাহাদুরের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজা তাহাতে সম্মত হইলেন না। আদিশূর বল্লালসেন প্রভৃতি রাজার কথা দূরে থাক, গত চারিশত

বৎসরের মধ্যে যে মহাপুরুষ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে নবদ্বীপ বঙ্গদেশের অন্যস্থান অপেক্ষা এত অধিক গৌরবশালী এবং পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে, সেই চৈতন্য প্রভুর জন্মগৃহ, পাঠগৃহ এবং লীলার স্থান কোথায় ছিল তাহাও এক্ষণে কেহ জানে না। যে নবদ্বীপের ধূলি ভক্তবৃন্দে পবিত্র রজ বলিয়া শিরে ধারণ করে, সেই স্থানে মহাপ্রভু কখনও পদপ্রক্ষেপ করিয়াছিলেন কিনা, তাহা তাঁহাদের কিছুমাত্র অনুধাবন নাই। আমরা জানি যে আমাদের দেশের নদী সমস্তের পরিবর্ত্তনশীল গতির জন্য শুদ্ধ নবদ্বীপের বলিয়া নয়, নদীতীরস্থ সকল জনপদেরই সীমানার ব্যতিক্রম হয় এবং মূর্ত্তির রূপান্তর হইয়া যায়। তথাপি নবদ্বীপের ন্যায় প্রসিদ্ধ স্থান সকল সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ ইতিহাস কিম্বা বিশ্বস্ত জনশ্রুতি থাকা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর অনেক বৃত্তান্ত আছে কিন্তু তৎসাময়িক নবদ্বীপের ভৌগোলিক বিন্যাস এককালে নাই। গ্রন্থকর্ত্তা বোধ হয় এই সকল বিষয় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু তিনি যাহা তুচ্ছ বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট এক্ষণে কত গুরুতর কথা বলিয়া বোধ হইতেছে।*

নবদ্বীপবাক্যার্থে বুঝা যায়, আদিকালে এই স্থান জলবেষ্টিত ছিল এবং এখনও তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান

* ইংরাজীতে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন যে প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি বিশেষ অঙ্গ। দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশে রোমীয় সেনাপতি ও সম্রাটেরা যে সকল দুর্গ ও বর্ত্ম নির্ম্মাণ এবং শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয়ার্থ সাহেবেরা কত মাপ, পরিমাণ, মৃত্তিকা খনন, বাদানুবাদ এবং পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন, তাহার অন্ত নাই। যে সময়ে বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়, সেই সময়ে ইংলণ্ডে মহাকবি সেক্‌স্পিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের হস্তে চৈতন্যদেবের কিছুমাত্র চিহ্ন রক্ষিত হয় নাই কিন্তু ইংরাজেরা আবন গ্রামে সেক্‌স্পিয়ারের জন্মগৃহ এখন পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর মেরামত করিয়া পবিত্র দেব মন্দিরের ন্যায় রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অদ্বিতীয় বিজ্ঞানবিৎ নিউটন যে কলমে লিখিতেন, ন্যাপোলিয়ান বোনাপার্ট যে যুদ্ধে যে তরবারী ব্যবহার করিয়াছিলেন—তাহাও যত্নে রক্ষিত আছে। আমাদের দেশেও এইরূপ দ্রব্য সমস্ত এক্ষণে সংগ্রহ এবং রক্ষা করার উদ্যোগে

নবদ্বীপের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী, পশ্চিমে পোলতার বিল ; উহা পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ভাগীরথী নদী ছিল ; এই বিল পশ্চিম হইতে দক্ষিণ দিক দিয়া পুনরায় ভাগীরথীর সহিত মিলিত হয়।

আধুনিক নবদ্বীপ তিন খণ্ডে বিভক্ত,—নদিয়া, বুঁইচ পাড়া এবং তেঘরি ; তন্মধ্যে নদিয়াই প্রধান। ইহাতে বহু ইষ্টকালয় অনেক মঠমন্দির, চৌপাড়ি আছে এবং বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, শিল্পজীবী ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ধনী লোকের বাস ; ফল, এই অঞ্চলের মধ্যে নবদ্বীপ একটি বিলক্ষণ ধনাঢ্য স্থান।

নবদ্বীপ থানার এলাকা বিস্তীর্ণ ছিল না সুতরাং ইহাতে অল্প পুলিশ আমলা নিয়োজিত ছিল : কেবল একজন দারোগা ও পাঁচজন বরকন্দাজ ভিন্ন, অন্য থানার ন্যায় ইহাতে নাএব দারোগা কিম্বা জমাদার ছিল না। তখন বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার সমুদয় পুলিশের উপরে বৃদ্ধ ড্যাম্পিয়ার সাহেব (পাঠকদের পরিচিত রেবেনিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর ড্যাম্পিয়ার সাহেবের পিতা) সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ আখ্যায় সর্ব্বে-সর্ব্বা কর্ত্তা। সি, টি, মণ্ট্রে,-সর সাহেব কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট ও বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল শান্তি-পুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি ভাদ্র মাসে দারোগা হই। নবদ্বীপে আমার পরিচিত কএকজন ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহারা কোথায় আমাকে দেখিয়া আহ্লাদের কথা বলিবেন, না, বরং দুঃখ প্রকাশ

আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। মহাত্মা রামমোহন রায়ের হস্তলিপি এবং ব্যবহৃত অনেক দ্রব্য বোধ হয় তাহার পৌত্রদ্বয় হরিমোহন ও প্যারিমোহন বাবু ইচ্ছা করিলে সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিতে পারেন। সেইরূপে ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, নিধুবাবু, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি খ্যাতনামা বাঙ্গালীর বংশধর এবং বন্ধুবান্ধবগণের যত্নে তাঁহাদের চিহ্ন সকল সংগৃহীত হইতে পারে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে অনতিবিলম্বে কলিকাতায় বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ মনুষ্যদিগের পরিত্যক্ত দ্রব্য সমস্ত সঙ্কলনের এবং রক্ষার জন্য স্থান করিবার আবশ্যক হইবে এবং তখন এই সকল বস্তু অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।

করিয়া বলিলেন, যে আমি অতি মন্দ সময়ে এই কার্য্য-গ্রহণ করিয়াছি। কারণ পূজা সম্মুখে। গত কয়েক বৎসরাবধি এই সময়ে গ্রামের লোক চুরি ডাকাইতির আশঙ্কায় অস্থির হইয়াছিল এবং উপস্থিত বৎসরেও তাহাদের সে আশঙ্কা স্থায়ী আছে ; বিশেষ আশঙ্কার কারণ এই যে, আমি নূতন দারোগা, কে চোর, কে সাধু, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ, কাজেই এমন সংশয় সময়ে আমার দ্বারা শান্তি রক্ষিত হওয়া অসাধ্য না হইলেও, দুরূহ কার্য্য হইবে। কিন্তু তাঁহারা আরও বলিলেন যে নবদ্বীপের মধ্যে বদমায়েস অতি অল্প আছে, কেবল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে দস্যুরা আসিয়া ইহাতে চুরি ডাকাইতি করে। দস্যুদিগের নবদ্বীপে ডাকাইতি করার একটি সুবিধা এই ছিল, যে ভাগীরথীর পশ্চিমতটে নবদ্বীপের উপরি উক্ত তিনখানা গ্রাম ভিন্ন, অন্য কোন গ্রাম কৃষ্ণনগর জেলার অধীন ছিল না ; পার্শ্ববর্ত্তী সকল গ্রামই বর্দ্ধমান জেলাভুক্ত ; নবদ্বীপের পুলিশ আমলাকে বর্দ্ধমান জেলার কোন ব্যক্তিকে ধরিতে হইলে, ঐ জেলার পুলিশের সহায়তা লইয়া কার্য্য করিতে হইত ; কাজেই অনেক বিলম্ব হইত এবং তাহাতে দস্যুরা সাবধান হইতে অবকাশ পাইত।

এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমি নিতান্ত ভীত হইলাম। কি উপায় অবলম্বন করিলে গ্রামের শান্তি ও আমার চাকরি রক্ষা পাইবে তাহা, শীঘ্র স্থির করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। পরামর্শ করিবার কিম্বা উপদেশ লইবার জন্য আমার অধীনস্থ চারিজন বরকন্দাজ ভিন্ন অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি নিকটে ছিল না ; কিন্তু পূজার সময়ে কিসে দশ টাকা হস্তগত হইবে, সেই চিন্তায় তাহারা ব্যাকুল, এবং তাহাদের ভাব গতিকে আমার বোধ হইল, যে গ্রামে এই সময়ে একটা শান্তিভঙ্গের ঘটনা উপস্থিত হইলেই তাহাদের রোজগারের সুন্দর একটি পন্থা হয়। অন্যান্য থানায় নায়েব, দারোগা, জমাদার এবং অন্যূন ১৫ জন বরকন্দাজ থাকে,

কিন্তু আমার ভাগ্যে আমার থানায় "দাদা বৈ পাইক নাই।" তথাপি আমার এই ভয়ঙ্কর অমানিশার অন্ধকার মধ্যে একমাত্র আশাপ্রদ রশ্মি ছিল,—গ্রাম্য চৌকীদার। থানার ৪ জন বরকন্দাজ যেমন ক্ষীণকায়, স্বার্থপর এবং অকর্ম্মণ্য,—চৌকীদারেরা ঠিক তাহার বিপরীত। সাধারণতঃ তাহারা বলিষ্ঠকায়, কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং পরিশ্রমী, তাহাদের স্ব স্ব চৌকীর লোক নিরাপদে থাকিবে, তাহাই তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, এবং আমার নিকট তাহারা অনেকে প্রকাশ করিল যে, ভিন্ন জেলার লোকে আসিয়া তাহাদের গ্রামে দস্যুবৃত্তি করিয়া যায়, ইহাতে তাহাদের অত্যন্ত লজ্জা এবং দুঃখ হয়, এবং কহিল যে, যদি আমি তাহাদের উপদেশ গ্রহণ এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিকালে সমান পরিশ্রম করিতে স্বীকার করি, তাহা হইলে যাহাতে এই আশঙ্কার কাল নির্ব্বিঘ্নে কাটিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাহারা যত্নের ত্রুটি করিবে না। চৌকীদারদিগের মুখে এইরূপ আশ্বাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মনে সাহসের উদয় হইল এবং তাহাদের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিলাম।

সৌভাগ্যক্রমে আমার আর একটি সুবিধা উপস্থিত হইল। আমার অন্নদাতা মাতুল কৃষ্ণনগর জেলায় একজন উচ্চ শ্রেণীর গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি প্রতি বৎসর পূজার সময় নৌকা পথে দেশে যাইতেন এবং দস্যু ভয়ে স্বীয় রক্ষার্থ তিন চারি-জন এই অঞ্চলের সুশিক্ষিত লাঠিয়াল সর্দ্দার নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে লইতেন। আমিও মাতুলের সঙ্গে বাড়ী যাইতাম। পথিমধ্যে সর্দ্দারদিগের সহিত আমার সর্ব্বদা কথোপকথন হইত এবং তাহারা আমার অল্প বয়স দেখিয়া নিঃশঙ্কায় কে কি প্রকারে ডাকাইতি এবং লাঠিয়ালি করিয়াছিল, তাহা অকপটে আমার নিকট বর্ণনা করিত। এমন এক বার নহে ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই সর্দ্দার কয়েকজন আমাদের সমভিব্যাহারে যাতায়াত করিয়াছিল এবং প্রতিবারে আমি তাহাদের মুখে তাহাদের কীর্ত্তিকলাপের গল্প

শুনিতাম। তখন কে জানিত, যে অল্প কালের মধ্যে আমি নবদ্বীপের দারোগা হইয়া তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে বসিব। তাহারাই যে গ্রাম্য চৌকীদার ছিল, তাহাও সে সময়ে আমি জানিতাম না, পরে শুনিলাম, যে অধিক বেতনের লোভে তাহারা থানা হইতে বিদায় লইয়া আমাদের সঙ্গে যাইত। এই চারি ব্যক্তির মধ্যে তিনজন অর্থাৎ রাজকুমার বাগদী, শ্রীনাথ (ছিরু) বাগদী ও হারান খাঁ নবদ্বীপ থানার অধীন তিনটি গ্রামের চৌকীদার ছিল। চতুর্থ ব্যক্তি বর্দ্ধমান জেলায় বাস করিত। উহারা তিনজনেই সরল চিত্তে আমার হিতসাধন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

এদিকে ক্রমশঃ অপর পক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম যে নিজ গ্রামের লোকের দ্বারা গ্রামের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পার্শ্ববর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার গ্রামস্থ দস্যুদিগের গতিরোধ করিতে পারিলেই নবদ্বীপের শান্তি সাধন করিতে সক্ষম হইব। এই কল্পনায় অন্ধকার পক্ষের প্রথম রাত্রি হইতে থানায় এক প্রহরের ডঙ্কা দিয়া, রামকুমার ছিরু প্রভৃতি ২০ জন উৎকৃষ্ট চৌকীদার, একটা বন্দুক ও চারিটা মশাল ও তাহার উপযোগী তৈল ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কোনও দিন চারি এবং কোনও দিন পাঁচ দলে বিভক্ত হইয়া নবদ্বীপকে এক প্রকার বেষ্টন করত সমস্ত রাত্রি চৌকী দিতে আরম্ভ করিলাম। চুরি ডাকাইতি হইয়া গেলে পরে দস্যুদিগকে ধৃত করিয়া দণ্ডনীয় করিতে পারিলে যে পরিমাণে হিত সাধিত হয়, তদপেক্ষা আমার বিবেচনায় ঐ সকল ঘটনা যাহাতে আদৌ হইতে না পারে, তাহার চেষ্টা করাই অধিকতর হিতকর কার্য্য। অতএব যাহাতে দস্যুগণ বুঝিতে এবং জানিতে পারে যে আমরা সতর্ক এবং দলে বলে তাহাদিগের গতিরোধ করিতে সম্যকরূপে প্রস্তুত আছি, তাহা করিতে ত্রুটি করিলাম না। দণ্ডে দণ্ডে প্রত্যেক দল আপন আড্ডা হইতে পাইকি হাঁকে ডাক ছাড়িত এবং এক দলের চীৎকার শুনিলে আর সকল দল এবং গ্রামের ভিতর

চৌকীদারেরাও তাহার অনুকরণ করিত এবং দুই একবার আমি বন্দুকেরও শব্দ করিতাম। এইরূপ শোরগোল করিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতাম এবং তদ্দ্বারা শত্রুরাও জানিতে পারিত, যে আমরা তাহাদের নিমিত্ত বিলক্ষণ সাবধানের সহিত প্রস্তুত আছি। ঘোর নিশাকালে জনশূন্য প্রান্তরের মধ্যে যখন রামকুমার কিম্বা ছিরুর 'রে রে' ধ্বনি অন্ধকার ভেদ করিয়া গগনে উঠিত, তখন আমাদের সকলের মনে সাহস হইত, যে দস্যুরা আগমন করিলেও আমরা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিব। এই দুর্ভোগের কষ্ট সমস্ত কষ্ট বলিয়া বোধ করিতাম না। যখন আলোক-শূন্য, কেউটিয়া ভরা ক্ষেত্রের পিচ্ছিল আলের উপর দিয়া গমনাগমন করিতাম, তখন সেই একমাত্র মহীয়সী চিন্তা—নবদ্বীপবাসীগণের মঙ্গল চিন্তা—ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনে আসে নাই। সর্পে দংশন করিবে, কিম্বা ডাকাইতের হস্তে প্রাণ হারাইব এবং তাহা হইলে বাটিতে যে বৃদ্ধা জননী, যুবতী স্ত্রী, এবং নবজাতক পুত্র রাখিয়া আসিয়াছি তাহাদের কি উপায় হইবে—ইহা ভ্রমেও মনে আসিত না। যখন অধিক রাত্রিতে নিদ্রায় আক্রান্ত হইতাম, ও বসিবার স্থান অভাবে কেবল পদব্রজে ৬।৭ ঘণ্টা ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে শরীর অবসন্ন হইত, তখন চৌকীদারদিগের দা-কোটা তামাকুতে ঘুটীর আগুনে হুকা অভাবে হস্ত হুকা করিয়া সজোরে দুই চারি টান দিলেই সকল ক্লেশ দূর হইত, এবং সেই তামাকুই বা কত মিষ্ট বোধ হইত। বহুকাল পরে মুরশিদাবাদের নবাববাড়ীর সুবাসিত তামাকু খাইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা চৌকীদারদিগের সেই তামাকের তুল্য সুরস বোধ হয় নাই।

কৃষ্ণপক্ষ যতই নির্বিঘ্নে শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, ততই আমার মনে হইল যে বুঝি বনের বাঘ মিথ্যা, কেবল মনের বাঘের ভয়ে আমাদের এই সমস্ত পণ্ডশ্রম করা হইতেছে; কিন্তু অনতিবিলম্বেই আমার সে ভ্রম দূর হইল। ত্রয়োদশী কি চতুর্দ্দশীর রাত্রি দুই প্রহরের

পরে টিপী টিপী বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ হইল। আচ্ছাদন অভাবে আমরা সকলেই কষ্টবোধ করিতে লাগিলাম। সঙ্গে যে দুইজন বরকন্দাজ ছিলেন, তাঁহারা চৌকীদারদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া আমাকে থানায় প্রত্যাগমন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, এক যাত্রায় পৃথক ফল হইলে, উচিত কার্য্য হইবে না। বিশেষ আমি কার্য্যস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইলে পাছে সমভিব্যাহারী অধিকাংশ ব্যক্তিই আমার পথে অনুগমন করে, তাহা হইলে বিভ্রাট হওয়ার সম্ভাবনা, এই বিবেচনায় আমি বরকন্দাজ মহাশয়দ্বয়ের পরামর্শ অগ্রাহ্য করত নিকটে কাহারও জানিত উপযুক্ত স্থান আছে কিনা অনুসন্ধান করাতে শুনিলাম, যে কিছু দূরে আরও পশ্চিমদিকে আউশ ধান্য মাড়িবার এক খামারবাড়ী আছে, তথায় যাইতে পারিলে, একখানা একচালা পাওয়া যাইতে পারে। তদনুসারে একজন বরকন্দাজ ও একজন চৌকীদার লইয়া খামারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যে সেখানে সেই গভীর রাত্রিতে দুইজন মানুষ বসিয়া তামাকু খাইতেছে, জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে তাহারা ধান পহর দিতেছে। অন্ধকারে তাহাদিগের আকার কিম্বা মূর্ত্তি কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। কেবল এইমাত্র বুঝিলাম, যে আমাদের আগমনে তাহারা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে ব্যগ্র হইল। কিন্তু আমাদের সম্ভাষণ বাক্যে তাহারা আমাকে ভাল করিয়া এক ছিলাম তামাকু খাওয়াইবার যোগাড় করিল। ইতিমধ্যে আমরা যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথে আগন্তুক কয়েক ব্যক্তির পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে "কে" বলিয়া জিজ্ঞাসা করাতে অল্প দূর হইতে প্রত্যুত্তর আসিল যে "আমি রামকুমার।" এই বাক্য শুনিবামাত্রেই ঐ দুই ব্যক্তি কোনও বাক্যব্যয় না করিয়া দুই-জনেই এক সামরিক লম্ফ দিয়া চালা হইতে নির্গত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করিল। আমি অমনি "ধর" বলিয়া চীৎকার করাতে আমার সঙ্গী বরকন্দাজ তাঁহার ঢাল তরবার লইয়া দৌড়িয়া

যাইতে খামারের মধ্য স্থানে যে এক একটা বাঁশের খুটি পোতা ছিল তাহা অন্ধকারে ঠক করিয়া তাঁহার মস্তকে লাগাতে তাঁহাকে লাঠি মারিল, বিবেচনায় ভয়ে "দারোগা মশাই মেলে গো" বলিয়া ভূমিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু চৌকীদাব কিছুদূর পর্য্যন্ত পলাতক ব্যক্তিদ্বয়ের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং প্রকাশ করিল যে অন্ধকাবে সে কিছুই ঠিকানা করিতে পারিল না।

রামকুমার চৌকীদার আসিয়া উপস্থিত হইলে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিল যে 'এ ব্যাটারা অবশ্যই মনোহর এবং তাহার একজন সঙ্গী হইবে, আমি দেখিলে তাহাদের চিনিতে পারিব ভয়ে, তাহারা শশব্যস্তে পলায়ন কবিয়াছে।" রামকুমারের কথা সঙ্গত বিবেচনায় আমি তাহাদিগকে লইয়া পূর্ব্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলাম এবং প্রথম রাত্রিতে আমার মনে যে অভয় উদয় হইয়াছিল তাহা শেষ রাত্রির এই ঘটনা দেখিয়া একেবারে বিলুপ্ত হওয়ায় আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সতর্কতার সহিত বোঁদ পাহারা দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১৬ রাত্রি অতিক্রান্ত; হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া কাটাইয়া অবশেষে দেবীপক্ষের দেখা পাইলাম। ভাবিলাম এখন পবিশ্রমের লাঘব হইবে, কিন্তু আমার সে আশায় ছাই পড়িল। চতুর্থীর প্রাতে সংবাদ পাইলাম যে গত রাত্রিতে বল্লালদীঘির ওপারে গঙ্গার নূতন চড়াব মধ্যস্থিত এক খাড়িতে একখানা মহাজনী নৌকায় ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমা একখানা পাটুলী নৌকা কলিকাতা হইতে এক সাহেবের চালানী বাক্সবন্দী বিলাতী সরাপ বোঝাই লইয়া কাশী যাইতেছিল। বিদেশী, বিশেষ খোট্টা মাঝি-মাল্লা স্থানীয় অবস্থা জ্ঞাত না থাকাতে, কিছু বেলা থাকিতে নবদ্বীপ পৌঁছিয়া মিথ্যা কালক্ষয় না কবার অভিলাষে, যতদূর সাধ্য যাইতে যাইতে দিবা অবসান সময়ে এই খাড়ির মধ্যে লাগান

করিয়াছিল। রাত্রিতে দস্যুরা আক্রমণ করিয়া নাবিকদিগের যে যে দ্রব্য অপহরণের উপযুক্ত তাহ, এবং ৫টা সরাপের বাক্স লইয়া প্রস্থান করে। পরে সপ্তমী পূজার রাত্রিতে উপরিউক্ত ঘটনার স্থানের নিকটবর্ত্তী আব এক স্থানে শাল কাষ্ঠের কড়ি বরগা বোঝাই আব একখানা ঐরূপ পশ্চিমা নৌকা লাগান দেখিয়া ডাকাইতেরা তাহাও আক্রমণ করে কিন্তু তাহাতে অপহরণের উপযুক্ত দ্রব্যাদি না পাওয়াতে এবং খোট্টা নাবিকেরা তাহাদের প্রথমে বাধা দিয়াছিল বলিয়া সেই আক্রোশে মারপিটেব দ্বারা তাহাদিগকে নৌকা হইতে তাড়াইয়া দিয়া, নৌকায় ও কাষ্ঠে আগুন লাগাইয়া দিয়া চলিয়া যায়।

অগ্নি প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরিয়া জ্বলিয়াছিল এবং আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও বোঝাই মালের কিয়দংশ বাঁচাইতে পারিলাম না। যে স্থানে এই দুই ঘটনা হয়,—তাহার চতুর্দ্দিকে মনুষ্যের বাস ছিল না।

এক সপ্তাহের মধ্যে দুইটি নৌকায় ডাকাইতি সংবাদ পাইয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট এবং আমার অব্যবহিত উপরিস্থিত হাকিম শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া ভবিষ্যতে খুব সতর্ক থাকিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন না, যে ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে অধিক সতর্ক হওয়া সাধ্যাতিরিক্ত ছিল।

যাহা হউক আমার অত্যন্ত উৎসাহ ভঙ্গ হইল। দেখিলাম যে গত কয়েক রাত্রির ন্যায় প্রত্যহ রাত্রিতে একাকী আমার এইরূপ পরিশ্রম করা অসাধ্য হইবে। লোকে যাহা বলিত তাহাই প্রতিপন্ন হইল। এই সকল ডাকাইতির মূল বিনাশ করিতে না পারিলে কেবল চৌকী পাহারা দিয়া নবদ্বীপ রক্ষা করা যাইতে পারিবে না এবং অধিবাসীগণেরও চিত্তের আশঙ্কা দূর হইবে না। সেই মূল কে তাহা বিবৃত করার উদ্দেশ্যেই ভূমিকা স্বরূপে আমার এই প্রবন্ধ লেখা হইল।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে যে খামারে রামকুমার চৌকীদার দুইজন অপরিচিত মনুষ্যের বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র মনোহরের নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, এবং "মনোহর কে ?" বলিয়া আমি জিজ্ঞাসা করাতে, সে তখন সংক্ষেপে উত্তর করে যে "আপনি যেমন পুলিশের মধ্যে, মনোহরও সেইরূপ চোর ডাকাইতের মধ্যে দারোগা।" সাধারণ লোকেরও সেই বিশ্বাস ছিল। মনোহর কে তাহার শেষ কীর্ত্তি কি এবং যে ঘটনায় এবং যে প্রণালীতে তাহাকে দেশ ছাড়া করার কার্য্য আমার ভাগ্যে হইল, তাহা আমি ইহার পরে বর্ণনা করিব।

মনোহর ঘোষ

মনোহর ঘোষ জাতিতে গোয়ালা ; একডালা পরাণপুর গ্রামে তাহার বাসস্থান ছিল। নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একডালা পরাণপুর, পূর্ব্বস্থলী,—যাহার অন্যতর নাম পূবধুল, চুপি, কাঁকশিয়ালী, গুপীপুর, মেড়তলা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম মালার দানার ন্যায় পাশাপাশি একছত্রে ভাগীরথীর কূলে স্থিত। সকল গ্রামেই ভদ্র বিশিষ্ট লোকের বাস। পূবধুল গ্রামে পূবধুল থানা সংস্থাপিত ছিল ; এবং এই গ্রাম বঙ্গভাষার প্রসিদ্ধ লেখক মৃত অক্ষয়কুমার দত্তের জন্মস্থান। গঙ্গাপারে বঙ্গজ কায়স্থদিগের বাস অতি বিরল কিন্তু পূর্ব্বস্থলীতে একঘর বঙ্গজ কায়স্থ স্থাপিত ছিল এবং অক্ষয় বাবু সেই কায়স্থ কুলোদ্ভব ছিলেন। চুপি গ্রামে খ্যাতনামা দেওয়ান মহাশয়দিগের বাস এবং তাঁহাদিগের মধ্যে এক-জনের ভক্তিরসের গীত এখনও আমাদিগের মধ্যে আদরণীয়। গুপীপুর মেড়তলাও এক বিগ্রহের স্থান বলিয়া ঐ অঞ্চলের লোকের নিকট পবিত্র স্বরূপে পরিগণিত। কাঁকশিয়ালীতে এক নীলকুটী ছিল। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক গ্রামেই ব্যবসায়ী এবং শিল্পজীবী লোক বাস করিত এবং ইষ্টকালয়েরও অভাব ছিল না। আমি যখন দেখিয়াছি, তখন ভাগীরথী নদীর প্রধান স্রোত বহুদূরে বেলপুকুর গ্রামের নীচে বহমান ছিল এবং পূর্ব্বস্থলী গ্রামের নিকট কেবল একটি ক্ষুদ্র খালের ন্যায় গঙ্গায় জল প্রবাহিত হইত এবং তাহা দিয়া শুষ্ককালে নৌকায় গমনাগমন করা কঠিন হইত। কিন্তু শুনিয়াছি যে, এক্ষণে সেই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

মনোহরের পিতার নাম আমি অবগত নহি। তাহার শরীরের অবয়ব কিঞ্চিৎ পরে বিবৃত করিব।

প্রকৃতিব নিয়ম অনুসারে স্থান এবং সময়ের প্রভেদে বস্তু মাত্রেরই ফলাফলের বিভিন্নতা হয়। উদ্ভিদ জগতে দেখা যায় যে, উপযুক্ত স্থানে এবং উচিতকালে বৃক্ষ রোপিত না হইলে নিকৃষ্ট ফলোৎপাদিত হয়। শ্রীহট্ট হইতে কমলালেবুর বৃক্ষ আনাইয়া অন্য স্থানে রোপণ করিলে সহস্র যত্নেও সেইরূপ মিষ্ট এবং সুবস ফল হয় না ; অধিক হইলেও অম্লময় নারেঙ্গা হইয়া যায়। মানবমণ্ডলীর মধ্যেও সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্য দেশ কালের বৈষম্য নিবন্ধন নরোত্তম কিম্বা নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। বঙ্গদেশের ইতিহাসাভিজ্ঞ মহাশয়েরা জানেন যে লর্ড ক্লাইব যদি খ্রীষ্টীয় আঠার শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ না করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দশা অতি শোচনীয় হইত। বাল্যকালে চৌর্য্যবৃত্তিতে ক্লাইবের দৃঢ় অনুবাগ দেখিয়া উপায়ান্তর অভাবে তাঁহাব বান্ধবেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক বণিক সমিতির অধীনে এক কেরাণীগিরি উপলক্ষ করিয়া কিন্তু বাস্তবিক ওলাউঠা রোগে কিম্বা হিংস্রক পশ্বাদির মুখে মরিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে ঐ পাপ বিদায় করিয়া দেয়। সেই পাপ ভারতভূমে পদার্পণ করিয়া কিয়ৎকালেব মধ্যে ফরাসীসদিগকে পরাজয় করিয়া, সত্যের অপলাপ করিয়া, কৃত্রিম লিপি দ্বারা উমিচাঁদকে প্রতারণা করিল এবং অবশেষে কয়েকজন রাজদ্রোহীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, পলাশীতে এক ছায়া যুদ্ধ দেখাইয়া, বালক সেরাজদ্দৌলার হস্ত হইতে বঙ্গাদি প্রদেশ ইংরাজ বণিকদিগের করে চিরকালের জন্য প্রদান করিল। সেই যে ব্যক্তিকে পাপ বিবেচনায় তাহার পিতা মাতা মারিবার জন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিল, সে কয়েক বৎসর পরে গৌরবের মুকুট শিরে ধারণ করিয়া জন্মভূমি প্রত্যাগমন করিল, স্বদেশের রাজার নিকট আদৃত হইল, উপাধি পাইল এবং সর্ব্বলোকের নিকট সম্মানিত হইল। ধনের কথা

বলিবার আবশ্যক নাই, উপরন্তু সেই ক্লাইব্ চিরস্মরণীয় ভাবে ইংরাজের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। যে কলুষিত প্রকৃতি দোষে ক্লাইব বাল্যকালে সহাধ্যায়ীদিগের পুস্তক ও খাদ্যদ্রব্য, ও প্রতিবাসীর বাগিচার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তন্মধ্যস্থিত বৃক্ষের মূল্যবান ফল, অপহরণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা জ্ঞান করিতে পাবে নাই, অধিক বয়সে সেই প্রকৃতি প্রভাবে, অনুকূল অবস্থা সহকারে নির্ব্বোধ এবং দুর্ব্বল বালকের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে পাপ কিম্বা অধর্ম্মাচরণ বলিয়া বিবেচনা করিবে কেন?

কিন্তু এই পাপক্ষেত্রে ক্লাইব্ একাকী নহে। সেকেন্দার সা, * —যাঁহাকে ইংরাজি ভাষায় বীরপ্রবর আলেকজণ্ডর বলে, তৈমুর লং, জঙ্গিশ খাঁ, মহম্মদ গজনী, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রভৃতি পৃথিবীর সমুদায় খ্যাত্যাপন্ন দিগ্‌বিজয়ী যোদ্ধাগণের একই মনোবৃত্তি এবং একই কার্য্যপ্রণালী। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, সিবিলিয়ান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগবেদের বঙ্গানুবাদ করিয়া যে কার্য্য করিতেছেন, তাহা সত্য যুগে হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া পূজা করিতেন। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে, আমার

* সেকেন্দর সার নিকট একজন দস্যুদলের নেতা ধৃত হইয়া আসিলে তিনি তাহাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে দস্যু উত্তর করিল যে 'আমি এমন কোন্ কার্য্য করিয়াছি যাহা আপনি করেন নাই। আমার ন্যায় আপনারও পরদ্রব্য অপহরণ করা ব্যবসা। আমি অল্পবিত্তের ধন চুরি করি, আপনি রাজার ভাণ্ডার লুটিয়া থাকেন। আমি একটি গৃহস্থের বাড়ী আক্রমণ করি, আপনি রাজ্য দেশ ছারখার করেন। আমি শতাবধি লোক সমভিব্যাহারে দস্যুবৃত্তি পরিচালন করি কিন্তু আপনি লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত সেনা লইয়া দেশ অধিকার করেন। আমি আমার অভীষ্ট সাধনার্থ কখনও কখনও দুই একজন মানুষকে আঘাত কিংবা বধ করিয়াছি, আপনার প্রত্যেক যুদ্ধে সহস্রাধিক মনুষ্য অশ্ব হস্তী প্রভৃতিকে আপনি যমালয়ে প্রেরণ করেন। আমার কার্য্যে কদাচিৎ কখনও একখানা গৃহ দগ্ধ হয়, আপনি শত শত নগর জনপদ উচ্ছন্নে দিয়াছেন। আমি কেবল আমার পেটের দায়ে এই দুর্বৃত্তি করিতে বাধিত হইয়াছি কিন্তু আপনার সে ওজর নাই, কারণ আপনি রাজার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমার যেমন জীবিকা নির্ব্বাহের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের

গরিব মনোহর দ্বাপরে আবির্ভূত হইলে, দ্বিতীয় জরাসন্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত।

মনোহরকে পরমেশ্বর বল, বীর্য্য এবং সাহস দান করিতে কৃপণতা করেন নাই এবং জটিল বুদ্ধিও তাহার কম ছিল না। তাহার বল ও কুস্তি বিদ্যা সম্বন্ধে আমি শুনিয়াছি, যে সে চিত হইয়া শুইয়া থাকিত এবং তাহার গলাব উপরে এক খণ্ড বাঁশ দিয়া বাঁশের দুই প্রান্তে দুইজন বলিষ্ঠ মনুষ্য চাপিয়া বসিলেও মনোহর মৃত্তিকার উপরে হস্ত পদের ভর করিয়া বাঁশ সমেত সেই দুইজন মনুষ্যকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিত। মনোহর লাঠির ভর কবিয়া সাধারণ উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিতে ক্লেশ বোধ করিত না। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যার মধ্যে ২০ ক্রোশ গ্রাম্য রাস্তা হাটিতে পারিত। লাঠিয়ালি, সিন্ধ চুরি, ডাকাইতি, রাহাজানী, নৌকায় ডাকাইতি—ইহার সকল কার্য্যেই সে পরিপক্ক ছিল। অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সে এমন প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি প্রকাশ কবিত, যে তাহা দেখিয়া তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে তাহাদের নেতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিত না। কথিত আছে যে তেহট্ট গ্রামে এক ধনাঢ্য কলুর বাড়িতে নয়না মানিকা নামক দুইজন প্রসিদ্ধ ডাকাইতের দলের সহিত মনোহর ডাকাইতি করিতে গিয়া অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়। কলুর ইষ্টকালয় বাড়ী ছিল এবং পুরজন ছাতেব উপর উঠিয়া এমনভাবে সেই স্থান হইতে ইট ও ঝামা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল, যে দস্যুদিগের বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়ান অতি কঠিন হইয়া উঠিল। নয়না প্রভৃতি প্রস্থানের পরামর্শ স্থির করিল, কিন্তু মনোহর তাহা অতি লজ্জাকর

অভাব আপনার তেমনই সকল সম্পূর্ণ ছিল। রাজ্য ধন সকলই প্রচুর। তথাপি আপনি পরদ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারেন নাই। অতএব আমাতে আর আপনাতে কেবল লঘু গুরু প্রভেদ। আমার শিরশ্ছেদ করিলে যদি আমার পাপের উচিত দণ্ড হয়, তবে আপনাকে সহস্র খণ্ডে ছেদন না করিলে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।" কথিত আছে যে এই উচিত বক্তা দস্যুকে সেকেন্দর শা মার্জ্জনা করিয়াছিলেন।

কার্য্য বিবেচনা করিয়া বাহির বাড়ীর একটা ঘরের কাষ্ঠের কবাট ও ঝাঁপ খুলিয়া, রোমীয় সেনারা পূর্ব্বকালে দুর্গ আক্রমণ করার সময়ে যেমন স্বীয় স্বীয় ঢাল দ্বারা তাহাদের মস্তক এবং শরীর আচ্ছাদন করিয়া যাইত, মনোহরও সেইরূপ এই কবাট এবং ঝাঁপ দ্বারা শরীর এবং মস্তকাবৃত করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিল। মনোহরের সঙ্গীগণ তাহার কথামত কার্য্য করিয়া অনায়াসে স্বকার্য্য সাধন করিল। মনোহর কখনও রোমীয় ইতিহাস পাঠ করে নাই কিন্তু যুদ্ধ বিষয়ে তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতেই স্বভাবতঃ তাহার মনে নিক্ষিপ্ত ইট প্রস্তরাদির আঘাত রক্ষার জন্য এইরূপ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল। দক্ষিণে কালনার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে মৃজাপুরের খাল হইতে উত্তর গোটপাড়া এবং অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত গঙ্গার তট মনোহরের কার্য্যক্ষেত্র ছিল; এই স্থানের মধ্যে সুবিধা মতে নৌকা আসিলে নৌকাওয়ালাদের রক্ষা ছিল না। কয়েকবার কৃষ্ণনগরের সাহেবদিগের মেস কোর্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বোঝাই নৌকা ও জজ ব্রাউন সাহেবেরও দ্রব্যাদি বোঝাই নৌকা মনোহর ভাগীরথীর ধারে আক্রমণ করিয়া অনেক টাকার মাল অপহরণ করে। কিন্তু মনোহর তাহার নিজ থানায় অর্থাৎ পূবধুল থানার এলাকাস্থিত গ্রাম সকলে কদাচিৎ চুরি ডাকাইতি করিত, কৃষ্ণনগর জেলার অধীন স্থানেই তাহার কার্য্যস্থল ছিল। কারণ থানা তাহার বাসস্থানের অতি নিকট থাকাতে, পূবধুলের পুলিশ আমলার অধিকারের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি পরিচালন করিলে সর্ব্বদা তাহারা বিরক্ত করিবে বলিয়া, সে তাহাতে ক্ষান্ত থাকিত, এবং ইহাও শুনা হইয়াছে যে উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীগণের সহিত মনোহরের এরূপ গোপনীয় বন্দোবস্ত ছিল, যে পুবধুলের থানার মধ্যে শান্তি ভঙ্গ না হইলে, তাহারা মনোহরের অন্য কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিবে না। পূবধুলের নিকটবর্ত্তী কয়েকখানা গ্রামে মনোহরের অসীম আধিপত্য ছিল এবং অধিবাসীগণের মধ্যে অল্প ব্যক্তি ছিল, যে মনোহরকে ভয় না করিয়া কার্য্য করিতে

পারিত। কাঁকশিয়ালীর বাজারে অন্যান্য গোয়ালিনীর সঙ্গে মনোহরের ভগিনী ও স্ত্রী দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইত, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে মনোহরের পসরা বিক্রীত না হইলে ক্রেতারা অন্যের দধি দুগ্ধের প্রতি হস্তার্পণ করিতে পারিত না। গ্রামের মধ্যেও মনোহর যখন যাহার নিকট কিছু চাহিত, কিম্বা যাহাকে কোন কার্য্য করিতে অনুরোধ করিত, সে তাহা না দিলে কিম্বা করিলে অচিরাৎ তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইত। মনোহরের পিতামহীর মৃত্যু হইলে পরে সে সমারোহ পূর্ব্বক তাহার শ্রাদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া পূর্ব্বস্থলী, চুপি প্রভৃতির কাঁসারীর নিকট প্রচুর পরিমাণে তৈজস, বস্ত্র-বিক্রেতার নিকট বস্ত্রাদি, ময়রার নিকট চিড়া, এইরূপ সমুদয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ভিক্ষা চাহিল। এই ভিক্ষা বলি রাজার নিকট বামনদেবের ভিক্ষার ন্যায়। না দিলেও নয় এবং দিতে হইলেও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিতে হয়। মনোহর পিতামহীর শ্রাদ্ধের ভিক্ষা চাহিয়াছে লোকে তাহা না দিয়া কেমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? তুমি আজি ১০ টাকার দ্রব্য দিলে না, কল্য তোমার সে ১০০ টাকার ক্ষতি করিবে। বিশেষ মনোহরের বিরুদ্ধে রাজ দরবারেও প্রতিকার পাওয়া দুঃসাধ্য, কারণ সহসা কোনও ব্যক্তি মনোহরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাহস করিবে না। এমতাবস্থায় কেহই মনোহরকে তাহার ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করিতে পারিল না এবং এইরূপে সে তাহার পিতামহীর শ্রাদ্ধকার্য্য অনায়াসে তাহার ইচ্ছানুযায়ীরূপে সম্পন্ন করিল। চৌর্য্যবৃত্তি পরিচালনে মনোহরের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র মায়া-দয়ার উদ্ভব হইত না এবং যে সকল ঘটনায় প্রাণবধ করার আবশ্যক না থাকিত, তাহাতেও প্রাণ নষ্ট করা তাহার নিকট আনন্দজনক কার্য্য বলিয়া বোধ হইত। তাহার এক দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন।

মনোহর ধৃত হইলে পরে নবদ্বীপের একজন অতি প্রধান অধ্যাপক মনোহরের দুর্ব্বৃত্ততার দৃষ্টান্ত আমার নিকট ব্যক্ত করেন, ইহা তাঁহার চক্ষের উপরে ঘটিয়াছিল। তিনি যে প্রণালীতে

বর্ণনা করিয়াছিলেন, আমিও পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে সেই প্রণালীতে তাহা বিবৃত করিব। "আমি প্রতি বৎসর ৺শারদীয় পূজার কয়েক দিবস পূর্ব্বে বার্ষিক বৃত্তি আহরণের নিমিত্ত শিষ্য সেবকের নিকট যাইয়া থাকি। আমি যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসরও তুই মাল্লার একখানা ছোট নৌকায় একজন শিষ্য ও একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন ভাণ্ডারী লইয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রার নিমিত্ত প্রাতঃকালে নবদ্বীপের ঘাট হইতে যাত্রা করি। মধ্যাহ্ন সময়ে কাঁক-শিয়ালীর বাজারে উঠিয়া বন্ধনাদি করিয়া সেই দিবসের জন্য এক প্রকার আহারের কার্য্য শেষ করিলাম; রাত্রিতে পাক না করিয়া জলযোগের অভিপ্রায়ে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া মাঝিকে যতদূর সাধ্য অগ্রসর হইতে আদেশ করিলাম। অল্পকালের মধ্যেই রোকনপুরের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম কিন্তু তখন আমার পাচক ব্রাহ্মণ বলিল যে, "আমি একটা কথা মহাশয়কে জ্ঞাত করিতে এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, শুনিয়া এখান হইতে অধিকদূর যাওয়া না যাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। কাঁকশিয়ালীর বাজারে আমার সহিত মনোহর ঘোষের দেখা হয় এবং আমাকে নূতন লোক দেখিয়া আমরা কে কোথায় যাইতেছি, তাহার তথ্য জানিতে চেষ্টা করিয়াছিল। মনোহর আমাকে চিনে না, কিন্তু আমি তাহাকে চিনি এবং সেই নিমিত্ত আমি তাহাকে আমাদের পরিচয় দিলাম না। লক্ষণ বড় ভাল নয়, বিশেষ পূজার সময় নির্জ্জন স্থানে এই বেটার হস্তে পড়িলে আমাদের মঙ্গল নাই।' এই কথা শুনিবামাত্র আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ কোন গ্রামের মধ্যে যাইয়া কোনও ব্যক্তির আশ্রয় লইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। ভাবিলাম, যে অনতিদূরে বহিরগাছীর গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাড়িতে যাইয়া আমি ও আমার সমভিব্যাহারী সকলে অতিথি হইয়া রাত্রি কালটা অতিবাহিত করিব। বহিরগাছীর গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা কৃষ্ণনগরের রাজার

গুরুবংশ ; বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী। বাড়িতে ইষ্টকালয় আছে এবং রোকনপুরের বাজারও তাঁহাদের অধিকারের মধ্যে। বাজারে উঠিয়া এক দোকানে শুনিলাম যে, গুরু ভট্টাচার্য্যদিগের একজন যাঁহার সহিত আমাব পরিচয় ছিল এবং যাঁহার বাড়ীতে যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে এই বাজার হইয়া নিকটস্থ এক গ্রামে গিয়াছিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং বাজাবে অপেক্ষা করিলে আমরা তাঁহার সঙ্গে বহিরগাছী যাইতে পারিব। আমি বাজারে অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম যে আমাদের পশ্চাতে একখানা যাত্রাওয়ালার নৌকা আসিয়া সেই বাজার ধরিল। তাহারাও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের পূজার সময় একজনেব বাড়ীতে যাত্রা করিতে যাইতেছে। এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজন কিছু দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সেই দোকানে উপস্থিত হওয়াতে, কথায় কথায় আমি যে বিভীষিকা দেখিয়াছি, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করিয়া অদ্য আরও অধিক দূরে যাইতে নিষেধ করিয়া, কল্য প্রাতে দুই নৌকা একত্রে যাওনের প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু হতভাগারা আমার কথা গ্রহণ করিল না ; বলিল যে তাহারা অনেকগুলি লোক নৌকায় আছে, ১০।১৫ জন ডাকাইতে তাহাদের কিছু করিতে পারিবে না। ক্ষণেক পরে দেখিলাম, যে যাত্রাওয়ালারা নৌকা খুলিয়া বেহালা নামক চর বহিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু সেই সময় গঙ্গার স্রোত অত্যন্ত প্রখর থাকায় বিশেষ বড় নৌকা এবং প্রচুর সংখ্যক মাল্লার অভাবে ধীর গতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। এদিকে প্রদোষ সময় উপস্থিত হইল এবং আমি যে ব্যক্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিলাম, তিনি আসিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে আশ্বাস প্রদান করত বাজারে তদীয় যে কিছু আবশ্যকীয় কার্য্য ছিল, তাহা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র অন্ধকার হইয়াছে এমন সময় আমাদের কর্ণে বহুদূরে চরের দিক হইতে একটা ভয়ানক শোরগোলের শব্দ আসিয়া

উপস্থিত হইল। আমাব পাচক ব্রাহ্মণ অমনি বলিয়া উঠিল যে "ঐ গো শুনুন পাপিষ্ঠ বেটা বুঝি কি না কি করিল।" আমি স্তম্ভিত হইলাম। বাজারে যে দুই চারিখানা দোকান ছিল, তাহার দোকানিবা শশব্যস্তে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া, স্ব স্ব গ্রামে প্রস্থান করিল এবং আমার গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে "এক্ষণে শীঘ্র চলুন, ইহা ভাবিয়া আপনি কি করিবেন, মধ্যে মধ্যে এইরূপ কারখানা হইয়াই থাকে।" পর দিবস প্রাতে সেই বেহালার চর বহিয়া যাইতে রোকনপুর হইতে প্রায় ১৷৷০ ক্রোশ ব্যবধানে একস্থানে আসিয়া দেখিলাম, যে একখানা চড়ন্দার পান্সি নৌকা একটা ঝোপেব ধারে জলের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে; আমার মাঝি কহিল যে ইহা সেই যাত্রাওয়ালাদিগের নৌকা, কোন সন্দেহ নাই। চড়ার উপরেও একটা ভগ্ন পেটারা ও কয়েকখণ্ড ছিন্ন বস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। নৌকার যাত্রীদিগের কাহারও কোন চিহ্ন কিম্বা অনুসন্ধান পাইলাম না। তাহাদের মধ্যে কেহ পলায়ন করিতে পারিয়াছিল, কি সকলেই সেই দুরাত্মার হস্তে যমভবনে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। আমার পাচক বলিল যে "নৌকার কেহই বাঁচে নাই।" তাহাতে আমি উত্তর করিলাম যে, "অসম্ভব; কারণ নৌকার মধ্যে কয়েকটি বালক ছিল, তাহাদিগকেও কি মারিয়াছে?" পাচক মাথা নাড়িয়া কহিল যে, "আপনি ও বেটার চরিত্রের কথা জানেন না, তাহার নিকট কাহারও অব্যাহতি নাই।"

মনোহরের আর এক গুরুতর দোষ ছিল, তাহার রিরংসা অতি প্রবল ছিল। এই অধর্ম্ম প্রবৃত্তির সন্তোষের নিমিত্ত তাহার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিল না। অধিক কি বলিব, বাঞ্ছিত পাত্রী সহজে সম্মত না হইলে, মনোহর তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া বলাৎকার করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। লাঞ্ছিত ব্যক্তিরা ভীরু স্বভাববশতঃ বিশেষ জাতি যাওয়ার এবং লজ্জার ভয়ে ও পর্য্যাপ্ত সাক্ষী সাবুদ না পাওয়ার সম্ভাবনায়, গায়ের ঝাল গায়ে মরিতে দিত। প্রতিকারের

অন্য কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া, কেবল পরমেশ্বরকে তাহাদিগকে এই পাপের হস্ত হইতে উদ্ধাব করিতে ডাকিত।

মনোহরের বিলক্ষণ ভাগ্যবল ছিল : কারণ তাহাব ন্যায় কোন্ ব্যক্তি এমন দুই পুলিশ থানার নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া যদৃচ্ছারূপে দুষ্কার্য্য করিতে কৃতকার্য্য হইত ? কৃষ্ণনগবের হাকিমেরাও মনোহরের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন এবং মন্টেসর সাহেব একজন অতি তেজস্বী ও তীক্ষ্ণ মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তিনিও এই দুরাত্মাকে ফাঁদে ফেলিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও মনোরথ-সিদ্ধি করিতে পাবেন নাই। জজ ব্রাউন সাহেবেব দ্রব্যাদির নৌকা লুঠ করার পর হইতে তাঁহারও মনোহরের উপব কোপ ছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে দণ্ডনীয় কবার উপায়াভাবে কেবল উপলক্ষের অপেক্ষা কবিতেছিলেন। এইরূপে কি অধিবাসী, কি পুলিশ আমলা, কি হাকিম, মনোহর সকলেরই বিরক্তিভাজন হইয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ন্যায় সে সকলকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া গাত্রে ফুঁ দিয়া বেড়াইত। প্রথমে আমি মনোহর সম্বন্ধে এই সকল কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, ইহার মধ্যে অনেক রঞ্জিত বৃত্তান্ত বলিয়া সন্দেহ কবিতাম, কিন্তু পশ্চাতে আমার এই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল, প্রত্যুত তখন ভাবিলাম, যে আমি মনোহরের সমুদয় দুশ্চরিত্রের কথা শুনিতে পাই নাই !

পূজার সময় আমার থানায় যে দুই নৌকার ডাকাইতি হইল, তাহাও মনোহবের কার্য্য বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল এবং রামকুমার প্রভৃতি অনেকে মনোহরকে কোন কৌশলে এবং এই দুই ঘটনার উপলক্ষে ধরিয়া আনিয়া প্রচুররূপে প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিতে বারম্বার পরামর্শ দিল, যে তাহা হইলে মনোহর কিছুকালের নিমিত্ত ক্ষান্ত থাকিবে ; কিন্তু আমি নূতন কর্ম্মচারী এমন যথেচ্ছাচারী অন্যায় কার্য্য করিতে আমার সাহস হইল না। তাহা দেখিয়া আমার পরামর্শদাতারা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিল, যে এমন ভীত হইয়া কার্য্য করিলে আমি কখনই ভালরূপে দারোগাগিরি করিতে

পারিব না।

যাহা হউক এইরূপে রাসপূর্ণিমার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাসপর্ব্বে শান্তিপুরে যেমন রঙ্গ-তামাসা এবং বহু লোকের সমাগম হয়, নবদ্বীপেও এই পূর্ণিমায় পটপূজা উপলক্ষে সেইরূপ সমারোহ হইয়া থাকে। নবদ্বীপের পটপূজা অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার। নামে পটপূজা কিন্তু বাস্তবিক ইহা নানাবিধ প্রতিমার পূজা। দশভুজা, বিন্ধ্যবাসিনী, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠিত হয়। নদীয়া, বুঁইচপাড়া ও তেঘরির প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই এক একখানি করিয়া প্রতিমা হয়। পটপূজা কোন ব্যক্তি কিম্বা গৃহস্থ বিশেষের খ'স পূজা নহে, প্রত্যেক পল্লীতে বারোইয়ারি স্বরূপ এই পূজা হয়, এবং ইহাতে বড় ছোট সকল অধিবাসীগণেরই উৎসাহ থাকে। আমার পাড়াব প্রতিমা শ্রেষ্ঠ হইবে বলিয়া সকলেরই ইচ্ছা এবং যত্ন থাকে, এবং বস্তুত সকল প্রতিমাই সুগঠিত এবং সুসজ্জিত হয়। কৃষ্ণনগব অঞ্চলের কুমার কারিকরেরা অতি প্রসিদ্ধ, এবং স্ত্রীপুরুষ অনেকে ডাকের সাজ প্রস্তুত করার কার্য্যে অতিশয় নিপুণ। আমি শুনিয়াছি যে টোলের অধ্যাপক অনেক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাও সখ করিয়া প্রতিমার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন। সুতরাং অন্য স্থানে লোকে যাহা বহুব্যয়ে সমাধা করিতে পারে না, তাহা নবদ্বীপ-অধিবাসীগণ স্বীয় পরিশ্রমের দ্বারা অনায়াসে অতি সুন্দররূপে সম্পাদন করে। পটপূজার প্রতিমাগুলি অন্যস্থানের প্রতিমা অপেক্ষা অধিক উচ্চ এবং অনেক পুত্তলি সমবেত; কিন্তু তথাপি ঐগুলির এক বিশিষ্ট গুণ আছে যে, প্রতিমাগুলি অত্যন্ত হালকা এমন কি ৫।৬ জন মজুরে তাহা স্কন্ধে করিয়া নাচাইতে পারে।

নবদ্বীপের পটপূজা দেখিতে বিশেষ প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন অনেক দূর হইতে লোক আইসে। কেবল তামাশা দেখিবার নিমিত্ত নহে, এই উপলক্ষে কার্ত্তিক পূর্ণিমায় পবিত্র নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করার

মানসেও বহু লোকের সমাগম হয়। অনেকে আবার নৌকায় আসিত এবং এই পুণ্যস্থানে ত্রিরাত্র বাস করিয়া বিসর্জ্জনান্তে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইত। এই পর্ব্ব দেখিবার নিমিত্ত কৃষ্ণনগরের বারাঙ্গনারা অলঙ্কারাদিতে সুশোভিত হইয়া নৌকাযোগে আসিত এবং তাহাদের অলঙ্কারের প্রতি দস্যুদিগের বিশেষ প্রলোভন জন্মিত। ইতিপূর্ব্বে বেশ্যারা নবদ্বীপের ঘাটে রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতে চলিয়া যাইত কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ মনোহর ইহাদিগের নৌকা আক্রমণ করাতে, তাহারা বিসর্জ্জনের পরক্ষণেই নৌকা খুলিয়া কৃষ্ণনগর গমন করিত ; এবং থাকিবার আবশ্যক হইলে রাত্রিকালে নৌকা পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের মধ্যে আসিয়া বাস করিত। দারোগাও সেই কারণে ঘাটের চৌকীদার দ্বারা যাত্রীদিগকে সময়-শিরে নৌকা লইয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেন।

এতাদৃশ সময়ে, পটপূজার বিসর্জ্জনের দিন উপস্থিত হইল। যে সকল স্থানে বহু প্রতিমা হয়, তাহার সর্ব্বত্রই বিসর্জ্জনের দিবস কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং সময়ে দর্শকদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সমুদয় প্রতিমা আনিয়া একত্রিত করা হয় এবং ইহাকে কৃষ্ণনগর অঞ্চলে প্রতিমার আড়ঙ্গ কহে। পটপূজার প্রতিমার আড়ঙ্গ নবদ্বীপের পোড়া-মা তলা, কাঁসারী শড়ক প্রভৃতি স্থানের রাস্তায় বেলা ২॥০ প্রহরের সময় আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই শেষ হইয়া যায়। বলিবার আবশ্যক নাই, যে এই আড়ঙ্গ দেখিতে অধিক ভীড় হয় এবং শান্তিরক্ষার নিমিত্ত পুলিশ কর্ম্মচারীরা তথায় উপস্থিত থাকেন। আমি সেই চিরপ্রথা অনুসারে আমার চারিজন বরকন্দাজ ও কতকগুলি চৌকীদার লইয়া আড়ঙ্গে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে কখনও এই তামাশা দেখি নাই। শান্তিরক্ষার প্রতি আমার যত না দৃষ্টি ছিল, তদপেক্ষা প্রতিমার গঠন ও কারু-কার্য্য দেখিতে আমার অধিক মনোযোগ হইল।

এমন সময় আমার সঙ্গী একজন চৌকীদার বলিয়া উঠিল যে

“এই দেখুন মনোহর যাইতেছে” এবং পথের যে ধারে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম, তাহার বিপরীত দিকে কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সে একজনকে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ একজন বরকন্দাজ দ্বারা তাহাকে ডাকিয়া আনাইলাম। মনোহর আসিয়া আমাকে নতশিরে দণ্ডবৎ করিল। দেখিলাম, তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; বোধহয়, আরও সুখ-স্বচ্ছন্দের অবস্থায় তাহা গৌরবর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারিত। দেহ মধ্যম ছন্দ; কিন্তু গঠনে প্রচুর বলের আকর দৃষ্ট হইল। অতি প্রশস্ত বক্ষস্থল; পুষ্ট বাহুযুগল; কোমর চিকন; উরু ও তন্নিম্নস্থ অঙ্গদ্বয়ও বলের লক্ষণ-বিশিষ্ট; গলদেশ মোটা ও খাটো যাহাকে পারসী ভাষায় ‘কোতা গর্দ্দান’ বলে। চক্ষু ছোট, পিট্‌ পিট্‌ করিয়া তাকায় এবং আমার বোধ হইল তাহা কিঞ্চিৎ ধূসরবর্ণ কিন্তু চক্ষু ভিন্ন মুখের অন্য কোন অঙ্গ নিন্দনীয় নহে। হঠাৎ দেখিলে মনোহরকে শ্রীযুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তাহার কলুষিত অন্তরের প্রতিভা মুখে বিলক্ষণ ব্যক্ত হইত। কথা কহিতে দেখিলাম, যে তাহার দন্তে মিশির কালিমা আছে এবং উপর পাটির মধ্যস্থিত দন্ত দুইটির প্রত্যেক দন্তে পাশাখেলার পাষ্টিতে যেরূপ গোল ছক্-কাটা থাকে, সেইরূপ এক একটি ছক্-কাটা রহিয়াছে। পরিধানে একখানা ঢাকাই ধুতি, গায়ে চাদর এবং পায়ে নাগরা জুতা। তখন ইংরাজী জুতার অধিক চলন ছিল না, থাকিলে বোধ হয়, মনোহরের পায়ে স্প্রিংওয়ালা জুতা দেখিতাম। মনোহরের পরণ পরিচ্ছদে এবং ভাবভঙ্গীতে বোধ হইল যে ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত হওয়া তাহার সম্পূর্ণ অভিলাষ ছিল এবং প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়াও অনেকের ভ্রম হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ব্যাটা চুলে ধরা পড়িত; কারণ গোয়ালাদিগের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী তাহার চুল গুচ্ছাকার ছিল।

যে পর্য্যন্ত আমি মনোহরকে চক্ষে দেখি নাই, সে পর্য্যন্ত আমি

মনে মনে একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যক্তি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, এবং আরও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, যে তাহার সহিত আমার কখনও সাক্ষাৎ হইলে, আমি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে ভৎ‍র্সনা করিব। কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র আমার মনের সেই ভাব দৃঢ় রহিল না; মনে হইল, যে এমন সুপরিচ্ছদ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হঠাৎ বিনা কারণে গালিগালাজ করা কিম্বা অপ্রিয় বাক্য বলা, আমার পক্ষে ভদ্র ব্যবহার হইবে না; অতএব আমি তাহাকে মিষ্ট কথায় সম্ভাষণ করিয়া আমার থানার এলাকার মধ্যে দৌরাত্ম্য না করিতে অনুরোধ করিলাম; তাহাতে সে মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উত্তর করিল, যে তাহার শক্ররা আমার নিকট তাহার নিন্দা করিয়াছে, সে কোন্‌কালে ঘি খাইয়াছিল, তাহার গন্ধ এখনও তাহার হাতে আছে, ফলে সে এখন কোন কুকর্ম্ম করে না। এইরূপ অল্প কয়েকটি কথা কহিয়া সে পুনবায় আমাকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইল। মনোহরকে আমি সহজে ছাড়িয়া দিলাম দেখিয়া, আমার পারিষদগণ আমার প্রতি যারপরনাই বিরক্ত হইল। তাহারা কহিল, যে মনোহর ভাল মানুষের যম এবং তাহার প্রতি আমার এইরূপ শান্ত ব্যবহার দেখিয়া নিশ্চয়ই সে অদ্য রাত্রে, না হয় শীঘ্র, পুনরায় আমাকে কষ্টে ফেলিতে ত্রুটি করিবে না। আমি তাহাদের কথার কোনও উত্তর না দিয়া নবদ্বীপের পুরাতনগঞ্জের ঘাটে যাত্রীদিগের নৌকা সকলের রক্ষার জন্য ঘাটের চৌকীদারকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক থানায় প্রত্যাগমন করিলাম। পথে ভাবিলাম যে অদ্য এবং আর কয়েক রাত্রিতে পূর্ব্ববৎ রোঁদ পাহারা দিতে আরম্ভ করিব। কিন্তু থানায় সন্ধ্যার পরে পদার্পণ করিবামাত্রই শুনিলাম, যে বাজারের একটি বেশ্যা গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সুতরাং সেই ঘটনার তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সমাধা করিতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে, আমার বাঞ্ছিত চৌকী পাহারা দেওয়া আর সে রাত্রিতে ঘটিয়া উঠিল না। অধিক রাত্রিতে শয়ন করাতে শীঘ্রই

অঘোর নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু অধিকক্ষণ অবিচ্ছিন্নরূপে নিদ্রা যাইতে পারিলাম না, কারণ শেষ রাত্রিতে আন্দাজ ৩টার সময় আমার শয়নকক্ষের বাতায়নে কয়েকটি লাঠির আঘাতের শব্দ শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জিজ্ঞাসা করায় আঘাতকারী কহিল যে সে পুরাতনগঞ্জের চৌকীদার, ঘাটে একটা গোলমাল উপস্থিত হওয়াতে আমাকে অবগত করিতে আসিয়াছে। "গোলমাল" ভিন্ন সে আর কোন কথা খুলিয়া না বলাতে, আমার অনুভব হইল যে পুরাতনগঞ্জ পল্লীতেই অনেক যাত্রী আসিয়া বাস করে এবং বোধ হয় তাহাদের আপনাদের মধ্যে কোন বিবাদ হেতু গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া, বিশেষ আমার নিদ্রার তরুণ অবস্থা কাজেই আমি আর তথ্য না লইয়া, থানা হইতে একজন বরকন্দাজ লইয়া যাইতে চৌকীদারকে আদেশ করিয়া, পুনরায় নিদ্রায় বিহ্বল হইলাম। প্রাতে থানায় যাইয়া যে সংবাদ শুনিলাম, তাহাতে আমি এককালে বুদ্ধিহারা হইলাম। শুনিলাম, যে ঘাট হইতে সন্ধ্যার পরে সকল যাত্রীর নৌকা খুলিয়া গিয়াছিল, কেবল তিন চারিখানা মালবোঝাই নৌকা ঘাটে ছিল, এবং তাহার সকল নৌকার চড়ন্দার ও অধিকাংশ মাঝি-মাল্লা গ্রামের মধ্যে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে যাইয়া শয়ন করিয়াছিল। এইরূপে কোনও নৌকা জনশূন্য এবং কোনও নৌকায় দুই-একজনমাত্র মনুষ্য ছিল। ইহার মধ্যে এক নৌকা জাহাজের তলার পুরাতন তামার চাদরের চালান লইয়া কলিকাতা হইতে ডাঁইহাট মেটিয়ারি গ্রামে যাইতেছিল। নৌকায় কেবল তিনজন মাল্লা শয়ন করিয়াছিল। দস্যুরা তাহাতে আরোহণ করিয়া রশি কাটিয়া গঙ্গার মধ্যভাগে যাইবার পরে, মাল্লারা বুঝিতে পারিয়া গোলযোগ উপস্থিত করাতে, ডাকাইতেরা তাহাদের সকলকে খুব প্রহার করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া গঙ্গার উত্তর পারে নৌকা লাগাইয়া, ১৪টা তামার চাদরের বস্তা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

মাল্লা তিনজন সন্তরণ করিয়া পুরাতনগঞ্জের ঘাটে উপস্থিত হয় এবং প্রাতে ওপার হইতে নৌকাখানা আনয়ন করে। আমি এই সংবাদ পাইয়া সমস্ত দিবস মনোদুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া রহিলাম, এবং লজ্জায় কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিলাম না, এবং রামকুমার ও অন্যান্য চৌকীদারের ধিক্কারেব আশঙ্কায় আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ না কবিয়া আপন কক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম। কিন্তু এমন অবস্থায় পুলিশ আমলা কতক্ষণ লুক্কায়িত থাকিতে পারে? ঝটিতি ইহার কিছু বিহিত বিধান করা আবশ্যক দেখিয়া বৈকালে পরামর্শেব জন্য তাহাদের সকলকে আহ্বান করিলাম। মন্ত্রণাব উপসংহারে স্থিরীকৃত হইল, যে ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে আমার মনে যে কণ্টক ছিল, তাহা পরিত্যাগ কবিয়া আমার পবম শত্রু নিপাতের জন্য পুলিশ আমলাব প্রচলিত ব্যবহাবানুযায়ী কার্য্য কবিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমিও দেখিলাম, যে মনোহর যে চরিত্রের মনুষ্য, তাহাতে তাহার প্রতি তদ্রূপ কঠিন ব্যবহার না করিলে, আমাদের নিস্তার নাই ; তথাপি আমি আমার পরামর্শদাতা-দিগেব একটি প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। তাহা এই যে, অপহৃত তামার পাত্রের ন্যায় আরও অনেক চাদর নৌকায় আছে ; তাহার কয়েকখানা তামা লইয়া মনোহরের বাড়ীর কোন স্থানে রাত্রিকালে গোপনে রাখিয়া দিবাভাগে তাহা বাহির করিতে পারিলে, তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে আমাদের কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না। এই প্রস্তাব ভিন্ন আমি রামকুমার চৌকীদারের অন্যান্য সকল কথা গ্রহণ করিলাম। যদিও মনোহরকে এই ডাকাইতি করিতে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী চক্ষে দেখে নাই এবং নৌকায় যে তিনজন নাবিককে মনোহর প্রহার করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহারাও কোন্ ব্যক্তি মনোহর চেনে না, তথাপি থানার প্রথম রিপোর্টে তাহার নাম ব্যক্ত থাকা আবশ্যক বিবেচনায়, আমি ঘটনাস্থলের চৌকীদারের নিকট, এই

মর্ম্মে এক এজাহার লইলাম, যে সে মনোহরকে নৌকা আক্রমণ করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। চৌকীদারের এই এজাহাব ভিত্তি করিয়া আমি শান্তিপুবের ডিপুটীবাবুর ও কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবেব নিকট সংবাদ পাঠাইয়া মনোহরকে ধৃত কবিবার উদ্‌যোগ কবিতে আবম্ভ কবিলাম। ভাবিলাম, যে চবমে মনোহবকে সম্পূর্ণরূপে অপরাধী কবিতে না পাবিলেও, যদি তাহাকে আমি থানায় আনিয়া কিঞ্চিৎ প্রহার দিয়া শান্তিপুর কিম্বা কৃষ্ণনগর প্রেরণ করিতে পাবি, তাহা হইলেও আমার মনস্কামনা অনেক পবিমাণে সিদ্ধ হইবে ; কারণ আমি জানিতাম যে ঈশ্বব-বাবু এবং মণ্ট্রেসব সাহেব উভয়েই এমন কৌশলী এবং দুষ্টদমন পক্ষে এমন উদ্যমশীল, যে মনোহব একবাব এই উপলক্ষে তাঁহাদেব হস্তে অর্পিত হইলে, শীঘ্র অব্যাহতি পাইবে না এবং আর কিছু না হইলেও দীর্ঘকাল হাজতে ক্লেশ পাইবে এবং তাহা হইলে আমরা অন্তত সেই কাল পর্য্যন্ত শান্তিভোগ করিতে পাবিব এবং মনোহরও কিছু শিক্ষা পাইয়া আসিবে।

এইরূপ অবধারণ করিয়া অন্যূন ৫০ জন উৎকৃষ্ট চৌকীদার লইয়া ঘটনাব তৃতীয় রাত্রিতে, বাত্রি অনুমান তিন প্রহবের সময়, মনোহরকে ধৃত করিতে থানা হইতে যাত্রা করিলাম। নৈশ গগনের তিমিরাচ্ছাদন দূরীভূত হওয়ায় প্রভাতের চিহ্ন কেবলমাত্র দেখা যায়, এমন সময় আমরা মনোহরের গ্রামের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রহরী স্বরূপে আমার পালকির পার্শ্বে যে একজন বরকন্দাজ যাইতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, যে "দেখুন মহাশয় সম্মুখস্থিত পথের বাম হইতে দক্ষিণ দিকে একটা শৃগাল যাইতেছে, দেখিয়া প্রণাম করুন নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে।" ইংরাজী পড়িয়া যাত্রার শুভাশুভ চিহ্ন সকল অগ্রাহ্য করিতে শিখিয়াছিলাম, তথাপি মনুষ্যের মনে স্বকাম-সিদ্ধির জন্য স্বভাবতঃ এমনই আকিঞ্চন এবং আগ্রহ, যে "মঙ্গল হইবে" বাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্রই আমি

উঠিয়া বসিলাম এবং পালকির শার্শির মধ্যে দিয়া দৃষ্টি করাতে, যথার্থই একটা শৃগাল আমাদের বাম হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতেছে দেখিতে পাইলাম। "বামে শব শিবা নারী" ইত্যাদি বচনটা মনে পড়িল, কিন্তু শৃগালকে প্রণাম করিলাম না, কেবল বরকন্দাজকে বলিলাম, "দেখা যাইবে কেমন মঙ্গল হয়।" ক্ষণেক পরেই বেহারা আমাকে একটা বাড়ীতে নামাইয়া দিল। যে কিঞ্চিৎ আলোক বিকশিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা দেখিতে পাইলাম, যে বাড়ীতে তিন চারিখানা অনুচ্চ ছোট চালাঘর এবং চতুর্দ্দিক জঙ্গলে আবৃত; উঠানের মধ্যখানে একটা ঢেঁকি স্থাপিত রহিয়াছে। ইতিমধ্যে রামকুমার চৌকীদার আসিয়া আমার কানে কানে বলিল, যে এই মনোহরের বাড়ী কিন্তু সে কোন্ ঘরে শয়ন করে, তাহা আমি জানি না। সেই সংবাদ আমরা একজন বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট অবগত হইলাম। অমনি সকলে লম্ফ দিয়া সেই ঘরের দিকে ধাবমান হইয়া উচ্চ স্বরে "খোল্ খোল্" বলিয়া দ্বারের কবাটে লাথি ও ধাক্কা মারিতে আরম্ভ করিল। মনোহর নিশ্চিন্ত-ভাবে নিদ্রা যাইতেছিল এবং তাহার মস্তকে যে এই বিপদ পড়িবে তাহা সে মনেও ভাবে নাই, ভাবিলে বোধ হয়, আমরা বাড়ীতে তাহার দেখা পাইতাম না। মনোহর শশব্যস্তে দ্বার খুলিবামাত্র কতকগুলি চৌকীদার একত্রে, ঝড়ের বেগে, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং মনোহরকে কেহ চুলে, কেহ হস্তে, কেহ পদদেশে ধরিয়া প্রহার করিতে করিতে শূন্যভাবে তাহাকে উঠানে আনিয়া ফেলিল, কিন্তু প্রহার থামিল না। তাহার লম্বা চুলে ধরিয়া মাটির মধ্যে তাহাকে কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরাইতে লাগিল এবং যাহার যে ইচ্ছা সে সেইরূপ তাহার শরীরে আঘাত করিল। আমি বোধ করি যে আমরা মনোহরকে নিদ্রিত অবস্থায় এবং অপ্রস্তুতভাবে পাইয়াছিলাম বলিয়াই চৌকীদারেরা তাহাকে এইরূপ লাঞ্ছনা করিতে ক্ষমবান হইয়াছিল, নচেৎ তাহার হস্তে লাঠি থাকিলে এবং অনাবৃত স্থান

পাইলে মনোহর আমাদিগকে তুচ্ছ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত। যাহা হউক, আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত শঙ্কাযুক্ত হইলাম। আমাব বোধ হইল, যে আর কিছুক্ষণ তাহার উপরে এইরূপ নির্দ্দয় আঘাত করিলে, তাহার প্রাণে বাঁচা কঠিন হইবে সুতরাং হিতে বিপরীত হইয়া উঠিবে। এই বিবেচনায় আমি আমার সঙ্গীগণকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিলাম। কিন্তু তাহারা সকলে একমুখে বলিয়া উঠিল যে "আমবা আপনার কথা শুনিব না। মনোহরকে মারিয়া আমরা ফাঁসী যাইব। ও ব্যাটা আমাদের প্রতি যে দৌরাত্ম্য করিয়াছে তাহার প্রতিশোধ না পাইয়া আমরা ক্ষান্ত হইব না। উহাকে আমরা কখনও পাই নাই, আজ ভাগ্যবলে পাইয়াছি কখনও ছাড়িব না!" আমি অনেক কষ্টে তাহাদিগকে অবশেষে ক্ষান্ত কবিতে পারিলাম।

এই সময় মনোহরেব শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। তাহার মস্তকের সুন্দর লম্বা কেশ ও পরিধানের নূতন বস্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, সমস্ত শরীর ধূলিলুণ্ঠিত. প্রহারের আঘাতে অনেক স্থানের চর্ম্ম স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, রক্তও পড়িতেছে এবং ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত একগণ্ডুষ জল অতি কষ্টে চাহিতে পারিল। এই দুরবস্থায়ও তাহাকে অবশেষে উঠানের মধ্যস্থিত ঢেঁকির সঙ্গে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়া অপহৃত দ্রব্য সমস্তেব অনুসন্ধানে তাহার ঘরবাড়ী বিচয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং পূর্ব্বস্থলীর থানায় রীতিমত সংবাদ দিয়া সহায়তার নিমিত্ত যাচ্ঞা করিয়া পাঠাইলাম। আমরা মনোহরের গৃহে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে অন্বেষণ করিয়া মালের কোনও ঠিকানা পাইলাম না। কেনই বা পাইব? মনোহর এমন অপরিপক্ক চোর নহে, যে সে তাহার অপহৃত দ্রব্য সমস্ত ঘটনার অল্পকাল মধ্যে তাহার নিজগৃহে কিম্বা গৃহের নিকট কোনও স্থানে রাখিবে। আমি অনভিজ্ঞ দারোগা, মনোহরের খানাতল্লাসী করিয়াছিলাম, অন্য একজন কর্ম্মক্ষম পুলিশ

আমলা হইলে, সে কখনই এইরূপ বৃথা খানাতল্লাসী করা আবশ্যক বিবেচনা করিত না। বিফল খানাতল্লাসী করিয়া কতক্ষণ পরে আমি পুনরায় যে স্থানে মনোহর বন্দী ছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং দেখিলাম যে পূর্ব্বস্থলী থানার জমাদার আমার প্রেরিত সংবাদমতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এই জমাদার একজন আদর্শ পূর্ব্ব পুলিশ আমলা বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। দীর্ঘকায়, স্থূলাকার খোট্টা। গৌরবর্ণ, আকর্ণ ব্যাপ্ত গুম্ফ এবং তদুপযুক্ত গালপাট্টা। পায়ে নাগরা জুতা, পরিধানে আঁটা কাছা বিশিষ্ট নবধৌত পাইড়দার ধুতি, গায়ে খোট্টাই আঙ্গরাখা এবং মস্তকে একটি কাপড়ের সাদা টুপি। দীর্ঘকাল যাবৎ বঙ্গদেশে আসিয়া প্রথমে দ্বারবান্ পরে থানায় বরকন্দাজ এবং অবশেষে জমাদার হইয়া আধো আধো বাঙ্গালা ভাষা কহিতে শিখিয়াছে, কিন্তু দন্ত্য সয়ের উচিত উচ্চারণ রহিয়া গিয়াছে। গরীব দুঃখীর, বিশেষ ভদ্রলোকের যম, কিন্তু মনোহরের ন্যায় দুগ্ধ-প্রদ চোর ডাকাইত তাহার স্নেহের পাত্র। পুলিশের কার্য্যে মূর্খ হইলেও ধনোপার্জ্জন-বিদ্যায় সুপণ্ডিত। দুই চারি কথায় আমাকে সম্বোধন করিয়া জমাদার মনোহরের নিকট গমন করিল এবং মনোহর যে ঢেঁকিতে বাঁধা ছিল, তাহার ধূলা একজন চৌকীদারের বস্ত্র দ্বারা পরিষ্কার করত, মনোহরের পার্শ্বে ঢেকির উপরে উপবিষ্ট হইল। মনোহরের অবস্থা দেখিয়া মনোহরকে শুনাইয়া অনেক আক্ষেপ করিবার পরে, মনোহর সম্বন্ধে সে যাহা বলিল, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে, মনোহর মন্দ চরিত্রের মানুষ নহে এবং পূর্ব্বস্থলের থানায় তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন অভিযোগ করে নাই। জমাদারের বিশ্বাস এই যে, মনোহর ডাকাইতি করিয়া থাকিলে সে তাহা গোপন করিবে না, অতএব তাহার বন্ধন মোচন করিতে জমাদার অনুরোধ করিল। কিন্তু আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করাতে, সে বিরক্ত হইয়া, আমি ছোকরা দারোগা, পুলিশের কার্য্য

জানি না, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিদায় হইয়া গেল।

জমাদার চলিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই রামকুমার চৌকীদার আমাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া অনতিদূরে এক নির্জ্জন স্থানে এক অর্দ্ধবয়স্ক মনুষ্যের নিকট উপস্থিত করিল এবং বলিল যে "এই ব্যক্তির নাম হলধর ঘোষ, মনোহরেব মাতুল, আপনি যদি অভয় প্রদান করেন এবং বলেন, যে ইহাকে বক্ষা কবিবেন, তাহা হইলে সে এই ডাকাইতির সমুদায় বৃত্তান্ত আপনার নিকট অকপটে ব্যক্ত করিবে।" অমৃতে কাহার অরুচি? আমি তৎক্ষণাৎ হলধরের অঙ্গ স্পর্শ কবিয়া কহিলাম, যে যদি সে অপহৃত মালের সন্ধান কবিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দিব। হলধব আমার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া ব্যক্ত করিল যে,—

"পটপূজার বিসর্জ্জন দেখিতে যাইয়া মনোহর নবদ্বীপেব ঘাটে কৃষ্ণনগরের বেশ্যাদিগের দুই তিনখানা নৌকা দেখিয়াছিল এবং তাহা লুট করিবার অভিলাষে নিজ গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমি (হলধর) এবং অন্য ৮ ব্যক্তিকে সংগ্রহ করিয়া অর্দ্ধরাত্রের পরে, সকলে গঙ্গার কাছাড়ের ছায়া অবলম্বন করিয়া, লোকে দেখিতে না পায় এমন ভাবে, পুরাতনগঞ্জের ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, যে সকল নৌকা আক্রমণ করার নিমিত্ত তাহারা আশা করিয়া আসিয়াছিল, তাহার একখানাও সেই স্থানে নাই; তাহাতে মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সম্মুখস্থ প্রথম বোঝাই নৌকায় প্রবেশ করিল এবং নাবিকদিগকে মধ্যগঙ্গায় ফেলিয়া ওপারে যাইয়া, তামার বস্তা সকল নৌকা হইতে বাহির করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু বস্তাগুলি অতিশয় ভারী দুইজন বলবান মনুষ্য না হইলে একটি বস্তা নাড়িতে পারিবে না দেখিয়া মনোহর নৌকা হইতে চরে নামিল এবং তথায় ইতস্ততঃ করিয়া অল্প দূরে একখানা ধীবরের খালি নৌকা দেখিয়া, তাহা বোঝাই নৌকার সন্নিধানে আনয়ন করত তাহাতে ১৪-খানা বস্তা ও একটা বৈঠা উঠাইয়া লইয়া, পূর্ব্বস্থলী গ্রামাভিমুখে

চালাইতে লাগিল। কিন্তু বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে রাত্রিশেষ হওয়ার লক্ষণ দেখিয়া, নদীর ধারে চরের উপরে এক জঙ্গলাবৃত নিভৃত স্থানে আমরা অনেক কষ্টে অপহৃত বস্তুগুলি উঠাইয়া গোপন করিয়া রাখিলাম এবং খালি নৌকায় আমাদের গ্রামের নিকট উত্তরণ করিয়া নৌকাখানা গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলাম। পর দিবস সন্ধ্যার পর, মনোহর তাহার একজন পরিচিত ব্যক্তির নৌকা সংগ্রহ করিয়া, পুনরায় আমাদের সকলকে লইয়া সেই গোপনীয় স্থান হইতে অপহৃত বস্তুগুলি নৌকায় উঠাইয়া পূর্ব্বস্থলীর এক ঘাটে উপস্থিত হইল এবং তথা হইতে আমরা দুই দুই জনে এক একটা বস্তা মাথায় করিয়া, গোপাল পোদ্দার নামক একজন সুবর্ণবণিকের বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলাম। গোপাল পোদ্দার মনোহরের "থাঙ্গিদার"। মনোহর যখন যেখানে যাহা অপহরণ করে তাহা গোপাল পোদ্দারের নিকট লইয়া যায় এবং গোপাল তাহার বিনিময়ে মনোহরকে নির্দ্ধারিত হারে টাকা দেয়। আমরা গোপাল পোদ্দারের বাড়ীতে মাল উঠাইয়া দিয়াছি কিন্তু সে তাহা লইয়া কি করিয়াছে, কিম্বা কোন্ স্থানে রাখিয়াছে, তাহা আমি এক্ষণে নিশ্চয় বলিতে পারি না, আপনি সেই বাড়ীতে তল্লাস করিলেই পাইতে পারিবেন। ভিন্ন গ্রাম হইতে পটপূজার তামাশা দেখিতে আমাদের তিনজন কুটুম্ব আসিয়াছিল তাহারাও আমাদের সঙ্গে ডাকাইতি করিতে গিয়াছিল এবং মনোহরের নিকট অপহৃত মালের অংশ পাওয়ার লোভে তাহারা এখনও মনোহরের বাড়ীতে আছে, তাহাদিগকে আমার সম্মুখে আনিলে, তাহাদের দ্বারা আমি একরার করাইয়া দিতে পারিব; কিন্তু আমার নিজের কোন কথা লিপিবদ্ধ করিতে দিব না।"

মনোহরের বাড়ীর অন্য এক ঘরে প্রথমেই চৌকীদারেরা দুই ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া রাখিয়াছিল; এক্ষণে তাহাদিগকে হলধরের নিকট উপস্থিত করিবামাত্র তাহারা অবলীলায় হলধরের বর্ণিত বৃত্তান্ত

সমস্ত দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে লিখাইয়া দিল, কিন্তু বলিল যে, তাহারা গোপাল পোদ্দারের বাড়ী দেখাইয়া দিতে পারিবে না, কারণ তাহারা পূর্ব্বে কখনও পূর্ব্বস্থলীতে আসে নাই, সুতরাং পথঘাট চিনে না। এমতাবস্থায় হলধর নিজেই গোপাল পোদ্দারের বাড়ী দেখাইয়া দিতে আমাদেব সঙ্গে চলিল।

মনোহব যে স্থানে আবদ্ধ ছিল, সেই স্থানে তাহাকে ও তাহার কুটুম্বদ্বয়কে উচিত প্রহরীর জেম্মায় রাখিয়া, আমরা সকলে গোপাল পোদ্দারের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। মনোহরের বাড়ী হইতে গোপাল পোদ্দারের বাড়ী যাইতে পূর্ব্বস্থলীর থানার সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। সেইখানে দেখিলাম, যে পথের ধারে থানার দারোগা একটি রূপা বান্ধান হুকা হাতে করিয়া কয়েকজন লোক সঙ্গে (বোধ হয়, আমাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া) আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। থানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবার নিমিত্ত তিনি অনেক আকিঞ্চন করিলেন কিন্তু আমি তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আমার লক্ষিত স্থানাভিমুখে ধাবমান হইলাম।

থানা হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে হলধর একটি বাড়ীর সম্মুখে আমাদিগকে আনিয়া তাহা গোপাল পোদ্দারের বাড়ী বলিয়া দেখাইয়া দিল। দেখিলাম, ইষ্টক-নির্ম্মিত বাড়ী, বাহিরে একটি একতালা ঘরে বস্ত্রের একখানি দোকান আছে। অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। চতুর্দ্দিকে দ্বিতল চকমিলান কোঠা, নিম্ন তালার সম্মুখে এক উচ্চ প্রশস্ত দৌড়দার রোয়াক এবং সমস্ত উঠান টালি দ্বারা আচ্ছাদিত। উচ্চ শ্রেণীর একজন গৃহস্থের বাড়ী বোধ হইল। এমন বিত্তশালী ব্যক্তি চোরামালের কারবারে লিপ্ত থাকিবে, তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। প্রত্যুত ইহাও ভাবিলাম, যে হয়ত এই ঘৃণিত ব্যবসাই গোপালের ধনের মূল। যাহা হউক মনে বড়ই সন্দেহ হইল।

কিন্তু যে স্থলে একজন চোর তাহার নাম উচ্চারণ করিয়াছে এবং সেই কথায় আমি তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছি, তখন দেখিলাম যে আইন অনুসারে তাহার খানাতল্লাসী না করিলে আর উপায় নাই।

আমি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া উচ্চ স্বরে কয়েকবার গোপাল পোদ্দারের নাম উচ্চাবণ করিয়া ডাকিলাম। কিন্তু কাহাবও কোন উত্তর পাইলাম না। বাড়ী জনশূন্য বোধ হইল। অতএব অল্পক্ষণ বিলম্ব করিয়া গ্রামের তিনজন প্রজা আনাইয়া আমি গোপাল পোদ্দাবের খানাতল্লাসী করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিবেচনা করিলাম, যে এই কার্য্যে আমার সঙ্গী সকলকে অনুমতি করিলে গৃহস্থিত অনেক মূল্যবান দ্রব্যের অপচয় হইবে, অতএব সকলকেই উঠান পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া কেবল জমাদার ও ছিব্রু চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়া, আমি প্রথমে নিম্ন তালার কুঠরী সমস্ত পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে যে ঘরে প্রবেশ করিলাম, তাহাতে দেখিলাম যে ঘরের অর্দ্ধখণ্ড ব্যাপিয়া প্রায় ছাদ পর্য্যন্ত খড়ের পোয়াল স্তূপ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং অপর পার্শ্বের এককোণে কয়েকটি স্ত্রীলোক একত্রে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা দৃষ্টে স্ত্রীলোককে সম্মান করিতে শিখিয়াছিলাম। স্ত্রীলোক, বিশেষ এমন শঙ্কাযুক্ত অবস্থায় স্ত্রীলোকগুলিকে দেখিয়া আমি এককালে দ্রব হইয়া পড়িলাম, এবং তাহাদের শঙ্কা দূর করিবার মানসে আমি তাহাদিগকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া করুণ বাক্যে বলিলাম, যে আমি কেবল চোরাদ্রব্যের অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি স্ত্রীলোক কিম্বা নির্দ্দোষ মনুষ্যের প্রতি অত্যাচার করিতে আসি নাই, অতএব তাঁহারা নিশ্চিন্ত হউন, তাঁহাদিগের প্রতি কাহাকেও কোন কুব্যবহার করিতে, এমন কি এই ঘরের মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিব না। এইরূপ বক্তৃতা ঝাড়িয়া, আমি ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং কবাট বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া সকলকে তাহার মধ্যে যাইতে

নিষেধ করিয়া দিলাম। আমি যেমন বর্ব্বর, তেমনই নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিলাম। বেণের মেয়েরা যে সেই স্থানে চোরামালের প্রহরী স্বরূপে বসিয়া আছে, তাহা আমার "শিক্ষা বিভ্রাটের" ফলে, মনে উদয় হইল না। অবলা নারী দেখিয়া কেবল তাহাদের মঙ্গল কামনাতেই আমার চিত্ত ব্যাপৃত রহিল; প্রতিকূল চিন্তা কিম্বা সন্দেহ আসিয়া প্রবেশ করিতে তাহাতে স্থান পাইল না। এক্ষণে তাই ভাবি, যে যদি তখন রামকুমার কিম্বা ছিরূ চৌকীদার সঙ্গে না থাকিত, তাহা হইলে গোপাল পোদ্দারের বাড়ীতে সেই দিবস আমার নাক কাণ রাখিয়া আসিতে হইত।

এইরূপে আমি নীচের সকল ঘর অন্বেষণ করিয়া কোন স্থানে আমার বাঞ্ছিত দ্রব্য পাইলাম না। হতাশ চিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে পাকের ঘরে প্রবেশ করিয়া আলোক-শূন্য একটা প্রাচীরের গায়ে একটা ছোট দ্বার দেখিলাম। আমার সঙ্গী ছিরূ চৌকীদার তাহা হস্ত দ্বারা ঠেলিয়া খোলাতে তন্মধ্যে একটা অন্ধকার চোরাকুঠরী আবিষ্কৃত হইল। ছিরূ এই কুঠরীর মধ্যে তাহার হস্ত-স্থিত একটা শড়কি চালাইয়া দেওয়াতে "মারিও না আমি বাহিরে যাইতেছি" বলিয়া এক ক্ষুদ্রকায় মনুষ্য বাহির হইয়া লম্ফ দিয়া ভূমিতে নামিল। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সে গোপাল পোদ্দার বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, আমি তাহার দক্ষিণ হস্তখানা ধরিলাম, ধরিয়া বোধ হইল যে তাহার শোণিত জ্বরবিকারগ্রস্ত রোগীর শিরার রক্তের ন্যায় দ্রুতবেগে বহিতেছে এবং গাত্রের চর্ম্মও সেইরূপ উত্তপ্ত এবং আতঙ্কে শরীর কম্পিত হইতেছে। আমি তাহাকে প্রহার করিব না বলিয়া অভয় প্রদান করত বাহিরে আসিলাম। গোপাল পোদ্দার হ্রস্বচ্ছন্দ মনুষ্য, ফুট গৌরবর্ণ, তাহার হস্ত-পদের গঠন সুন্দর এবং মুখশ্রীও উত্তম। যদিও কৃশ তথাপি তাহার অস্থি ও শিরা সকল অদৃশ্য। বয়স চল্লিশের ঊর্দ্ধ নহে। সহাস্য বদন। এমন ঘোর বিপদের সময়ও সে শ্রান্ত বদনে আমার প্রশ্ন সমস্তের উত্তর দিয়াছিল।

জিজ্ঞাসামতে কহিল, যে সে আমাদের আগমনে ভয়ে চোরাকুঠরীর মধ্যে পলাইয়া রহিয়াছিল। কিন্তু অপহৃত মাল সম্বন্ধে সে এমন কথা মুক্তকণ্ঠে অস্বীকার করিল না, যে তাহার গৃহে নাই। সে যে কয়েকটি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা এখনও আমার স্মরণ আছে। তাহা এই যে "আমার ঘরে ত অনেক প্রকার দ্রব্য আছে, তল্লাস করিয়া দেখুন, যদি তাহার মধ্যে আপনার কোন জিনিস হয়, তবে আর আমার বলিবার কি আছে?" চোরামাল নাই বলিয়া সে মুখ তুলিয়া আমাকে বলিতে পারিল না। পোদ্দারের কথার ভাবে আমার কিঞ্চিৎ আশার উদয় হইল এবং দ্বিতলের কক্ষগুলি দৃষ্টি করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। সেখানেও যাহা দেখিলাম, তাহাতে গোপাল পোদ্দার ও তাহার পরিজনের উপর আমার শ্রদ্ধার আধিক্য হইল। সকল ঘরের দ্রব্যজাত সুন্দররূপে সজ্জিত। কাষ্ঠের এবং ধাতুর তৈজস সমস্ত মার্জ্জিত এবং ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। যেখানে যে দ্রব্য রাখা উচিত, তাহা সেই স্থানে রাখা হইয়াছে এবং কোনও ঘরে কোনও অপবিত্র জিনিস নাই। এক ঘরেও একজোড়া বিনামা দেখিতে পাইলাম না; বোধ করি, তাহা অপবিত্র বলিয়া ঘরে স্থান পায় নাই। গোপালের শয়নকক্ষের প্রবেশদ্বারের উপরে প্রভু নিতাই-চৈতন্যের এক পট এবং তাহার নিম্নে হরিনামের মালায় কারুকার্য্য-শোভিত সাটিনের একটি কুথলী ঝুলিতেছে। এই সকল দেখিয়া বোধ করিলাম যে পোদ্দারেরা পরম বৈষ্ণব। সকল ঘর বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কোন ঘরেই আমার বাঞ্ছিত দ্রব্য পাইলাম না। তাহাতে মনোভঙ্গ হইয়া নীচে আসিলাম এবং একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া গোপাল যে চোরাকুঠরী হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিতে ছিরু চৌকিদারকে উঠাইয়া দিলাম। সেখানেও কিছু পাওয়া গেল না। অবশেষে নিতান্ত হতাশ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে রান্নাঘরের পার্শ্বে একটা অন্ধকার ঘর দেখিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সেই ঘরে ঐ এক দ্বার ভিন্ন অন্য দ্বার কিম্বা বাতায়ন ছিল না ঘরটি সম্পূর্ণ অন্ধকার। আমাদের হস্তে প্রদীপ না থাকিলে বোধ করি তাহার মধ্যস্থিত দ্রব্যাদি ভালরূপে দেখিতে পাইতাম না। প্রদীপের আলোতে দেখিলাম যে এক প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানা তক্তা হেলাইয়া রাখা হইয়াছে। আমরা দুইজনে সেই তক্তার নিকট দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলাম। ছিব্রু অন্যমনস্কে তাহার হস্তের শড়কির মাথা একস্থানে দুই তক্তার মধ্যস্থিত ছিদ্রের ভিতর চালাইয়া দেওয়াতে তাহা কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া একটা দ্রব্যে ঠেকিয়া ঝন্ করিয়া উঠিল। ছিব্রু অমনি আমার হস্তে প্রদীপ দিয়া, একখানা তক্তা টানিয়া অপসারিত করিল এবং তাহার মধ্যে তক্তার দ্বারা আচ্ছাদিত কয়েকটা বস্তা উপর্যুপরি সাজান রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। আমরা তৎক্ষণাৎ উভয়ে আহ্লাদভরে "পেয়েছি, পেয়েছি" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঠিক সেই একই সময়ে রামকুমার চৌকীদার ঐরূপ শব্দে চীৎকার করিয়া আর এক ঘর হইতে আমাদের নিকট ধাবমান হইতেছিল। রামকুমারের লাম্পট্য-দোষ ছিল, সে বেদেদের স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী শুনিয়া, তাহাদিগকে দেখিবার জন্যে উৎসুক হইয়া অবশেষে আমি যে ঘরে স্ত্রীলোকদিগকে রাখিয়া কবাট বন্ধ করিয়া আসিয়াছিলাম, সেই ঘরে "মাল" আছে বলিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। কুরুচির ভাষায় সুন্দরী স্ত্রীলোককে "মাল" বলিয়া উক্ত হয়। রামকুমার মাল দেখিবার জন্য সজোরে কবাট ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র স্ত্রীলোকেরা তাহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ত্রাসে জড়সড় হইয়া কক্ষমধ্যস্থিত খড়ের পোয়ালের স্তূপের উপর পড়িয়া গেল এবং তাহাতে আল্‌গা পোয়ালগুলি শর্ শর্ শব্দ করিয়া স্থানভ্রষ্ট হওয়াতে, তাহার মধ্যে আমার আবিষ্কৃত বস্তার ন্যায় কয়েকটা বস্তা ব্যক্ত হইল। আমাদের বাঞ্ছিত দুর্লভ "মাল" দেখিয়া রামকুমার নৃত্য করিতে করিতে আমার নিকট ঊর্দ্ধশ্বাসে উপস্থিত হইল এবং

আমার সংবাদও অবগত হইয়া, আহ্লাদে মত্ত হইয়া আমাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। প্রাঙ্গণের চৌকীদারেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া কেহ আবিষ্কৃত দ্রব্যের ঘবে, কেহ রামকুমাবেব ঘরে, প্রবেশ করিয়া দুই-তিনজনে এক একটা বস্তা টানিয়া রোয়াকে আনিল এবং সেই-খান হইতে উঠানে নিক্ষেপ কবিতে লাগিল। উঠানের শানের উপর প্রত্যেক বস্তার আঘাতে ঝন্ কবিয়া শব্দ হইল এবং সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ৫০ জন চৌকীদারের উল্লাসোত্তেজিত কণ্ঠ হইতে এককালে এক একটা জয়ধ্বনি উঠিল। এমন একবার নহে। বামে এক, রামে দুই, রামে তিন করিয়া চৌদ্দখানা বস্তার চৌদ্দটা ঝনাৎ শব্দে মিলিত হইয়া চৌদ্দবার জয়ধ্বনি গগনে উঠিল। গগনে উঠিল, পোদ্দারের ইষ্টক-নির্ম্মিত চারিচক ভেদ করিয়া গ্রামের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া ধাবমান হইল। অধিবাসীরা প্রথমে ত্রাসযুক্ত হইয়াছিল ; কিন্তু গোপাল পোদ্দারের বাড়ীতে চোবামাল ধবা পড়িয়াছে শুনিয়া তাহাদের মনে আনন্দোদ্ভব হইল। ক্রমে দুই-একজন করিয়া এত অধিক লোক উপস্থিত হইল যে, অবশেষে প্রাঙ্গণে তাহাদের স্থানাভাব হইয়া পড়িল। কিন্তু কি দর্শক, কি আমার সঙ্গী চৌকীদার, সকলেই আহ্লাদে প্রফুল্ল। বিশেষ রামকুমার চৌকীদার। সে ইহার মধ্যে কি প্রকারে বলিতে পারি না, এক ছিলাম গাঁজা টানিয়া আসিয়া, আমাকে বলপূর্ব্বক তাহার স্কন্ধে উঠাইয়া মুখে “ওমা দিগম্বরী নাচো গো” গীত গাইতে গাইতে সকল চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়া অপহৃত বস্তাগুলি কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিল।

এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কাহারও ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ হয় নাই, কিন্তু নৃত্যের পরক্ষণেই সকলের পেটে আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং আমি তাহা শুনিয়া আহারীয় দ্রব্যের জন্য রামকুমারের হস্তে চারি টাকা প্রদান করিলাম। সে টাকা লইয়া বাজারে গেল কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বাজারের কয়েকজন দোকানদার সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জানাইল যে, মনোহরকে ধৃত করাতে এবং গোপাল পোদ্দারের

বাড়ীতে চোরামাল বাহির হওয়াতে বাজারের দোকানী পসারীরা অত্যন্ত উপকার বোধ করিয়াছে, অতএব আমি অনুমতি করিলে, তাহারা কৃতজ্ঞচিত্তে বিনামূল্যে আমার সঙ্গীগণকে জলখাবার দিতে প্রস্তুত আছে। আমি সম্মত হইলাম এবং চৌকীদারেরা সকলে আহার করিতে গমন করিল। তখন আমি গোপাল পোদ্দারের জবাব লিপিবদ্ধ করিলাম। সে কহিল ডাকাইতির কথা সে কিছুই অবগত নহে, কিন্তু মনোহর এই চৌদ্দটা বস্তা বিক্রয় করাতে, সে তাহার মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া গৃহে রাখিয়াছে। ইহার পরক্ষণেই পূর্ব্বস্থলীর থানার সেই জমাদার পুনরায় আমার নিকট আসিয়া আমাকে এক নির্জ্জন স্থানে ডাকিয়া লইয়া বলিল যে "আপনি ত আপনার কার্য্য বেশ হাসিল করিয়াছেন, মনোহরকে ধরিয়াছেন এবং মালও বাহির করিয়াছেন, এখন ইচ্ছা করিলে কিছু টাকাও পাইতে পারেন। আপনি যদি এইরূপ রিপোর্ট করেন যে এই সকল বস্তাগুলি গোপালের বাড়ীর মধ্যে পান নাই তাহার পিছাড়ার বাগিচার মধ্যে পাইয়াছেন, তাহা হইলে গোপালের পুত্র আপনাকে দুই হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছে।" ইহা শুনিয়া আমি তাহার কথায় কোন উত্তর করা উচিত বিবেচনা করিলাম না।

চৌকীদারেরা আহার করিয়া প্রত্যাগমন করিলে শুনিলাম যে, আমাদের আহ্লাদের গোলমালের সময় হলধর পলায়ন করিয়াছে। ভাবিয়া দেখিলাম যে হলধর কর্ত্তৃকই আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি অধিকন্তু তাহাকে নিষ্কৃতি দিব বলিয়া আমি তাহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম এবং আবশ্যক হইলে যখন ইচ্ছা তাহাকে ধৃত করিতে পারিব, এমতাবস্থায় আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কার্য্য না করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলাম।

তিনখানা শকটে বস্তাগুলি উঠাইয়া এবং মনোহর ও তাহার দুইজন সঙ্গী ও গোপাল পোদ্দারকে লইয়া আমরা সকলে নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বস্থলীর থানার সম্মুখে আসিয়া শুনিলাম যে

দারোগা এবং তাহার অধীনস্থ আমলারা কেহ থানায় নাই; বোধ করি, তাহারা থানার নিকট হইতে অন্য জেলার দারোগা আসিয়া চোরামাল ধরিয়া লইয়া যাওয়াতে লজ্জা বিবেচনা করিয়া আমার সহিত দেখা করিল না। পথিমধ্যে দেখিলাম যে গ্রামের অধিবাসীগণ আবালবৃদ্ধবনিতা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অনেকে বিশেষ ব্রাহ্মণেরা আমার মস্তকে যজ্ঞোপবীত ছোঁয়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং সকলে বলিল "যেন ছাড়া না হয়, এই দুরাত্মারা গ্রামে যেন আর ফিরিয়া আসিতে না পারে।" ইহাতেই প্রতীয়মান হইল যে মনোহরের দৌরাত্ম্যে গ্রামস্থ সকল লোক জ্বালাতন হইয়াছিল; নচেৎ সে ধৃত হওয়াতে সর্ব্বজনের মনে কেন অসীম আহ্লাদ হইবে এবং সে ফিরিয়া আসিতে না পারে তাহার নিমিত্ত কেনই বা সকলে এমন আকিঞ্চন প্রকাশ করিবে?

অতঃপর আমরা দিবা অবসান সময় নবদ্বীপ পৌঁছিলাম। সে স্থানেও মনোহরকে দেখিবার নিমিত্ত দুই দিবস পর্য্যন্ত বহু জনতা হইয়াছিল। নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি, খ্যাতনামা ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, রত্নবিশেষ কিন্তু স্বল্পায়ু গোলকনাথ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি অধ্যাপক মহাশয়েরা, যাঁহারা কখনও থানার ত্রিসীমায় আইসেন নাই, তাঁহারাও সেই দিবস মনোহর ও গোপাল পোদ্দারকে দেখিবার নিমিত্ত থানায় পদার্পণ করিয়াছিলেন।

তদনন্তর উচিত সময়ে দস্যুগণ অপহৃত দ্রব্য সহিত শান্তিপুর এবং অবশেষে দাওরার বিচারের নিমিত্ত কৃষ্ণনগর প্রেরিত হইল। জজ ব্রাউন সাহেব মনোহরকে চির নির্ব্বাসনের ও তাহার দুইজন সঙ্গীকে চৌদ্দ চৌদ্দ বৎসরের ও গোপাল পোদ্দারকে দশ বৎসরের কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং সদর নেজামত আদালতেও সেই দণ্ডাজ্ঞা স্থির রহিল। এইরূপে নবদ্বীপ অঞ্চলের শান্তির কণ্টক নির্ম্মূল হইল এবং আমার তিনশত টাকা পুরস্কার ও পঁচিশ টাকা বেতন বৃদ্ধি ও সদর থানায় বদলি হইল।

কিন্তু মনোহরের কীর্ত্তি এখনও সমাপ্ত হইল না। আরও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে।

সদর নিজামতের হুকুম আসার পর রীত্যনুসারে মনোহর আলিপুরের জেলখানায় প্রেরিত হয় ও তথা হইতে কয়েক মাস পরে ৫০।৬০ জন পঞ্জাবী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দায়মালী কয়েদীর সঙ্গে, নির্ব্বাসনের নিমিত্ত ব্রহ্মদেশের থায়েটমিউ নগরে ক্ল্যারিসা নামক জাহাজে চালান হয়। সমুদ্রমধ্যে মনোহর তাহার সঙ্গী কারাবাসীগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এক বিপ্লব উপস্থিত করে এবং জাহাজের কাপ্তান ও অন্যান্য সাহেবকে অসতর্ক অবস্থায় পাইয়া বধ করে। কেবল জাহাজ চালাইবার নিমিত্ত কয়েকজন দেশী খালাসীর প্রাণরক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন রাজার রাজ্যে জাহাজ চালাইতে আদেশ করে। কিন্তু বিদ্রোহীদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ এক রণতরীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই মানওয়ারের কাপ্তেন তাহাদিগকে ধৃত করিয়া অকয়েব্ বন্দরে লইয়া যায় এবং তথায় মনোহর প্রভৃতির বিচার হইয়া ফাঁসী হয়।

নীলকুঠী

প্রস্তাবনা

আমি এই প্রবন্ধে যে প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম নব্য পাঠক-দিগের তাহা সুন্দররূপে বুঝিবার জন্য ভূমিকা স্বরূপে সেকালের নীলকরদিগের চরিত্রের এবং কার্য্যপ্রণালীর সংক্ষেপ বিবরণ আবশ্যক।

বঙ্গের প্রায় সকল প্রদেশেই নীল জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে কৃষ্ণনগর ও যশোহর জেলাই পূর্ব্বে নীলের গৌরবের স্থান ছিল। নীল উত্তম এবং অধিক পরিমাণে হয় বলিয়া ঐ সকল স্থানে সাহেব-দিগের অনেক কুঠী স্থাপিত ছিল এবং বিস্তব টাকাও ব্যয় হইত। সাহেবেরা যে প্রণালীতে নীল প্রস্তুত করিতেন, তাহাতে কোনও একজন সাহেবের নিজের টাকা দ্বারা কুঠী কিম্বা কনসারণ খুলিতে সাধ্য হইত না। অল্প কিম্বা অধিক সংখ্যায় কয়েকটি কুঠী এক অধিকারস্থ হইলেই তাহাকে কনসারণ বলিত, এবং কনসারণ স্থাপনা করিতে না পারিলে ওকার্য্যের সুবিধা হইত না। এইক্ষণে যেমন বহু সাহেব একত্রিত হইয়া আসাম ও কাছাড় প্রভৃতি দেশে চা-বাগিচা খুলিতেছেন, পূর্ব্বেও সেই প্রণালীতে কয়েকজন সাহেবে এক এক কোম্পানী গঠিত করিয়া নীলের কনসারণ স্থাপন করিতেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণনগর অঞ্চলে ওয়াটসন কোম্পানী অধিক ধনী ও ব্যাপক ছিল। কৃষ্ণনগর জেলায় প্রায় সমস্ত স্থানেই ইহাদের কুঠী ছিল। যদি কেহ এই প্রদেশের বিমানে উঠিয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আমাদের স্ত্রীলোকে চটের উপরে বড়ি দিলে যেরূপ দৃশ্য

হয়, ঠিক সেইরূপ ভাবে কৃষ্ণনগর জেলার মাটির উপরে নীলকুঠীগুলি দৃষ্ট হইত। যাঁহারা বাবু দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নীলকর সাহেবদের চরিত্রের কেবল দোষের ভাগই জানিতে পারিয়াছেন। ঐ পুস্তকের লিখিত বিবরণ সমস্ত যে নিতান্ত অমূলক তাহা আমি বলিতে পারি না। ইহা নিশ্চয়, যে নাটকের প্রয়োজনীয় অত্যুক্তি সকল বাদ দিলে দীনবন্ধুবাবুর পুস্তকে অনেক সত্য বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে নীলকর সাহেবদিগের চরিত্রে কোনও প্রশংসার বিষয় ছিল না এবং সকল নীলকরই মিত্রজার বর্ণিত সাহেবের ন্যায় পামর এবং অত্যাচারী ছিলেন, তাহা নহে। নীলকর সাহেবদিগের যেমন দোষ ছিল, তেমন পক্ষান্তরে অনেক গুণও ছিল এবং তাঁহাদের প্রাধান্যের সময় তাঁহারা দেশের অনেক উপকারও করিয়াছিলেন। অনেক নীলকর যেমন নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিল, তেমন অনেকে খুব দয়াশীল এবং ধর্ম্মভীত ছিলেন। আমি নাটক কিম্বা কবিতা লিখিতেছি না, সাদা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাই আমার উদ্দেশ্য ; অতএব আমি পক্ষপাত না করিয়া নীলকর সাহেবদিগের দোষ ও গুণ সমভাবে বিবৃত করিতে বাধ্য এবং তাহা করিতেও সাধ্যমতে চেষ্টা করিব।

"নীলকরের দৌরাত্ম্য" বলিয়া আমাদের মধ্যে যে চিরপ্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা ঘটিবার দুইটি মূল কারণ ছিল। ঐ দুইটি কারণ দূর করা অসাধ্য না হইলেও নীলের ব্যবসার অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এমন কঠিন কার্য্য ছিল, যে তাহা প্রায় অসাধ্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাহার প্রথম কারণ এই যে, ধানের ভূমিতেই নীল উত্তম জন্মে এবং ভূমি যত উৎকৃষ্ট হয়, নীলও সেই পরিমাণে অধিক উৎকৃষ্ট হয় ; বিশেষতঃ নীলের ও ধানের চাষ একই সময়ে সম্পাদিত হয়। কিন্তু কৃষকেরা ধানের চাষেরই অধিক পক্ষপাতী, নীলের চাষ করিতে সহজে ইচ্ছা করে না। কারণ ধানে প্রজার সম্বৎসরের আহার, গরুর খোরাক এবং অন্যান্য অনেক

প্রকার উপকার হয় কিন্তু তাহাবা নীলকর সাহেবদিগের নিকট নীলের গাছের জন্য যে মূল্য পাইত, তাহাতে তাহাদের তত্তুল্য লাভ হইত না। বিশেষ সাহেবেরা যত কম মূল্যে প্রজার দ্বাবা নীল জন্মাইয়া লইতে পারিতেন, তাহাব সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেন। ধানের ন্যায় নীলের বাজার দব ছিল না। সাহেবেরা যে একদব স্থির করিয়া বাখিয়াছিলেন সেই হারে চিবকাল ধবিয়া, জন্মা-অজন্মার তারতম্য বিবেচনা না করিয়া, প্রজাদিগের নিকট নীলের গাছ লইতেন, এবং সেই হারও প্রজাদিগের ইচ্ছামতে স্থিরীকৃত হয় নাই, সাহেবদিগের ইচ্ছামতে স্থির হইয়াছিল, এবং ইহাতে কৃষকদেব কখনও লাভ না হইয়া ববং বৎসর বৎসর সাহেবেব নিকট তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। অধিকন্তু প্রজাদিগের উত্তম জমি সকলে নীলকরেরা তাহাদিগকে নীল ভিন্ন অন্য কিছু বপন কবিতে দিতেন না সুতবাং নীলেব প্রতি প্রজার সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং পারগপক্ষে তাহাবা নীলের চাষ করিতে ইচ্ছা করিত না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, নীল এবং ধান একই সময়ে কর্ত্তন করিতে হয় কিন্তু অগ্রে নীল কর্ত্তন করিয়া তাহা কুঠীতে দাখিল না কবিলে, কুঠীর লোকে প্রজাদিগকে তাহাদের স্বীয় ধানে হস্তক্ষেপণ করিতে দিত না, ইহাতে প্রজার অনেক বিরক্তি বোধ হইত এবং ক্ষতি হওয়ারও আশঙ্কা থাকিত।

ধানের জমিতে নীলের ন্যায় পাটও জন্মিয়া থাকে এবং এক্ষণে আমাদের অনেক প্রদেশে প্রজারা ধানের চাষ পরিত্যাগ করিয়া পাটের চাষে প্রবৃত্ত হয়, কারণ কোনও কোনও বৎসর ধান অপেক্ষা পাটে তাহারা অধিক লাভ করে। নীলকর সাহেবেরা যদি সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া যাহাতে প্রজার লাভ হয়, এমন কোনও বন্দোবস্ত করিতেন, তাহা হইলে কখনও নীলের দুর্গতি হইত না বরং প্রজারা নীল করিতে অগ্রসর হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া সাহেবেরা কেবল প্রজাকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিতেন এবং কিসে

প্রজা বাধ্য করিতে পারেন, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন। মফঃস্বলে আসিয়া সাহেব দেখিলেন, যে জমিদার হইতে পারিলেই প্রজার প্রতি যথেচ্ছা কার্য্য করা যাইতে পারে; অতএব কুঠীর এবং কনসারণের এলাকাস্থিত ভূমির অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জমিদারী ক্রয় করা সহজে এবং সর্ব্বদা ঘটিয়া উঠে না দেখিয়া অন্তত ইজারা ও পত্তনী লওয়ার চেষ্টা করিতেন। ইংরাজদের চরিত্রের এক মহৎ গুণ এই যে, যখন কোন কার্য্য করিতে তাহারা সংকল্প করেন, তখন যে যে উপায় অবলম্বন করিলে তাহা সংসাধিত হইতে পারে তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। সহস্র ব্যাঘাত উপস্থিত হইলেও, তাহা পরাজয় করিতে উদ্যত হন। টাকার আবশ্যক হইলে তাহা জলবৎ ঢালিতে পারেন।

প্রজাদিগের উপরে প্রভুত্ব করিবার নিমিত্ত সাহেবেরা জমিদারের নিকট হইতে বাহুল্য জমায় এবং বিস্তর সেলামী দিয়া ইজারা এবং পত্তনী লইয়া ভূম্যধিকারী হইলেন। কাজেই সেকালের মূর্খ প্রজারা সাহেব তাহাদের জমিদার হইয়াছে দেখিয়া ভয়ে সাহেবের বাধ্য হইয়া পড়িল। শুদ্ধ জমিদার হওয়ার বাসনায় নীলকরেরা বাহুল্য ধনক্ষয় করিয়া ভূমি সংগ্রহ করিত না। নীল করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য; ভূম্যধিকারী না হইলে প্রজা বাধ্য করিতে পারে না এবং প্রজা বাধ্য না হইলেও নীল চাষের সুবিধা হয় না বলিয়াই তাঁহারা জমিদার হইতেন। কিন্তু যেন তেন প্রকারেণ নীলের চাষ করিতে প্রজাদিগকে বাধ্য করা ভিন্ন, প্রজার প্রতি অন্যরূপ অত্যাচার করা সাহেবদিগের মূল অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু কাল সহকারে নীলকরদিগের প্রভুত্ব যতই গাঢ় হইতে লাগিল, ততই অন্যান্য বিষয়ে প্রজাদিগের উপরে দৌরাত্ম্যবৃদ্ধি হইল। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন নীলকরের এত অধিক প্রভুত্ব হইয়াছিল, যে নীলকরের প্রজা নীলকর সাহেবের অনুমতি ভিন্ন দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিতে কিম্বা সাক্ষ্য দিতে পারিত না। পুলিশের

কর্ম্মচারীরাও নীলকর সাহেবের বিনা অভিপ্রায়ে তাঁহার অধিকারের ভিতর কোন দোষী ব্যক্তি ধৃত করিতে পারিত না। ইহার এক বিশেষ কারণ এই ছিল যে প্রত্যেক কনসারণে যে সকল সাহেব মেনেজর অর্থাৎ অধ্যক্ষ হইয়া আসিতেন তাঁহারা প্রায়ই কলিকাতার সদাগর সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন সুতরাং জেলার হাকিমেরা তাঁহাদের কথার উপরে স্বভাবতঃ বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহাদিগকে খাতির না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই সকল মেনেজর যে অকারণ প্রজাদিগের প্রতি অহিতাচরণ কিম্বা নিকটবর্ত্তী ভূম্যাধিকারীদিগেব প্রতি অহিতাচবণ কিম্বা অযথা ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা হাকিমদিগের মনে সম্ভবপর বোধ হইত না।

বাস্তবিকও জেমস্ ফরলং প্রভৃতি সাহেবের ন্যায় অনেক মেনেজর উচ্চদরেব সাহেব ছিলেন। ইঁহারা সদ্‌বংশজাত, সৎচবিত্রান্বিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; কোন বিষয়ে সিবিলিয়ন হাকিমদিগের ন্যূন ছিলেন না। অনেক নীলকব অত্যন্ত দাতা ছিলেন এবং তাহাদের দাতব্যতার গুণে জেলাব আদালত ফৌজদারীর আমলাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন। সেকালে আমলাদিগের হস্তেই আহেলে মামলা অর্থাৎ অর্থী-প্রত্যর্থীদিগের শুভাশুভ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। কাজেই আমলা মহাশয়দিগকে খুশী রাখিতে পারিলে অনেক সময় মোকদ্দমায় জয়লাভ কবা বড় কঠিন কার্য্য ছিল না। নীলকর সাহেব-দিগের দানশক্তির একটি দৃষ্টান্ত দেখিলেই, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা কিরূপে সরকারী আমলাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতেন।

ওয়াটসন কোম্পানীর শিকারপুর কনসারণের একজন মেনেজর ছিলেন। তাঁহার নাম আমার এক্ষণে স্মরণ নাই। তিনি দাতা, ভোক্তা এবং অতি বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান সাহেব বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন এবং এই কনসারণের অনেক শ্রীবৃদ্ধিও করিয়াছিলেন। শিকার-পুরের কুঠী থানা করিমপুরের এলাকাভুক্ত ছিল এবং সেই সময়ে সেই থানায় একজন ব্রাহ্মণ দারোগা ছিলেন এবং তিনি যে কোন কারণে

হউক, ঐ সাহেবের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। কিছুকাল পরে, দারোগা করিমপুর হইতে কৃষ্ণনগরের সদর থানায় বদলী হইয়াছিলেন। পূজার সময় কুঠীর নীল প্রস্তুত হওয়ার পরে, সাহেব কলিকাতা যাইতে কৃষ্ণনগরের ঘাটে পিনেস লাগাইয়া জেলার সাহেবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। সাহেব কৃষ্ণনগর আসিয়াছেন শুনিয়া, দারোগা তাঁহাকে সেলাম করিতে গেলেন। দারোগা সাহেবের নিকট কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় সাক্ষাৎ করিতে যান নাই। সাহেব তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং অনেকদিন যাবৎ তাঁহার সহিত দেখাশুনা হয় নাই বলিয়া তিনি কেবল মিত্রভাবে সাহেবকে অভিবাদন করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব কতক্ষণ তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিয়া কোর্ত্তার জেবের মধ্যে হাত দিয়া একখানা বেঙ্ক নোট টানিয়া আনিয়া দারোগার হস্তে গুঁজিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে "দারোগা আমি এক্ষণ কলিকাতায় যাইতেছি, অধিক দিতে পারিলাম না, ফিরিয়া যাইবার সময় তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে আরও কিছু দিয়া যাইব।" দারোগা উত্তর করিলেন, যে তিনি কিছু পাইবার মানসে আসেন নাই, সাহেব তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, সেইজন্য তিনি কৃষ্ণনগর আসিয়াছেন শুনিয়া, শুদ্ধ সেলাম করিতে আসিয়াছিলেন। এই কথা বলিয়া দারোগা নোটখানা ফেরৎ দিলেন কিন্তু সাহেব তাহা গ্রহণ না করিয়া পুনরায় দারোগাকে তাহা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। নোটখানা কতটাকা মূল্যের নোট তাহা সাহেবও বলিয়া দেন নাই এবং দারোগাও তখন খুলিয়া পাঠ করিয়া দেখিলেন না। কিন্তু থানায় পৌঁছিয়া নোটখানা বাক্সে বন্ধ করিবার সময় দেখিলেন, যে তাহা একহাজার টাকার নোট। দারোগার মনে হইল, যে সাহেব নিঃসন্দেহ ভুলক্রমে তাঁহাকে এই নোটখানা দিয়াছেন, অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ সাহেবকে তাহা ফেরৎ দেওয়ার নিমিত্ত পিনেসে প্রত্যাগমন করিলেন। সাহেব দারোগাকে দেখিয়া ভাবিলেন যে দারোগা বুঝি কম টাকা পাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া

পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়াছে। কিন্তু দারোগা যখন যথার্থ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন, তখন সাহেব হাসিয়া বলিলেন "দেখ দারোগা, আমার জেবে একখানা হাজার আর একখানা একশত টাকার নোট ছিল, আমি তোমাকে একশত টাকার নোটখানা দেওয়ার মানসে সেইখানা ভাবিয়া এই হাজার টাকার নোটখানা টানিয়া বাহির করিয়াছিলাম, তোমার কপালে হাজার টাকার নোট উঠিয়াছে, তুমি তাহা রাখ, আমি আর তাহা ফেরত লইব না। এই টাকা যদি আমার হইত তবে খোদা তাহা কখনও আমার হাতে তাহা উঠাইয়া দিতেন না। খোদা তোমাকে দিয়াছেন, অতএব তুমি তাহা লইয়া যাও।" বলিয়া সাহেব কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া কামরার ভিতর হইতে দারোগাকে চলিয়া যাইতে বারম্বার আদেশ করাতে দারোগা তাহা লইয়া থানায় আসিলেন। এখন, পাঠক বলুন দেখি যে জগতে এমন পাষণ্ড কে আছে যে, এই সাহেবের উপকার না করে?

আমি এই শিকারপুর কনসারণের আর একটি ঘটনার কথা পাঠকদিগকে বলিব। সকলেই জানেন, যে শীতকালে জেলার হাকিমেরা মফঃস্বল পরিভ্রমণ এবং পরিদর্শন করিতে বাহির হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অনেক আমলাও যাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইঁহারা সকলেই পথখরচ বাবদ গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু কিছু ভাতা পাইতেন কিন্তু অনেক স্থানে আমলাদের এই টাকা ব্যয় না হইয়া বরং উপরন্তু বিলক্ষণ লাভ হইত। কারণ যখন যে নীলকুঠীর কিম্বা জমিদারের অধিকারে সাহেবের তাম্বু পড়িত, সেই নীলকর এবং জমিদার আমলাদিগকে কেহ শিধা কেহ খোরাকি বাবতে টাকা দিতেন। হাকিমেরাও নীলকর সাহেবদিগের কুঠীতে যাইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন এবং জমিদারেরা সওগাদ ভেট দিলে, তাহা গ্রহণ করিতেন, কারণ সাধারণতঃ এই সকল খোরাকি ও ভেট ঘুস বলিয়া বিবেচিত ছিল না। দাতাদিগের সঙ্গতি এবং দানশীলতা অনুসারে শিধা ও ভেটের তারতম্য হইত। শিকার-

পুরের এলাকায় আমলা মহাশয়েরা অনেক সুখভোগ করিতে পাইতেন। দুধে ঘৃতে আহার পরিপাটী হইত এবং তদতিরিক্ত প্রত্যেক আমলার পদ বিবেচনায় প্রতি বৎসর কুঠীর সাহেবের নিকট তাঁহারা উপহার স্বরূপে টাকাও পাইতেন। আমলারা যে শিধা এবং খোরাকি পাইত তাহা হাকিম সাহেবদিগের অগোচর ছিল না কিন্তু বোধহয় পারিতোষিকের বিষয় সকলে জানিতেন না। সে যাহা হউক, সময় সময় কিন্তু হাকিমদিগের মধ্যে কখনও এমন কড়া অপক্ষপাতী সাহেব আসিতেন, যে তিনি স্বয়ং তো কোন নীলকুঠীতে যাইতেনই না, উপরন্তু আমলারাও কাহারও নিকট শিধা কিম্বা খোরাকি না লইতে পারে, তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। এইরূপ একজন কড়া সাহেব একবার কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি পরিভ্রমণে বাহির হইয়া আমলাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে তাহারা কাহারও নিকট খোরাকি কিম্বা টাকা লইলে কর্ম্মচ্যুত ও কয়েদ হইবে। অধিকন্তু তিনি প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত হইয়া ভূম্যধিকারীর এবং নীলকুঠীর কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিতেন, যে তাহারা আমলাদ্দিগকে খোরাকি দিলে, তিনি তাহাদিগকে এবং তাহাদের মনিবকে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় করিবেন। সুতরাং অনেক স্থানে আমলারা নিজ নিজ প্রাপ্ত ভাতার টাকা ব্যয় করিয়া স্বীয় স্বীয় খোরাকি নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে মাজিষ্ট্রেট সাহেব শিকারপুর পৌঁছছিলেন। সে স্থানেও তিনি নীলকরের কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া এইরূপ সতর্ক করাতে, তাহারা কহিল যে, আবহমান কাল তাহারা আমলাদিগকে খোরাকি দিয়া আসিয়াছে। শিধা এবং খোরাকি দেওয়ার প্রথা বঙ্গদেশে সামাজিক ভদ্রতার একটি নিয়ম, ইহা নীলকর সাহেবেরা ইচ্ছা-পূর্ব্বক দিয়া থাকেন, ঘুস বলিয়া দেন না। বিশেষ হাকিমের আমলারা দেশীয় ভদ্রলোক, তাঁহারা বৎসরের মধ্যে কেবল এক-বারমাত্র শিকারপুর আসিয়া থাকেন, তদুপলক্ষে তাঁহাদিগকে

আদর অভ্যর্থনা করিয়া খাওয়াইতে না পারিলে, ভদ্রতার ত্রুটি এবং নীলকর সাহেবদিগের মনে লজ্জা হয়। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সকল বিনয়বাক্যের প্রতি কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার হুকুমমতে কার্য্য করিতে পুনরায় আদেশ করিলেন। নীলকর সাহেবও নিজে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া খোরাকি দিতে নিষেধ করিলেন। এই সকল আলোচনা প্রাতঃকালে হয়। কিঞ্চিৎ বেলা হইলে আমলারা দোকানে এবং বাজারে আহারের দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত লোক পাঠাইলেন কিন্তু কোনও দোকানদার কিম্বা বিক্রেতা আমলাদিগের নিকট মূল্য লইয়া কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে স্বীকার করিলেন না। মাজিষ্ট্রেটের খানসামাও বাজারে ঐরূপ এক পয়সার জিনিষ পাইল না। সাহেবদিগের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিলাতী আহারীয় দ্রব্য থাকে তাহা দ্বারাই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোনরূপ দিনপাত হইল, কিন্তু উপায়হীন আমলারা সমস্ত দিন উপবাস করিলেন। এই ঘটনার কথা শুনিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাজারে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে দোকানদারেরা তাঁহার আমলাদের নিকট জিনিষ বিক্রয় না করিলে, তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। ঘোষণা প্রচারিত হওয়ামাত্রই, সকল দোকানদার দোকান বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল এবং বাজারও লোকশূন্য হইল। ইহার কারণ বুঝিতে কাহারও কোন কষ্ট হইবে না। শিকারপুর অঞ্চল সমুদয়ই ওয়াটসন কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত। মেনেজর সাহেবের অনভিপ্রায়ে কেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, করিলে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটে এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবও তাহার প্রতিকার করিতে শীঘ্র পারেন না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব মেনেজর সাহেবের অনুরোধ রক্ষা না করাতে, মেনেজর ক্ষুণ্ণ হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত দোকানদারদিগকে এইরূপ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই নিষেধের ফলে আমলাদিগের সমস্ত দিনরাত্র

অনাহারে কালযাপন করিতে হইয়াছিল। পরদিবস প্রাতে মাজিষ্ট্রেট লজ্জিত হইয়া প্রধান আমলাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তোমরা যাহা ভাল জান, তাহা কর, আমার কর্ণে যেন কোন কথা আইসে না। আসিলও না ; আমলারা সেই দিবস সুখ-স্বচ্ছন্দে উদর ভরিয়া উপবাসের পারণ করিলেন এবং শিকারপুর হইতে উঠিয়া যাইবার সময় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক লাভ করিয়া গেলেন।

ইংরাজের রাজ্যে প্রজারা খোদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম অমান্য করিয়া নীলকরের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল। এমন প্রভুত্ব কে কবে করিতে পারিয়াছিল? এবং সেই প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য নীলকরেরা যে প্রাণপণ করিবে, তাহাই বা বিচিত্র কি?

কলিকাতায় সাহেব সদাগরদিগের অনেক বড় বড় বাড়ী আছে কিন্তু কৃষ্ণনগর জেলার স্থানে স্থানে নীলকরদিগের ভবন দেখিলে চমৎকার বোধ হইত। মোল্লাহাটী, খাল বোয়ালিয়া, নিশ্চিন্দিপুর শিকারপুর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি কনসারণের মেনেজরদিগের ভবন এবং কৃষ্ণনগরে তাঁহাদের ক্লব হাউস নামক বাড়ী এক এক বাজ অট্টালিকা বিশেষ ছিল। অনেক গৃহ নানা রঙ্গের প্রস্তরমণ্ডিত এবং নানাবিধ বহুমূল্য বিলাতি সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত ছিল। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক কুঠীতে অধিক মূল্যের তাজী ঘোড়া ও হস্তী পালে পালে থাকিত। নিজাবাদের নিমিত্ত মহিষ ও বলদ অসংখ্য ছিল। কৃষ্ণনগর হইতে সাহেবদিগের নিমিত্ত প্রত্যহ রুটী ও অন্যান্য আহারের সামগ্রী ও ডাকের পত্র লইয়া যাওয়ার নিমিত্ত নীলকরদিগের নিজের স্বতন্ত্র ডাক স্থাপিত ছিল এবং শীতকালে কোনও কোনও কুঠীতে ঘোড়দৌড়ের তামাশা হইত। ফলে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য নীলকরেরা টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইঁহারা অতিথি-সেবা করিতেও বিলক্ষণ তৎপর ছিলেন। কলিকাতা হইতে কোন সাহেব কিম্বা জেলার হাকিমেরা কুঠীতে উপস্থিত হইলে, আহারের ঘটার কথা বলিবার আবশ্যক নাই,—দেশীয় কোন আমলা

কিম্বা ভদ্রলোক গেলেও, কুঠীর কর্ম্মচারীদিগের বাসাতেও খুব আদব অপেক্ষা পাইতেন। এখনকার ন্যায় তখন নেটিব ডাক্তার ছিল না, বৎসরে বৎসরে কেবল দুই-চারিজন সব-আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মেডিকেল কালেজ হইতে বাহির হইতেন, কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই গবর্ণমেণ্টের কাজে নিযুক্ত হইতেন, সুতরাং দেশে ডাক্তারের অনাটন ছিল। অনেক কুঠীতে কুঠীর কর্ম্মচারী এবং প্রজাদিগের জন্য নীলকরেরা ডাক্তারী ঔষধপত্র রাখিয়া লোকের উপকার করিতেন।

প্রজাদিগের প্রতি নীলকরেরা নিজে তাঁহাদের নিজের স্বার্থের জন্য যে কিছু দৌরাত্ম্য করিতেন কিন্তু অন্য কাহাকেও প্রজাদিগের উপরে তাঁহারা হস্তক্ষেপণ করিতে দিতেন না। এমন কি পুলিশ আমলারাও নীলকরের প্রজার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। তদ্ভিন্ন কুঠীর সুবিধার নিমিত্ত স্থানে স্থানে অনেক রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং যদিও প্রজাদিগের নিকট চাঁদা তুলিয়া কিম্বা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাঁহারা এই সকল রাস্তা দিয়াছিলেন তথাপি ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে কেবল নীলকর সাহেবদিগের উদ্‌যোগে এবং যত্নে তাহা হইয়াছিল। আমি জানি এক বৎসর কলিকাতা সহরে ময়লার গাড়ী টানিবার জন্য কয়েক ব্যক্তি বনগ্রাম অঞ্চলে ধর্ম্মের ষাঁড় ধরিয়া লইয়া যাইতে আসে। সকলেই জানেন যে পল্লীগ্রামে এই সকল ষাঁড়ের দ্বারা গৃহস্থদিগের বিনামূল্যে গোবৎসোৎপাদন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় এবং তজ্জন্য তাহারা ঐ সকল বৃষকে অবাধে তাহাদের শস্য খাইতে দেয়। কলিকাতার চাপরাশিরা ষাঁড় ধরিতে আসিয়াছে দেখিয়া প্রজারা প্রতিবাদ করে। কিন্তু তাহারা এই নিষেধ না শুনাতে প্রজারা মোল্লাহাটী কুঠীর লারমোর নামক বড় সাহেবের নিকট নালিশ করে। লারমোর সাহেব তৎক্ষণাৎ চাপরাশিদিগের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে বারণ করিলেন কিন্তু তাহারা ক্ষান্ত না হওয়াতে, সাহেব বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ঐ অঞ্চল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া

কৃষ্ণনগরের ও কলিকাতার উভয় স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পত্র লিখিয়া ষাঁড় ধরা বারণ করিয়া দিলেন। এইরূপ কার্য্য করিতে আমাদের দেশীয় কোন জমিদারের কিম্বা অন্য ব্যক্তির সাধ্য হইত না। কার্য্যটি অতি তুচ্ছ বটে তথাপি ইহার দ্বারা নীলকরেরা দেখাইলেন যে তুচ্ছ কিম্বা গুরু হউক, প্রজার হিতসাধনে তাঁহারা সর্ব্বদা সমভাবে প্রস্তুত ছিলেন এবং এই জন্যই হাকিম সাহেবদিগের নিকট কেবল লারমোর সাহেব নহেন, নীলকর সাহেবেরা সাধারণতঃ প্রজাবন্ধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আমি একবার মাজিষ্ট্রেট এলিয়ট সাহেবের নিকট লারমোর সাহেবের এক কার্য্য সম্বন্ধে নিন্দা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "দারোগা! লারমোর তো রায়তের বন্ধু বলিয়াই প্রসিদ্ধ।"

অনেকের সংস্কার আছে যে, হাকিম সাহেবেরা তাঁহাদের আপন জাতিভাই বলিয়া অনেক সময়ে নীলকর সাহেব সম্বন্ধে পক্ষপাত করিতেন কিন্তু বাস্তবিক এই প্রবাদ সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমি অনেক বয়োধিক এবং নব্য মাজিষ্ট্রেটের অধীনে কর্ম্ম করিয়াছি এবং ক্রমান্বয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ কৃষ্ণনগরের সদর থানায় দারোগী করাতে জেলার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত অকপটে আমার কথোপকথন হইত। তাহাতে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়াছিলাম যে আসল কথা তাহা নহে। হাকিমেরা নীলকরের যথার্থ ভিতরের আচরণ জানিতে পারিতেন না; তাঁহাদের বাহিরের কার্য্য দেখিয়া হাকিম সাহেবেরা ভুলিয়া যাইতেন, এবং একবার একজনের প্রতি ভাল জ্ঞান হইলে, পরে তাহার সহস্র নিন্দা উঠিলেও বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এইরূপে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের নিকট নীলকর-দিগের খাতির সম্মান সংস্থাপিত হয় এবং নীলবিদ্রোহিতার প্রাক্কালে তাঁহাদের এত অধিক গৌরব হইয়াছিল যে, হালিডে সাহেব বঙ্গদেশের প্রথম লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়া কৃষ্ণনগর জেলার নীলকরদিগের নিমন্ত্রণমতে, তাঁহাদের কুঠী সমস্ত পরিদর্শনের অভিলাষ, অনেক

কুঠীতে ভোজ খাইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। আমাদের রাজপুরুষেরা কেহ কেহ নীলকরদিগকে কত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন এবং নীলকরের নিকট সুখ্যাতি পাওয়ার নিমিত্ত তাঁহাদের কত যত্ন ছিল, তাহা হালিডে সাহেবের এই পরিভ্রমণ সংক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিলেই প্রকাশ পাইবে। লাট সাহেব মোল্লাহাটীর কুঠীতে ভোজ ও পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া খাল বোয়ালিয়া কুঠীতে যাত্রা করিলেন। সাহেবেরা সকলে যাত্রা করার পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে চা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর পানীয় ও আহারীয় দ্রব্য দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া কেহ গজপৃষ্ঠে কেহ বাজীপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু সঙ্গী গরিব চাপরাশিগণ সেইরূপ সুখভোগ করিতে পারে নাই। প্রভুর যাত্রার আয়োজনে তাহারা কিছুমাত্র আহার করিতে অবকাশ পায় নাই এবং পদব্রজে হাতী-ঘোড়ার সঙ্গে প্রাণপণে তাহাদিগকে ধাবমান হইতে হইয়াছিল। পথও ভয়ানক ছিল। মাঠের রাস্তায় রৌদ্রের উত্তাপে পদাতিকদিগের অত্যন্ত কষ্ট হওয়াতে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নিকটে একটা ইক্ষুক্ষেত্র দেখিতে পাইয়া, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য দুইখান ইক্ষু ভাঙ্গিয়া লইয়া চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার প্রতি লারমোর সাহেবের দৃষ্টি পড়িল। অমনি সেই প্রজাবন্ধু নীলকর নীলবন্ধু গবর্ণরকে দেখাইয়া দিলেন যে "ঐ দেখুন আপনার চাপরাশি আমার গরিব প্রজার শস্য অপচয় করিতেছে।" আর যাবি কোথায়? গবর্ণর সাহেব তাঁহার অপক্ষপাতিত্ব এবং সুবিচার দেখাইবার নিমিত্ত চাপরাশিকে ডাকিয়া অব্যবহিত গ্রামে উপস্থিত হইবামাত্র দুই কুড়ি বেত্রাঘাত খাইতে হুকুম দিলেন এবং চাপরাশিকে তৎক্ষণাৎ তাহা গা পাতিয়া লইতে হইল। বর্ব্বর প্রজারা অবাক হইয়া নীলকরের এই অসাধারণ প্রভুত্ব দেখিতে লাগিল। তাহারা জানে, যে পথিকেরা ইক্ষুক্ষেত্র হইতে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক-আধগাছা ইক্ষু ভাঙ্গিয়া থাকে এবং এদেশে তাহা দোষ বলিয়া কেহ বিবেচনা করে না;

অতএব অমন নিরপরাধের এবং অধিক হইলেও এই তুচ্ছ অপরাধের, নিমিত্ত নীলকরের খাতিরে খোদ লাট সাহেব যখন তাহার নিজের ভৃত্যকে এমন গুরুতর শাস্তি দিলেন, তখন অন্য পর কা কথা, —ইংরাজ রাজ্যে নীলকর যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে। লারমোর সাহেবের এই কৌশল-মাখা কার্যে; প্রজাসাধারণের নিকট নীলকরের অসীম ক্ষমতা জারি হইল, এবং পক্ষান্তরে সাহেবমহলে হালিডে সাহেবের নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

নীলদর্পণে দেশীয় স্ত্রীলোকের প্রতি নীলকর সাহেবের দৌরাত্ম্যের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা নিতান্তই অমূলক। আমি অনেক অনুসন্ধানেও ঐ কথার কোন ভিত্তি পাই নাই, তবে সাহেবদিগেরও রক্তমাংসের শরীর ; রিপুপ্রাবল্য হইতে যে তাঁহারা এককালে বর্জ্জিত তাহা নহে কিন্তু আমি যতদূর দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে বুনা প্রভৃতি নীচজাতীয়া নষ্টা স্ত্রীলোকদিগের এবং বারাঙ্গনার সঙ্গে ভিন্ন অপবাদ শুনি নাই এবং তাহাতেও সাহেবেরা টাকা বিতরণ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের সম্মতি মতেলিপ্ত হইতেন। আমি কৃষ্ণনগরে যে বাড়ীতে বাস করিতাম সেই কোঠা একজন নীলকর তাহার বুনা উপপত্নীকে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া বানাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহা ভাড়া দিয়া এই স্ত্রীলোকটি মাসে মাসে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিত। আমি কোনও স্থানে বলপ্রকাশের দৃষ্টান্ত দেখিতে কিম্বা শুনিতে পাই নাই।

নীলকুঠী

২

সেকালে যেমন আদালতে ফৌজদারির এবং গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য কাছারীর কর্ত্তা সাহেবদিগের এক একজন দেওয়ান ছিলেন, নীলকর সাহেবদিগের প্রত্যেক কুঠীতে এবং কনসারণে সেইরূপ দেওয়ান ছিল। ইহারাই সাহেবদিগের দক্ষিণ হস্ত ছিল। সাহেবেরা নিজে কেবল নীল প্রস্তুতের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, দেওয়ানজির হস্তে জমিদারী শাসনের সম্পূর্ণ ভার অর্পিত থাকিত। তদ্ভিন্ন কুঠীর সমুদয় খরচ-পত্র দেওয়ানের হস্ত দিয়া হইত এবং জমিদারী এবং তালুক সমস্তের আদায় তহশীলও ইহারা করিত। ফলিতার্থে নীলকুঠীর দেওয়ানের হস্তে অনেক ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। কুঠীর যাবতীয় মামলা মোকদ্দমা ইহাদিগের উপস্থিত করিতে এবং চালাইতে হইত। যখন কাহারও সহিত কোন বিবাদ কিম্বা দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে আবশ্যক হইত, তাহার সমস্ত আয়োজনের ভার দেওয়ানের উপরে পড়িত এবং কুঠীর অপরাধে ইহাদেরই জেলখানায় যাইতে হইত। ইহাদের প্রকৃত খ্যাতি গোমস্তা ছিল, কিন্তু লোকে সম্মান করিয়া দেওয়ানজি বলিয়া ডাকিত। দৌরাত্ম্য, অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরাচরণের নিমিত্ত নীলকর সাহেবদিগের যে দুর্নাম আছে তাহার অধিকাংশের জন্য তাঁহাদের দেশীয় কর্ম্মচারীরা দায়ী। পারস্য ভাষায় গোলেস্তা পুস্তকে লিখিত আছে, যে, যদি বাদসাহের একটি কুক্কুট ডিম্ব আবশ্যক হয়,তাহা হইলে তাঁহার কর্ম্মচারীরা দেশের সমস্ত কুক্কুট জবাই করে। একথা বড় মিথ্যা নহে ; কারণ কুঠীর দ্বারা এমন অনেক দুষ্কার্য্য হইত,

যাহা সাহেবেরা কখনও জানিতে কিম্বা শুনিতে পাইতেন না। সকল সাহেবে এদেশের সকল অবস্থা জানিতেন না, তাঁহাদের দেশীয় কর্ম্মচারীরা ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইয়া বিভীষণের ন্যায় ভিতরের কথা জ্ঞাত করাইয়া যেরূপে কার্য্য করিলে সাহেবের উপকার হইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিত। ইহার কারণ যদি শুদ্ধ নিঃস্বার্থ প্রভু-ভক্তি হইত, তাহা হইলে তাহাদের নিন্দার কথা না হইয়া ববং প্রশংসার বিষয় হইত। কিন্তু তাহা নহে, কারণ ইহাতে তাহাদের বিলক্ষণ লাভের অঙ্ক ছিল। কুঠীর অধিকারের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে আমলাদিগের বেতন এবং উপরি রোজগার বাড়িয়া যাইত এবং সাহেবের প্রভুত্ব যতই বদ্ধমূল হইত, ততই তাহাদের ক্ষমতাবৃদ্ধি হইত। নীলকর সাহেবকে তাহার গোমস্তা এক বিষয়ে দুই পয়সার লাভ দেখাইয়া দিতে পারিলে, সে অনায়াসে অন্যদিকে নিজে চারি পয়সা রোজগার করিতে পারিত। আমলার দৌরাত্ম্যের বিষয় সাহেবের নিকট প্রতিবাদ উপস্থিত হইলে, আমলা সাহেবকে এক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিরস্ত করিত, যে,—প্রজা কিম্বা বাহিরের লোকের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার না করিলে কুঠীর প্রভুত্ব থাকে না এবং সাহেবকে কেহ ভয় করিবে না।

নীলকরের চাকরী করিয়া তাঁহাদের দেওয়ান গোমস্তারা অনেকে প্রচুর সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছিল এবং সকল জাতীয় লোক ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। ব্রাহ্মণ কায়স্থের অভাব ছিল না। খাল বোয়ালিয়া কুঠীতে ঢাকা জেলার কার্ত্তিকপুর অঞ্চল নিবাসী রামমাণিক্য সোম নামক একজন বঙ্গজ কায়স্থ দেওয়ান ছিলেন। এই ব্যক্তি অতি বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মদক্ষ ছিলেন এবং তিনি খাল বোয়ালিয়া কনসারণের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এই প্রদেশের লোক অত্যন্ত ভয়ও করিত। তাঁহার দর্পের একটি কৌতুককর কথা বলিব।

রামমাণিক্য যে ঘরে বসিয়া কাছারী করিতেন, তাহার সম্মুখে

সাধারণের এক বর্ম্ম ছিল। এক দিবস তিনি কাছারী করিতেছেন, এমন সময় একজন গোস্বামী তাঁহার তুরী ভেরী ও দলবল লইয়া পালকি আরোহণে ঐ পথ বাহিয়া যাইতেছিলেন। গোস্বামীর গলায় পৈতা দেখিয়া রামমাণিক্য তাহাকে আপন স্থান হইতে হাত তুলিয়া প্রণাম করিলেন। গোস্বামীও দেওয়ানজির ন্যায় ব্যক্তি তাঁহাকে প্রণাম করিলেন দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে পালকির মধ্য হইতে যতদূর পারিলেন হস্ত বাহির করিয়া, দেওয়ানজিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রামমাণিক্য তাঁহার মজলিশের উপস্থিত ব্যক্তিদিগের নিকট এই গোস্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা উত্তর করিল যে "উনি ভাজনঘাটের অমুক বৈদ্য গোসাঞী।" অনেকে অবগত না থাকিতে পারেন, যে কাটোয়া অঞ্চলের শ্রীখণ্ডের বৈদ্য গোস্বামীদিগের ন্যায় কৃষ্ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী ভাজনঘাট নামক গ্রামেও কয়েক ঘর বৈদ্য গোসাঞী আছেন। ইঁহারা অনেক নবশাখ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোককে মন্ত্র দিয়া থাকেন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্য গোস্বামীরা মুরশিদাবাদের কাশীমবাজারের প্রসিদ্ধ মহারাণী স্বর্ণময়ীর ইষ্ট-দেবতা। এইরূপ শ্রীখণ্ডের এবং ভাজনঘাটের বৈদ্য গোস্বামীদিগের অনেক ধনাঢ্য শিষ্য-সেবক থাকাতে তাঁহারা নিজে বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়াছেন। ভাজনঘাটের ইহারই একজন গোস্বামী রামমাণিক্য দেওয়ানের সম্মুখস্থ পথ দিয়া শিষ্যবাড়ী যাইতেছিলেন। একে পূর্ব্বদেশীয় বঙ্গজ কায়স্থ, তাহাতে আবার হেরিস সাহেবের দেওয়ান, রামমাণিক্য যাই শুনিল যে, যাহাকে সে প্রণাম করিয়াছে সে ব্রাহ্মণ নহে, বৈদ্য,—অমনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া গোসাঞীকে পালকি সমেত তাহার নিকটে উপস্থিত করিতে কয়েকজন লাঠিয়াল পাঠাইয়া দিল। সেই সময় ঐ প্রদেশে এমন অল্প লোক ছিল, যাহারা রামমাণিক্যকে তাচ্ছিল্য করিতে পারিত, কিম্বা ভয় না করিত। অল্পক্ষণের মধ্যে লাঠিয়ালেরা গোস্বামীকে দেওয়ানের নিকট উপস্থিত করিলে দেওয়ানজি কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা

করিলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ না বৈদ্য। গোস্বামী বৈদ্য বলিয়া উত্তর করিলে দেওয়ান এক ভ্রুকুটী সহকারে বলিলেন যে "তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে তুমি বৈদ্য হইয়া কায়েতের প্রণাম গ্রহণ করিয়াছ, ভাল চাও ত এই দণ্ডে সকলের সম্মুখে আমার প্রণাম ফিরাইয়া দেও।" গোসাঞী এতক্ষণ ভয়ে নবমী পূজার পাঁটার ন্যায় কাঁপিতেছিলেন, মনে ভাবিতেছিলেন যে দেওয়ান না জানি তাঁহাকে কতই গুরুতর শাস্তি দিবেন। কিন্তু দেওয়ানের মুখে এই লঘু আজ্ঞা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রামমাণিক্যকে নতশিরে এক নমস্কার করিলেন এবং দেওয়ানজিও তাঁহাকে ভবিষ্যতে সতর্ক থাকিতে বলিয়া বিদায় দিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণনগর জেলার সকল কুঠীতে ইদানীন্তন প্রায়ই কৈবর্ত্ত-জাতীয় ব্যক্তিরা দেওয়ান গোমস্তা ছিল। ইহারা অনেকে নীলকুঠীর কার্য্যে দক্ষ হইয়াছিল, এবং দুই তিন পুরুষ নীলকরের চাকরী করিয়া বিলক্ষণ সম্পত্তি করিয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশের বিশ্বাস বা ভৌমিক কিম্বা ভূঞা পদবী ছিল এবং দেখিতে শুনিতে, আচার ব্যবহারে এবং কর্ম্ম-কার্য্যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ অপেক্ষা হীন ছিল না। ইহারা অশ্বারোহণে খুব পটু ছিল, কারণ ভালরূপে ঘোড়া চড়িতে না পারিলে নীলকুঠীর গোমস্তগিরি কর্ম্ম চলিয়া উঠিত না। কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় শ্রাবণে নীলকর্ত্তন সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে কুঠীর সমস্ত নীলের ভূমি পরিদর্শন করিতে না পারিলে, নীলের ব্যাঘাত হইত সুতরাং অশ্বারোহণ অভ্যাস না থাকিলে এই কার্য্য বিধিমত নির্ব্বাহিত হইতে পারিত না। এইজন্য প্রত্যেক গোমস্তার ৩।৪টা অশ্ব নিযুক্ত ছিল।

নীলকুঠীর কৈবর্ত্তজাতীয় গোমস্তার মধ্যে ওয়াটসন কোম্পানীর গোমস্তা ভবানন্দ দেয়াড় নিবাসী কৃষ্ণলাল ভূঞা অত্যন্ত বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি তাঁহার জীবন কাটাইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে বিপুল সম্পত্তিও রাখিয়া গিয়াছিলেন। লেখাপড়ায়

পারদর্শিতা অধিক না থাকিলেও কার্য্যদক্ষতা এবং বৈষয়িক বুদ্ধি খুব চমৎকার ছিল। প্রতাপে, প্রভুভক্তিতে কৃষ্ণলাল খাল বোয়ালিয়ার দেওয়ান রামমাণিক্য অপেক্ষা বড় ন্যূন ছিলেন না। কৃষ্ণনগর জেলার উত্তর প্রদেশে এমন লোক ছিল না যে কৃষ্ণলাল ভূঞার নাম না জানিত। এতদূর পর্য্যন্ত জনরব আছে, যে কৃষ্ণলালের দোহাই চলিত। পক্ষান্তরে অনেকে তাহাকে অত্যাচাব এবং দৌরাত্ম্যের জন্য নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে প্রজাপীড়ন এবং নিকটবর্ত্তী তালুকদারের প্রতি অত্যাচার করা নীলকরের গোমস্তাদিগেব স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য কারণ তাহা না করিলে নীলকুঠীর উপকার হয় না। প্রজাবঞ্জন এবং নীলকরের হিত এই দুই কার্য্যের পরস্পর ভাব যেমন চিড়া কাঁচাকলাব ভাব, উভয় কখনও বিমিশ্রিত হয় না। যাহা হউক ভূঞাজির প্রভুভক্তি অতি প্রবল ছিল। কিসে ওয়াটসন কোম্পানীর লভ্য হইবে, ক্ষতি হইবে না —ইহাই তাহার অন্তরে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। একবার যশোহর জেলার অন্তর্গত এক কুঠীর গোমস্তার প্রতি ওয়াটসন কোম্পানীর প্রাপ্য কয়েক হাজার টাকা ঐ জেলার কলেক্টরী হইতে বাহির করিয়া লওয়ার আদেশ হয় এবং গোমস্তাও কলেক্টরী হইতে ঐ টাকা পাওয়ার সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু টাকা আনিবার নিমিত্ত শিকারপুর হইতে লোক প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে সংবাদ আসিল, যে দৈব অগ্নি লাগিয়া সেই কুঠী জ্বলিয়া গিয়াছে এবং টাকাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মেনেজর সাহেবের তৎসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ কিম্বা কোন চিন্তা হইল না, কারণ ওয়াটসন কোম্পানীর একদিকে কয়েক হাজার টাকার ক্ষতি হইলে বড় আসে যায় না, কিন্তু বাঙ্গালী কৃষ্ণলালের মনে অমনি অবিশ্বাস জন্মিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একটি ঘোড়ায় চড়িয়া কৃষ্ণলাল যশোহর যাত্রা করিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে এইরূপ ভ্রমণ করা নীলকুঠীর গোমস্তার পক্ষে বড় কঠিন কিম্বা কষ্টকর কাজ ছিল না। শিকারপুর হইতে

যশোহরে পত্র পৌঁছিতে পারে, এমন সময়ের পূর্ব্বে ভূঞা স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে সেই কুঠীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে গৃহদাহ মিথ্যা। গোমস্তাও তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইল, কারণ সে কখনও ভাবে নাই যে শিকারপুর হইতে কেহ এত শীঘ্র সেই স্থানে আসিবে। সে ভাবিয়াছিল, যে আর দুই এক দিবসের মধ্যে টাকাগুলি স্থানান্তর করিয়া কাছারীঘরে আগুন দিয়া নিজেই শিকারপুর যাইয়া একরূপ বন্দোবস্ত করিবে। কিন্তু কৃষ্ণলালের উদ্যোগে তাহার সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। কৃষ্ণলাল সমস্ত টাকাগুলি তাহার নিকট বুঝিয়া লইল এবং তাহা শিকারপুর প্রেরণের উচিত বন্দোবস্ত করিয়া মেনেজর সাহেবের নিকট প্রত্যাগমন করিল। কৃষ্ণলাল যশোহর গিয়াছিল শুনিয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা কবাতে কৃষ্ণলাল বলিল, যে যথার্থ ঘর পুড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু টাকার লোকসান হয় নাই। সেই গোমস্তাটি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকে বাঁচাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণলাল তাঁহার প্রভুর নিকট এইরূপ চাতুরী খেলিয়াছিলেন। প্রভুব স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত যে ভৃত্যের এইরূপ যত্ন, তাহার যশ এবং শ্রীবৃদ্ধি কেন না হইবে?

কৃষ্ণলাল ভূঞার বিলক্ষণ দানশক্তি ছিল, এবং ব্রাহ্মণকে বিশেষ বৈষ্ণবকে তিনি গাঢ় ভক্তি করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে এবং শিকার-পুরের বাসাতে অতিথি সেবা করিতেন। কৃষ্ণলালের নিকট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিলে, কেহ রুক্ষহস্তে ফিরিয়া যাইতেন না। তজ্জন্য অনেক দূর হইতেও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট যাচঞা কারতে আসিতেন।

কৃষ্ণলালের দানশীলতার কথা শুনিয়া এক দিবস একজন উদার ব্রাহ্মণ কিছু পাইবার আশায় শিকারপুরে তাঁহার নিকট প্রাতঃকালে উপস্থিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণলাল তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল এক ঠেঙ্গা-মারা প্রণাম করা ভিন্ন অন্য কোনওরূপ সমাদর কিম্বা সম্ভাষণ করিলেন না। ব্রাহ্মণ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। সে

শুনিয়াছিল, যে ভূঞাজি ব্রাহ্মণ সজ্জনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন কিন্তু তাহার প্রতি এইরূপ বিমুখ হওয়ায় কারণ কিছু বুঝিতে পারিল না। অবশেষে ব্রাহ্মণ স্নানের সময় ঐ স্থানের আর একটি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, যে কৃষ্ণলাল অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত, সেইজন্য তিনি যে ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের গলায় মালা না দেখেন, তাহাকে সমাদর করেন না। উলার বিটল ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া মনে মনে কৃষ্ণলালকে বঞ্চনা করার নিমিত্ত সুন্দর একটি কৌশল সৃষ্টি করিল। স্নান করিয়া আসিয়া কৃষ্ণলালের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভেউ ভেউ করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণলাল শশব্যস্তে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ অতি কাতরভাবে বলিল যে "ভূঞাজি তোমাকে আমার দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব ? আমি হরিনামের মালা জপ এবং ধারণ না করিয়া জলগ্রহণ করি না। অদ্য আমার কপাল পুড়িয়াছে, পথে মালাছড়াটা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। আমি কি প্রকারে হরিনামের মালা না জপিয়া দিনপাত করিব, তাই ভাবিয়া রোদন করিতেছি।" ব্রাহ্মণের এই গাঢ় কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া কৃষ্ণলালের অশ্রুপতন হইতে লাগিল এবং শীঘ্র তাহাকে একছড়া তুলসীর মালা দিয়া প্রচুররূপে আহার করাইয়া ব্রাহ্মণের আশার অতিরিক্ত দান করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। ভণ্ড ব্রাহ্মণ টাকাগুলি হস্তগত করিয়া কৃষ্ণলালের বাসাবাড়ী হইতে কিছু দূরে আসিয়া গলা হইতে মালাছড়াটা টানিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বলিল যে "পেটের দায়ে কি না করিতে হয় ? অদ্য গলায় মালাও পরিতে হইয়াছিল।" কৃষ্ণলাল এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে "বামনটা কি পাষণ্ড।"

কৃষ্ণলাল ভূঞার যেরূপ গুণকীর্ত্তন করিলাম, নীলকুঠীর এই জাতীয় অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের সেইরূপ গুণানুবাদ করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইতাম, কিন্তু তাহাদের দোষে দেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল এবং সাধারণের নিকট তাহাদের দুর্নাম ভিন্ন যশ হয় নাই,

এবং সেইজন্য ভদ্রমণ্ডলীতে এই জাতীয় ব্যক্তিরা "কেওট" নামে অভিহিত ছিল।

কৈবর্ত্ত মহাশয়েরা যে কেবল নীলকরের চাকর হইয়া প্রভুব স্বার্থ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত প্রজা এবং নিকটবর্ত্তী তালুকদারের উপরে অত্যাচার করিতেন বলিয়া জনসমাজে নিন্দিত ছিলেন এমন নহে, তাঁহাদের আরও অনেক প্রকার দোষ ছিল এবং অনেক সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর বলে অনেক দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। এই সকল ব্যক্তিরা সাধারণতঃ যে চরিত্রেব মনুষ্য এবং যে নিমিত্ত তাহারা ভদ্র-মণ্ডলীতে ঘৃণিত ছিল, একটি দৃষ্টান্ত দেখাইলেই তাহার অনেকটা বুঝা যাইবে। এই দৃষ্টান্তে আরও একটি কথা প্রকাশ পাইবে। তাহা এই যে, শেষাবস্থায় নীলকর সাহেবদিগের প্রতাপ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে রাজপুরুষেরাও তাঁহাদের আশঙ্কা না কবিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না।

একদিবস কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট এলিয়ট সাহেব ডাকাতি নিবারণের কমিসনর ওয়ার্ড সাহেবকে লইয়া একখানি বগিগাড়ীতে কৃষ্ণনগরের কোতওয়ালী থানাতে আসিয়া আমাকে ঐ গাড়ীর উপর তুলিয়া লইলেন এবং ঐ সহরের কোম্পানীর বাগান নামক এক জনশূন্য স্থানে উপস্থিত হইয়া অবতরণ করিলেন এবং গাড়ী সহিসের নিকট রাখিয়া বাগানের প্রান্তভাগে এক নির্জ্জন স্থান দেখিয়া তথায় গমন করিলেন। সাহেবদ্বয়ের এইরূপ সাবধানের কার্য্য দেখিয়া আমার মনে মনে কিঞ্চিৎ আশঙ্কা হইল এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবও আমাকে বলিলেন যে "আমরা তোমাকে এই গোপন স্থানে খুন করিতে আনিয়াছি, তুমি তোমার ঈশ্বরের নাম লও।" ওয়ার্ড সাহেব এলিয়ট সাহেবের এই কথা শুনিয়া পাছে আমি সত্য সত্যই ভয় পাই এই আশঙ্কায় আমাকে তৎক্ষণাৎ আশ্বাস দিয়া বলিলেন "না দারোগা, এলিয়ট কৌতুক করিতেছেন, আমি তোমাকে একটি অতি গোপনীয় কথা বলিব বলিয়া এই নির্জ্জন স্থানে আনিয়াছি তুমি

আমার সঙ্গে আইস।" বলিয়া একটা বৃহৎ শিমুল বৃক্ষের মূলের উপরে উপবিষ্ট হইয়া আমাকেও তাঁহার পার্শ্বে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রহরী স্বরূপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কমিসনর। দারোগা তুমি মহতপুরের বৈকুণ্ঠনাথ মজুমদারকে জান ?

দারোগা। আমি তাহার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু কখনও দেখি নাই।

কমিসনর। সে কেমন লোক বলিয়া তুমি জান ?

দারোগা। শুনিয়াছি নীলকর পেট্রিক স্মিথ সাহেবের দেওয়ান এবং বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী।

কমিসনর। তাহার কখনও চুরি ডাকাতির অপবাদ শুনিয়াছ ?

দারোগা। না সাহেব ! কিন্তু নীলকর সাহেবের স্বার্থের জন্য প্রজার পীড়ন করে বলিয়া শুনিয়াছি।

কমিসনর। আমি হুকুম দিলে তুমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সাহস কর ?

দারোগা। আমার এই কার্য্য, কেন পারিব না ?

কমিসনর। তুমি কাঁচা লোকের ন্যায় কথা কহিতেছ। বৈকুণ্ঠ যে কত বড় দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি তাহা তুমি জান না বলিয়া এইরূপ সাহস করিতেছ। বিশেষ সে তোমার থানার এলাকায় বাস করে না, ভিন্ন এলাকায় বাস করে।

দারোগা। আমি বহু লোক সঙ্গে লইয়া গেলেও কি ধরিতে পারিব না ?

কমিসনর। না পারিবে না। কারণ ঐ অঞ্চল সমুদয়ই নীলকর সাহেবের অধিকার ; তাহাতে কেহই বৈকুণ্ঠের বিরুদ্ধে তোমার সহায়তা করিবে না। বিশেষ একবার যদি বৈকুণ্ঠ জানিতে পারে যে তাহার গ্রেপ্তারির জন্য আমি চেষ্টা করিতেছি, তাহা হইলে এ

জন্মে তাহাকে ধরা কঠিন হইবে। সেইজন্য আমি তোমাকে এই নির্জ্জন স্থানে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। বৈকুণ্ঠকে ধরিবার কোন উপায় করার নিমিত্ত আমি কৃষ্ণনগর আসিয়াছি। এলিয়ট সাহেব বলেন যে তুমি অনেক কৌশল জান, মনে করিলে নির্ঝঞ্ঝাটে তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিবে; পারিলে আমি তোমার উপরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব।

ডাকাতি নিবারণের কমিসনর সাহেবের কথা শুনিয়া আমাব মনে একটা কথার উদয় হইল; সাহেবকে বলিলাম যে "যদি আপনি আমাকে তাড়াতাড়ি না করেন তাহা হইলে আমি তাহাকে ধরিয়া দিব।"

সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার জেবের মধ্য হইতে একখানা ইংরাজি পরওয়ানা বাহির করিয়া আমার হস্তে দিয়া কহিলেন "তুমি যতকাল ইচ্ছা লও, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমি যেন তাহাকে শেষে পাইতে পারি। তাহাকে পাইলে আমার অনেক উপকার হইবে।"

দারোগা। বৈকুণ্ঠ এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, যে আপনি তাহাকে ধরিতে এত ব্যগ্র হইয়াছেন।

কমিসনর। বৈকুণ্ঠ একজন প্রধান ডাকাত, এই কথা বোধ হয় তুমি নূতন শুনিলে, কিন্তু আমি উপর্য্যুপরি প্রমাণ পাইয়াছি যে, সে ডাকাতের সর্দ্দার; তাহার পাল্লায় অনেক লোক আছে, তাহাদের দ্বারা সে ডাকাতি করে, এবং ডাকাতি করিয়া, সে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে।

দারোগা। নীলকর সাহেব কি তাহার এই চরিত্রের কথা জানেন?

কমিসনর। জানেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারিব না। কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে কুঠীর লোকের দ্বারাই বৈকুণ্ঠ ডাকাতি করে। কিন্তু ইহাও আমি অবগত আছি যে, কুঠীর সাহেব

বৈকুণ্ঠকে খুব বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন এবং কুঠীর ও কুঠী সংক্রান্ত সমস্ত জমিদারীর তত্ত্বাবধানের ভার বৈকুণ্ঠব হস্তে অর্পিত আছে।

কতক্ষণ পরে সাহেবেরা আমাকে থানায় পৌঁছাইয়া দিলেন। তাহার পরে আমি অনুসন্ধানে জানিলাম যে বৈকুণ্ঠ খুব ধনাঢ্য ব্যক্তি, জমি-জমা গোলাবাড়ী ও নগদ টাকার কারবার আছে। কৃষ্ণনগরে হরিনাথ কুমারের বেড় নামক পল্লীতে তাহাব একটি সুন্দর বাসাবাড়ীও ছিল। সাধারণের নিকট সে একজন ভদ্র ও বিশিষ্ট লোক বলিয়া পরিচিত। এবং অতি অল্প লোকেই তাহার দস্যু-বৃত্তির কথা জ৷নিত। কেবল ইতর লোকে অর্থাৎ যাহারা ঐ কর্ম্মেব কর্ম্মী এবং তাহার অধীনে নিজে কিম্বা যাহাদের বন্ধুবান্ধবেরা ঐ সকল দুষ্কার্য্যের সঙ্গী ছিল, তাহারাই, বৈকুণ্ঠের দোষেব সংবাদ জানিত। আমার সংসারে একজন গোয়ালা চাকর ছিল, সে বৈকুণ্ঠের প্রতিবাসী এবং পূর্ব্বে তাহাব চাকরিও করিত। এই ব্যক্তির নিকট আমি বৈকুণ্ঠের অনেক কাহিনী শুনিলাম; তন্মধ্যে একটি আমি বিবৃত করিব। বৈকুণ্ঠের বাড়ী খড়িয়া নদীর নিকট। একবার উত্তর অঞ্চলের একখানা চাউল বোঝাই নৌকার ব্যাপারীর নিকট বৈকুণ্ঠ ৭০০ টাকার চাউল কিনিয়া তাহাকে এমন সময় নগদ টাকা বুঝাইয়া দিল, যে ব্যাপারী সেই দিবস নৌকা খুলিয়া কিছুতেই কৃষ্ণনগরের কুতঘাটে আসিয়া পৌঁছিতে পারে না। কাজেই পথের মধ্যে এক স্থানে নৌকা লাগাইয়াছিল। রাত্রিকালে বৈকুণ্ঠ তথায় অধীনস্থ কয়েক ব্যক্তি ডাকাতকে পাঠাইয়া ব্যাপারীর নৌকা হইতে ঐ টাকা এবং আরও যে কিছু টাকা পাইল, লুঠিয়া লইয়া গেল। আমি যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, ততই বৈকুণ্ঠের দোষ জানিতে পারিলাম।

এইরূপে ৪।৫ মাস গত হইল, কিন্তু আমার প্রত্যাশিত সুযোগ উপস্থিত হইল না। ওয়ার্ড সাহেবও হুগলী হইতে আমাকে

লিখিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে আরও কিছুকালের নিমিত্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলাম।

কৃষ্ণনগরের কোতওয়ালী থানার হাতার উত্তর পার্শ্বে একটি ছোট পুষ্করিণী আছে, তাহাতে পল্লীস্থ অনেক স্ত্রীপুরুষে স্নান করিত। এক দিবস স্নানের সময় এই পুষ্করিণীর ঘাটে বামা নাম্নী একটি একটি বারাঙ্গনাকে দেখিতে পাইয়া, আমার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিলাম। সেই সুযোগ এই যে, বামা বৈকুণ্ঠের উপপত্নী এবং বৈকুণ্ঠ বামাকে লইয়া গিয়া তাহার নিজ বাড়ীতে রাখিয়াছে। বৈকুণ্ঠ যখন যে স্থানে যায়, বামাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। কৃষ্ণনগর আসিলে, বামা তাহার সঙ্গে আসিয়া থানাব নিকটে তাহার বৃদ্ধা পিতামহীকে দেখিতে আসে। অদ্য বামাকে ঘাটে দেখিয়া নিঃসন্দেহ বিবেচনা করিলাম, যে সর্পের লাঙ্গুল যেখানে, সর্পও সেই স্থানে অবশ্য আছে। আমি বৈকুণ্ঠ বামা ঘটিত সম্বন্ধ অবগত থাকাতেই, ডাকাতি নিবারণের কমিসনর সাহেবকে সাহস করিয়া বলিয়াছিলাম, যে নিঝঁঞ্ঝাটে আমি তাহাকে কিছুকাল বিলম্বে গ্রেপ্তার করিয়া দিতে পারিব।

আমি কয়েকজন বরকন্দাজ সঙ্গে করিয়া বৈকুণ্ঠের বাসার নিকট গিয়া দেখিলাম, যে সে অশ্বারোহণে খড়িয়া নদী হইতে স্নান করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিতেছে। সে ঘোড়া হইতে উত্তরণ করত বাসাবাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্রই আমি তাহাকে ডাকাতি নিবাবণের কমিসনরের পরওয়ানা দেখাইয়া গ্রেপ্তার করিলাম এবং তাহার বাসার লোকে জ্ঞাত হওয়ার পূর্ব্বেই আমি তাহাকে থানায় লইয়া আসিলাম। এদিকে এলিয়ট সাহেবকে এই সংবাদ দেওয়া মাত্রই তিনি জেলখানা হইতে ২৫জন ও আমার থানা হইতে ১৫জন বরকন্দাজের ও দুইজন জমাদারের হেফাজতে বৈকুণ্ঠকে অবিলম্বে শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দিতে লিখিলেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠকে যে স্থানে প্রেরণ করা

হইল, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে তিনি আমাকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। বৈকুণ্ঠকে চালান করার কিয়ৎকাল পরেই নীলকর পেট্রিক স্মিথ সাহেব থানায় আসিয়া বৈকুণ্ঠের তত্ত্ব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, যে আমি তাহাকে অন্যায় করিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছি এবং তিনি তাহার জন্য প্রচুর পরিমাণে জামিন দিতে প্রস্তুত আছেন। বৈকুণ্ঠ জেলখানায় আছে বলিয়া আমি সাহেবকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিয়া দিলাম। সাহেব শশব্যস্তে জেলখানায় গেলেন, পুনরায় আমার নিকট আসিলেন এবং অবশেষে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে শুনিলাম, যে ১০।১২ জন লোক দৌড়িয়া যাইয়া দিগ্‌নগর গ্রামের নিকট শান্তিপুরের রাস্তার উপরে বৈকুণ্ঠকে ছিনাইয়া লওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বরকন্দাজেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কিছু কাল হুগলীতে ডাকাতি নিবারণের কমিশনরের গারদে থাকার পর, আলিপুরের সেসন জজের আদালতে বৈকুণ্ঠের বিচার হয়। তাহাতে বৈকুণ্ঠ একজন বারিষ্টার সাহেব আনাইয়া খালাসের চেষ্টা করে, কিন্তু চরমে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাজ্ঞা হয়।

নীলকরের গোমস্তাদিগের মধ্যে এমন আর কত বৈকুণ্ঠ মজুমদার ছিল, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু সে যাহা হউক, সকলের উপরে নীলকরের ভয়ে আমাদের রাজপুরুষেরাও যে সশঙ্কিত থাকিতেন, ইহাই তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইতর লোকের বিশ্বাসেও নীলকর সাহেবদিগের প্রতাপ যে কেমন অখণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত ছিল, তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তেই প্রকাশ পাইবে। আমি ১৮৬৫ সালে ঢাকা হইতে মাণিকগঞ্জের পথে নৌকাযোগে কুষ্টিয়া যাইতেছিলাম। সাবাড়ের পশ্চিমে এক স্থানে, ধলেশ্বরী নদীর উত্তর ধারে কয়েকটা বৃহৎ কুম্ভীর শুইয়া রহিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ ধারে এক ঘাটে বহুলোক অনায়াসে স্নান

করিতেছে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একটি পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে পরপারে কুম্ভীর দেখিয়াও তাহারা কিরূপে নিঃশঙ্কচিত্তে স্নান করিতেছে? তাহাতে সে উত্তর করিল, "ইহা নীলকর ওয়াইজ সাহেবের মাটী, কুমীর বেটারা তাঁহাকে ভয় করে।"

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হালিডে সাহেবের আমলেই নীলকরদিগের গৌরব চরমসীমায় উঠিয়াছিল। তিনি নিশ্চিন্তপুর কনসারণের মেনেজর ফরলং সাহেবের ন্যায় দুই-তিনজন প্রধান নীলকর সাহেব-কে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করিয়া সম্মানিত করেন। আমাদের দেশীয় জমিদারের মধ্যে কেহ গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজা উপাধি পাইলে, যেমন তাঁহার পরিবারস্থ সকল ব্যক্তিই নিজে নিজে কেহ রাজা, কেহ কুমার, কেহ রাণী ইত্যাদি উপাধি ধারণ করেন এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব কিম্বা অধীনস্থ লোকে ঐরূপে তাঁহাদের সম্ভাষণ না করিলে অসন্তুষ্ট হন, সেইরূপ নীলকরের মধ্যে দুই-তিন-জন নীলকর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছে দেখিয়া সকল নীলকর সাহেবই নিজে নিজে মাজিষ্ট্রেট হইয়া কুঠীতে কাছারি খুলিতে লাগিলেন। কুঠীর এক কামরায় প্রকাশ্যরূপে নীলকরের এই সকল আজখোদ কাছারি হইত। গবর্ণমেণ্টের আদালত ফৌজদারী কাছারির ন্যায় ইহাতেও সাজসজ্জা থাকিত। ফরিয়াদী, আসামী, সাক্ষী, আমলা, হাকিম ও দর্শকের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ কাছারি বসিত এবং ভাঙ্গিত। কুঠীর সাহেব —বিচারক; কুঠীর দেওয়ান গোমস্তা—আদালতের সেরেস্তাদার, পেস্কার প্রভৃতির ন্যায় আমলা; আর প্রত্যেক মোকদ্দমায় পৃথক্ নথী লিখিত পঠিত হইত। দোষী ব্যক্তিকে কেবল অর্থদণ্ড করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত এমন নহে, শারীরিক শাস্তি দেওয়ার প্রথা ছিল। এই সকল কাছারির আনুষঙ্গিক, কুঠীতে গারদ এবং জেলখানা ছিল এবং তাহাতে নীলকরের হুকুমমতে দণ্ডিত ব্যক্তি-দিগকে কয়েদে থাকিতে হইত। দরিদ্র প্রজা—যাহার নিকট

আদায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না, তাহাদের প্রতি শারীরিক শাস্তির হুকুম হইত। গবর্ণমেণ্টের আদালতে বেত্রাঘাত দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়, কিন্তু নীলকরের আদালতে এই শাস্তির জন্য নূতন যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং কোনও কুঠীতে শ্যামচাঁদ ও কোনও কুঠীতে রামচাঁদ ইত্যাদি নামে এই যন্ত্রের উল্লেখ করা হইত। বিচারক হুকুম দেওয়ার সময় এইরূপ উক্তি করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতেন, "অমুক আসামী তাহার অপবাধের জন্য দশ কি বিশ ঘা শ্যামচাঁদ কি রামচাঁদ খায়।" এই অস্ত্রটির গঠন সকল কুঠীতে এক রকম ছিল না। কুঠী বিশেষ এবং নীলকর কিম্বা দেওয়ানজির দয়ার তারতম্য অনুসারে তাহা ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিত। কোনও স্থানে একটি লাঠির অগ্রভাগে এক হাত দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ হাত প্রস্থ খুব শক্ত এবং মোটা চর্ম্মের একখানা হাতা এবং কোন স্থানে হাতার পরিবর্ত্তে অগ্রভাগে গ্রন্থিযুক্ত কয়েক ছড়া চর্ম্মের রজ্জু বান্ধা থাকিত। ইহার এক আঘাতে গবর্ণমেণ্টের আদালতের বেতের বহু আঘাতের ফল হইত। দশ ঘা বেত খাইলে মনুষ্যের যে কষ্ট না হইত, শ্যামচাঁদ রামচাঁদের এক ঘায়ে তাহার অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। শ্যামচাঁদ নামক এইরূপ এক অস্ত্র ইণ্ডিগো কমিশন সাহেবদিগের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্টের কারাগারে কয়েদীরা যেমন করিয়া হউক, প্রত্যহ দুই বেলা পেট ভরিয়া আহার করিতে পায়। কিন্তু কুঠীর গারদে সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ ছিল। দেওয়ানজির এবং তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের দয়ার এবং তত্বাবধারণের উপর কয়েদীদিগের আহার নির্ভর করিত; তাহাতে হতভাগাদিগের যত সুচারু আহার ঘটিত, তাহা সকলে বুঝিতে পারেন। কয়েদীদিগের কপালে আর এক কষ্ট ছিল। নীলকরেরা কোনও ব্যক্তিকে কয়েদ করিলে তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা তাহাকে মুক্ত করার জন্য পুলিশে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিত। পাছে পুলিশ আমলারা কয়েদী ব্যক্তিকে ধরিতে

পায়, সেই জন্য তাহাকে এক কুঠী হইতে অন্য কুঠীতে চালান করা হইত এবং অনেক সময়, দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তনে বিশেষ রাত্রিকালে কুঠীর প্রহরীদিগের সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইত বলিয়া তাহার আহার করা দূরে থাকুক, কিছুকাল একস্থানে বসিয়া বিশ্রাম করারও অবকাশ হইত না। কুঠী-কুঠী চালান করার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত হইব।

আমি কোন এক বিশেষ কার্য্যে হার্দ্দি থানায় প্রেরিত হইয়াছিলাম। হার্দ্দির এলাকার মধ্য দিয়া পাঙ্গাসিয়া নদী বহমান এবং সেই নদী দিয়া মোরঙ্গ হইতে শালকাষ্ঠের মাড় লইয়া অনেক ব্যাপারী কলিকাতাভিমুখে যাইত। পাঙ্গাসিয়া নদীর নিকটে বামনদী কুঠী স্থাপিত ছিল এবং তাহার মেনেজর ট্রিপ সাহেবের শালকাষ্ঠের প্রয়োজন হওয়াতে একটা মাড় আটক করিয়া সুলভ মূল্যে তাহা লইতে চেষ্টা করেন। ব্যাপারীর গোমাস্তা তাহাতে অসম্মত হওয়াতে ট্রিপ সাহেব বলপূর্ব্বক কাষ্ঠ সমস্ত তীরে উঠাইয়া ব্যাপারীর ঐ গোমস্তাকে কয়েদ করেন। তাহার সঙ্গী লোকেরা কৃষ্ণনগর যাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট কয়েদ খালাসীর দরখাস্ত করে। বামনদী হইতে কৃষ্ণনগর প্রায় ত্রিশ ক্রোশ ব্যবধান। সেই সময় একজন আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট, তাঁহার নাম আমার এক্ষণে স্মরণ নাই, শিকারপুর অঞ্চলে মোতায়েন ছিলেন। বড় মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত আসিষ্টাণ্ট সাহেবকে এবং হার্দ্দিতে আমাকে, বিশেষ অনুসন্ধানের দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে নীলকরের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরওয়ানা পাইয়া আমি বামনদী যাইয়া ট্রিপ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করাতে, সাহেব এবং তাহার দেওয়ান কুঠীর সমস্ত বাড়ী, ঘর, কামরা, গুদাম, জাতঘর প্রভৃতিতে লইয়া গিয়া দেখাইলেন যে তাহার কোনও স্থানে কোনও ব্যক্তি কয়েদ নাই। ঐ ব্যক্তিকে ইত্যগ্রেই স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, সুতরাং সাহেব এবং তাঁহার কর্ম্মচারী নিঃশঙ্ক চিত্তে কুঠীর এলাকার সমস্ত

স্থান আমাকে দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি থানায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সঠিক সংবাদ পাইলাম যে ট্রিপ সাহেব ঐ হতভাগাকে বামনদী হইতে অনেক দূর পূর্ব্বদিকে কুষ্টিয়ার নিকট পলতা কি সিমলা—আমার ঠিক স্মরণ নাই—নামক একটি ছোট কুঠীতে অনেক প্রহরী দিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে, এবং দুই চারি দিবসের মধ্যে পদ্মাপার করিয়া রাজসাহী জেলায় লইয়া যাইবে। আমি তৎক্ষণাৎ দিন এবং সময় নির্ব্বাচন করিয়া সেই স্থানে যাইতে এবং আমিও সেই স্থানে ঐ সময় উপস্থিত হইব বলিয়া—আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে শিকারপুরে লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহার পরদিবস বৈকালে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের প্রধান আমলা প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় থানায় পৌঁছিয়া আমাকে জানাইলেন যে সেই রাত্রেই সাহেব সেই কুঠীতে যাইবেন এবং আমাকে তথায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। সাহেব এবং বাঙ্গালীতে কত প্রভেদ, তাহা এই স্থানেই প্রকাশ পাইবে। আমরা দুইজন পালকিতে পরিচিত লোক সমভিব্যাহারে সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিয়াও নিরূপিত স্থানে পৌঁছিতে পারিলাম না। সেই কুঠীর দুই তিন ক্রোশ ব্যবধান সদরপুর গ্রামে আমাদের প্রভাত হইল। এমন সময় দেখিলাম যে স্বয়ং আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট অশ্বপৃষ্ঠে, পশ্চাতে পশ্চাতে একটি মলিন বস্ত্রধারী পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া সেই সদরপুর বাজারে আমাদের নিকট পৌঁছিলেন এবং আমাদের দেখিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, "দেখ, আমি সেই ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছি।" তাঁহার নিকট শুনিলাম যে তিনি করিমপুর হইতে একাকী অশ্বপৃষ্ঠে বাহির হইয়া পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, পলতার কুঠীতে পৌঁছিয়া প্রহরীদিগের নিকট তিনি ছোট সাহেব বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে তাহারা কুঠীর ছোট সাহেব মনে করিয়া কুঠী খুলিয়া দেয় এবং কয়েদী ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করে। কিঞ্চিৎ রাত্রি থাকিতে তিনি উহাকে অন্য কুঠীতে লইয়া যাইবেন

বলিয়া সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। আসিষ্টাণ্ট সাহেবের বিশ্বাস, যে কুঠীর লোকেরা তাঁহাকে মাজিষ্ট্রেট বলিয়া বুঝিতে পারিলে, তিনি এত সহজে কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিতেন না। এই মোকদ্দমায় অবশেষে ট্রিপ সাহেবের শাস্তি—কিছু অর্থদণ্ড মাত্র হইয়াছিল। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে ঐরূপ তৎপরতায় এবং কৌশলের সহিত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে না পারিলে, তাহাকে আরও অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইত এবং কে বলিতে পারে যে, সে পুনরায় প্রাণ লইয়া তাহার বাড়ী প্রত্যাগমন কবিতে পারিত?

এইরূপে কত শত লোক কুঠী-কুঠী চালান হইয়া শেষে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। শেষ নিরুদ্দেশের দৃষ্টান্ত হাঁস-খালির গোবিন্দপুরের গোপাল তরফদার। সেই ব্যক্তি তাহার গ্রামের প্রজাবর্গের সাহায্যে কুঠীর বিরুদ্ধাচরণ করাতে, একদিবস রাত্রে একটি হস্তী সমেত কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক গোবিন্দপুর গ্রাম আক্রমণ করিয়া দীন দরিদ্র চাষী প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুঠপাট এবং অপচয় করে এবং অবশেষে গোপাল তরফদারকে যৎপরোনাস্তি বে-ইজ্জৎ করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। যিনি পরে হাইকোর্টের জজ হন, সেই আর এস টটেনহাম সাহেব তখন কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি আমাদিগকে লইয়া গোপালের অনুসন্ধান করিতে ক্রটি করেন নাই; কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে শুনিলাম, যে ধরিবার সময় গোপাল তরফদারকে আঘাত করিয়া ধরা হইয়াছিল এবং সেই অবস্থায় তাহাকে নানা স্থানে চালান করাতে, সেই ক্লেশে তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহার মৃতদেহ তাহার বন্ধুবান্ধবের হস্তে পড়িতে না পারে, সেই জন্য তাহা নীলের গিঠির দ্বারা জ্বালাইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলা হয়।

কিন্তু গোপাল তরফদারের মৃত্যুই নীলকরের কাল হইল। এ দিকেও বোধ হয় তাহাদের পাপের চারি পোয়া পূর্ণ হইয়া:

আসিয়াছিল। গোপাল মরিয়া যেন কৃষ্ণনগর এবং যশোহর জেলার সমুদয় প্রজাকে খেপাইয়া তুলিল। নীলকরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব দাবানলের ন্যায় হুহু করিয়া সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া জ্বলিয়া উঠিল। "মোবা আর নীল করবো না" বলিয়া প্রজারা যে সুর ধরিল, তাহা আর কেহ নিরস্ত করিতে পারিল না। ধন্য প্রজার প্রতিজ্ঞা। নীলকর সাহেবদিগের এত দর্প, ক্ষমতা, এত ধন,—সকলই প্রজার প্রতিজ্ঞার সম্মুখে জলের মধ্যে মৃণ্ময় প্রতিমার ন্যায় গলিয়া গেল। যে সাহেবদিগের ইঙ্গিতে শত সহস্র লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা আসিয়া একত্রিত হইত, তাঁহারাই প্রজাদিগের ভয়ে কম্পিত হইয়া, স্বীয় স্বীয় প্রাণরক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে কৃষ্ণনগর ও যশোহর জেলার স্থানে স্থানে অশ্বারোহী সেনা আনিয়া স্থাপিত করিতে প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টও নীলকরের সাহায্যার্থ এই সময় এক বিশেষ আইন প্রকটন করিলেন যে,—যে সকল প্রজারা নীল করিতে চুক্তি-বদ্ধ হইয়াছে, তাহারা নীল না করিলে কারারুদ্ধ হইবে। কিন্তু তাহাতেও প্রজারা ভয় পাইল না। বলিহারী প্রজাদিগের একতা এবং সাহস। তাহারা একস্বরে বলিল যে জেলখানায় যাওয়া তুচ্ছ কথা, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ফাঁসি দিতে চাহিলেও তাহারা গলা বাড়াইয়া দিবে, "তবু মোরা নীল করবো না।" বাস্তবিক তাহারা দলে দলে জেলখানায় যাইতে লাগিল। এই কার্য্যে কৃষীবর্গের এমন উৎসাহ হইয়াছিল যে, যে তাহা দেখিয়াছে, সে আর এ জন্মে তাহা ভুলিতে পারিবে না। চাপরাশি বরকন্দাজেরা দামুরহুদা প্রভৃতি স্থান হইতে যখন প্রজাদিগকে জেলখানায় লইয়া যাইত, তখন পথের সকল গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা খাদ্যসামগ্রী হস্তে লইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইত এবং চাপরাশিদিগকে কোনও স্থানে কাকুতি মিনতি করিয়া এবং কোনও স্থানে ঘুস দিয়া বন্দী প্রজাদিগকে খাওয়াইত এবং ধন্যবাদের সহিত উৎসাহের বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে কতক দূর তাহাদিগের সঙ্গে যাইত। একদিকে যথার্থ

ধর্ম্মাবতার দেশের সেই সময়ের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর জন পিটার গ্রাণ্ট সাহেব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে প্রজা এবং নীলকরের মধ্যে তিনি অপক্ষপাতরূপে বিচার করিবেন, আর একদিকে সুপণ্ডিত দেশহিতৈষী দয়ার সাগর হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদপত্রে সপ্তাহে সপ্তাহে গরিব প্রজাদিগের দুঃখের কাহিনী প্রচার করিয়া দেশশুদ্ধ লোককে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলের উপরে স্বয়ং প্রজাদিগের সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য এবং প্রতিজ্ঞাই প্রবলশক্তি হইয়া উঠিল। ঐ ত্রিবিধ অস্ত্রে প্রজাদিগের চিরশত্রু সংহারিত হইল। সেই পর্য্যন্ত নীলের চাষ উঠিয়া গেল এবং সাহেবেরা জাল গুটাইয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে অট্টালিকা সকল ভূমিসাৎ করিয়া ইট কাঠ বিক্রয় হইয়া গেল এবং কুঠীর হাউজ প্রভৃতিতে শৃগাল-কুকুরের বাসস্থান ও জঙ্গল হইয়া পড়িল। সে ঐশ্বর্য্য এবং বিক্রম এখন কোথায়? সে রাবণও নাই, সেই লঙ্কাও নাই।

চোরের আবদার

বঙ্গদেশে অতি অল্প লোকেব নিকট ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্ববচন্দ্র ঘোষালেব নাম অপবিচিত আছে। নিজ কলিকাতায, হুগলী জেলাব অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমায়, এবং কৃষ্ণনগবেব শান্তিপুব অঞ্চলে—তাঁহাব নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। শিক্ষিত বাঙ্গালীব মধ্যে ঈশ্ববাবু একজন বিলক্ষণ বলবান পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহাব বুদ্ধি, বিদ্যা এবং কার্য্যদক্ষতাব জন্য সকলে তাঁহাকে প্রশংসা কবিত। পেনসন লইয়া চাকবী হইতে অবসব হওয়াব পবে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বায বাহাদুব উপাধি প্রদান কবিয়া সম্মানিত কবেন। শান্তিপুবেতেই তাঁহাব নাম বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ হয। এইস্থানে তিনি প্রথম মিউনিসিপাল আইন প্রচলিত কবিযা নগরে অনেক উন্নতিসাধন, সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন, এবং শান্তি সংস্থাপন করেন, এবং সেই কার্য্য করিতে গিযা তিনি অনেকেব কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন, এবং অধিবাসীবা তাঁহাব শত্রুতাও কবিয়াছিল। তিনি যে সর্ব্ব বিষয়ে ঐকান্তিক ঋষি-পুরুষ ছিলেন, এমন কথা আমি বলি না, কিন্তু তাঁহাব দোষ হইতে গুণেব ভাগ অধিক ছিল। এই সময়ে শান্তিপুবে আর একজন বিখ্যাত মনুষ্য ছিলেন—শান্তিপুরের জমিদাব বাবু উমেশচন্দ্র বায়; তাঁহাকে লোকে সাধাবণতঃ মতিবাবু বলিযা জানিত। বৈষয়িক বুদ্ধিতে মতিবাবুর তুল্য তখন বঙ্গদেশে অতি অল্প লোক ছিল। জগৎবিখ্যাত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই মতিবাবুকে তাঁহার অধীনে চাকরিতে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাব কূটবুদ্ধির প্রখবতা দৃষ্টে বলিয়াছিলেন যে "এই মতিব যোড়া মেলা ভার।" সকলেই অবগত আছেন যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের অন্যান্য গুণেব মধ্যে মনুষ্যের চরিত্র

নির্ব্বাচনের ক্ষমতা অধিক পরিমাণে ছিল, অতএব তিনিই যখন মতিবাবুর বুদ্ধির জটিলতার প্রশংসা করিয়াছিলেন তখন সে বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। মতিবাবু শান্তিপুরের কিয়দংশের জমিদার ছিলেন, কিন্তু কিয়দংশ হইলে কি হয়, তাঁহার এমনই বুদ্ধি কৌশল এবং প্রতাপ ছিল যে শান্তিপুরের বড় ছোট সকল অধিবাসীগণের উপরে তাঁহার ষোল আনা প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার অমতে কাহারও কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না এবং যাহাকে যে দণ্ড করিতেন কিম্বা শাস্তি দিতেন তাহা দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণের নতশির করিয়া মানিয়া লইতে হইত। মতিবাবুর দণ্ডের মধ্যে অর্থদণ্ডই অধিক পরিমাণে ছিল এবং তাহা না দিলে শান্তিপুরে তাহার বাস করা কঠিন হইত। ফলে শান্তিপুরে মতিবাবুর একাধিপত্য ছিল।

ঈশ্বরবাবু শান্তিপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হওয়ার পূর্ব্বে লো সাহেব নামক একজন গোরা শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলেন। এই সাহেব পরে কলিকাতার পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হইয়া খুব যশ লাভ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে বুঝি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতার পুলিশের মাজিষ্ট্রেটও হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক ইনি শান্তিপুরে আসিয়া মতিবাবুর কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালীর কূটবুদ্ধির সম্মুখে তিনি এমন পরাস্ত হইয়াছিলেন, যে অবশেষে নিজের চেষ্টায় তাঁহাকে শান্তিপুর হইতে বদলী হইতে হইয়াছিল। মতিবাবুর চরম উন্নতি সময়ে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল আসিয়া শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলেন। দুঃখের বিষয় এই যে দ্বারকানাথ ঠাকুর তখন জীবিত ছিলেন না, থাকিলে তিনি তাঁহার অতুল্য মতির যোড়া দেখিতে পাইতেন। ঈশ্বরবাবু দেখিলেন যে শান্তিপুরের মতিবাবু অদম্য এবং মতিবাবুকে দমন করিতে না পারিলেও শান্তিপুরের অধিবাসীগণের শান্তি হইবে না। তিনি আরও দেখিলেন যে কেবল

প্রচলিত আইন পরিচালনের দ্বারা মতিবাবুর প্রতাপের খর্ব্বতা করা দুঃসাধ্য, অতএব তিনি তৎকালের নূতন প্রকটিত মিউনিসিপাল আইন পরিচালনের দ্বারা মতিবাবুকে দমন করার কল্পনা করিলেন। কিন্তু সেই আইনও অধিবাসীগণের সম্মতি ব্যতিরেকে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না এবং মতিবাবুকে সম্মত করিতে না পারিলে অধিবাসীরা সম্মত হইবে না। অতএব ঈশ্বরবাবু মতিবাবুর সহিত এমন সৌহৃদ্যতা ও বন্ধুতা সংস্থাপন করিলেন এবং আইনের দ্বারা মতিবাবুর এত অধিক উপকার এবং লভ্য হওয়ার প্রলোভন দেখাইলেন, যে অল্প কালের মধ্যেই তিনি মতিবাবুকে ভুলাইয়া আইনটি শান্তিপুরে চালাইতে পারিলেন। স্বকার্য্যসাধন করার পরেই ঈশ্বরবাবু তাঁহার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং পদে পদে মতিবাবুকে অপদস্থ করিতে লাগিলেন। মতিবাবু তখন নিজের ভ্রম দেখিতে পাইয়া এই আইন শান্তিপুর হইতে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন এবং ঈশ্বরবাবুর বিরুদ্ধে তাঁহার নিন্দাসূচক অনেক দরখাস্ত দেওয়াইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমশঃ ঈশ্বরবাবু এমন বুদ্ধি-কৌশল পরিচালনা করিলেন যে শান্তিপুরে মতিবাবুর স্থলে ঈশ্বর-বাবুরই প্রভুত্ব প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার পরে আমি কিছুকালের নিমিত্ত হাঁসখালির থানায় ছিলাম, সেই স্থানে মতিবাবুর সহিত আমার একদিবস সাক্ষাৎ হয়, অন্যান্য কথার মধ্যে আমি তাঁহার শান্তিপুরের প্রভুত্বের কথা উল্লেখ করাতে তিনি কিঞ্চিৎ ম্লান বদনে আমাকে বলিলেন যে "দারোগাবাবু! আমাকে আর ওকথা বলিবেন না, আমি এখন শান্তিপুরের কুকুরটাকেও ছেই করি না।" মতিবাবুর নিজের মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে তিনি কতদূর অপদস্থ হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে মতিবাবু দীনদয়াল পরামাণিক নামক শান্তিপুরের একজন বিত্তশালী ব্যক্তির নামে কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে এক মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে বিখ্যাত বিচারপতি সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস তাঁহাকে

তিন বৎসরের জন্য কলিকাতার বড় ফাটকে প্রেরণ করেন এবং সেইখানে দণ্ডের কাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই মতিবাবু লোকান্তর গমন করেন। মতিবাবুর মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু ঈশ্বরবাবুব প্রতি মতিবাবুর দলের লোকের শত্রুতা গেল না। তাহারা পুনরায় কি এক কারণে ঈশ্বরবাবুর বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করাতে বঙ্গের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ঈশ্বরবাবুকে ছয় মাসেব নির্ব্বাসনের ন্যায় কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমায় থাকিতে আদেশ করিলেন এবং ঈশ্বরবাবু তদনুসারে শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরের গোয়াড়ীর বড় সড়কের পূর্ব্বধারে বাণাঘাটের পাল চৌধুরী বাবুদিগের দুইখানা দোতালা বাসাবাড়ী আছে। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনই তাহা খুব পুরাতন হইয়াছিল, এক্ষণে কি অবস্থায় আছে তাহা বলিতে পারি না। বাড়ী দুইখানা পাশাপাশি এবং প্রত্যেকের চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত হাতা এবং হাতা ইটের প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ইহার দক্ষিণদিকের বাড়ীতে ঈশ্বরবাবু বাসা করিলেন এবং উত্তরের বাড়ীতে সরভে বিভাগের ডেপুটী কলেক্টর বাবু অভয়চরণ মল্লিক বাস করিতেন। ঈশ্বরবাবুই আমাকে নবদ্বীপ থানার দারোগা পদে নিযুক্ত করেন এবং তদবধি আমাকে যেমন অনুগ্রহ করিতেন, তেমন আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন। কৃষ্ণনগর আসিলে পরে আমি তাঁহার নিকট প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে যাইয়া রাত্রি ৯।১০টা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতাম এবং মধ্যে মধ্যে উক্ত অভয়-বাবুও আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিতেন। এইরূপ দুই-তিন-মাসের পরে একদিবস প্রত্যূষে ঈশ্বরবাবুর খানসামা আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে "গত রাত্রে চোরে বাবুর শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া অনেক দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছে। বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন চলুন।" আমি যাইয়া দেখি যে ঈশ্বরবাবু এবং অভয়বাবু একত্র বসিয়া আছেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্রই অভয়বাবু আরক্ত লোচনে ইংরাজীতে আমাকে বলিলেন যে "আমি মাজিষ্ট্রেট

হইলে তোমাকে এইক্ষণে বরতরফ করিতাম। তোমাকে কি জন্য এত মোটা টাকা বেতন দেওয়া যাইতেছে, যদি তুমি চুরি ডাকাইতি নিবারণ করিতে না পারিবে।" কিন্তু ঈশ্বরবাবু তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন যে "দারোগা তুমি এই পাগলের কথায় ব্যাজার হইও না, ও এই সকল বিষয়ের কি জানে?" আমি অভয়বাবুর কথায় কোন উত্তর না দিয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হইলাম। এই স্থানে ঈশ্বরবাবুর শয়ন-কক্ষের দৃশ্যটা বর্ণনা না করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন না যে চোরে কি অসম সাহসীরূপে এই ঘরে চুরি করিয়া গিয়াছিল। ঘরের দুই কোণে দুইটি দুনলী বিলাতী বন্দুক; চারি প্রাচীরের গায় চারিখানা তরবার ও চারিটা ঢাল ঝুলিতেছিল। ঈশ্বরবাবু এক নেওয়ারের অর্থাৎ ফিতার খাটে শয়ন করিতেন, শিয়রে একটা সেই সময়ের নূতন আবিষ্কৃত রিবল্‌বার পিস্তল ও দুই পার্শ্বে দুইখানা ভুটিয়া ভোজালী, পদতলে একখানা বিলাতী হেঙ্গার তরবার। তদ্ভিন্ন ঘরের মধ্যে দুইটা মুদ্গর, একটা লেজাম ও কতকগুলি শূকর শিকারের বল্লমও ছিল। বন্দুক ও পিস্তল প্রত্যহ শয়ন করার পূর্ব্বে তৈয়ারও করিয়া রাখিতেন। ঘর দেখিয়া বাঙ্গালীর ঘর বলিয়া বোধ হইত না, কোন যোদ্ধার ঘর বোধ হইত। ঈশ্বরবাবু সখ করিয়া কেবল শোভার নিমিত্ত এই সকল অস্ত্র রাখিতেন এমন নহে, নিজে অস্ত্র চালাইবারও তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল এবং শিকার করিতে বড় ভালবাসিতেন। এই সকল অস্ত্র চতুষ্পার্শ্বে করিয়া এই বীরপুরুষ শুইয়াছিলেন, চোর আসিয়াছে বলিয়া জানিতে পারিলে চোরের যে কি অবস্থা হইত, তাহা অনায়াসেই অনুধাবন করা যাইতে পারে এবং চোরেরও ধন্য সাহস ও চতুরতা যে এইরূপ বিপদ এড়াইয়া সে তাহার কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দেখিলাম যে বাঁশের একটা বড় মই-সিঁড়ি দোতালার জানালায় লাগাইয়া জানালার গরাদিয়া কাটিয়া চোর ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং ঈশ্বরবাবুর কোট, পেণ্টেলুন, কামিজ প্রভৃতি

অনেক পরিধেয় বস্ত্র ও পোষাক, ফুলাল তৈলের ও শেরির ৪টা বোতল ও নানাবিধ কাঁচের গ্লাশ, কাঁটা চামচ, স্ক্রুপ, সোনার ঘড়ি ও চেন, রূপার গেলাস বাটী, রেকাব, হুঁকা, গুড়গুড়ী, পানের ডিপা, সোনার নস্যদানী ও একটা পেনসিল কেস, নগদ কয়েকখানা গিনি মোহর ও প্রায় ১০০ টাকা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। আমি দেখিয়া স্তম্ভিত, কি করিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরবাবু আমাকে সকলের নিকট প্রচার কবিতে অনুমতি করিলেন, যে যদি কেহ চোর ধরিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তিনি ১০০ টাকা পুরস্কার দিবেন। এই ঘটনার চারি দিবস পূর্ব্বে গোয়াড়ীর বাজারে এক বাড়ীতে ঠিক এইরূপ দোতালার জানালা ভাঙ্গিয়া একটা চুরি হইয়াছিল। অতএব উপর্য্যুপরি অল্প সময়ের মধ্যে একই প্রণালীর দুইটি চুরি হওয়াতে গোয়াড়ীর অধিবাসীগণের মনে অত্যন্ত আতঙ্ক জন্মিল, এবং তাহা জন্মিবারও কথা। সকলে আমাকে বলিল যে এই চোর ধরিতে না পারিলে গোয়াড়ীর কখন কাহার সর্ব্বনাশ হয়, তাহার ঠিকানা নাই। আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এই চোর আবিষ্কার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বুদ্ধু নামে আমার অধীনে একজন বরকন্দাজ ছিল, সে পূর্ব্বে বিখ্যাত বদমাএস ও চোর ছিল—আমি তাহাকে প্রথমে চৌকীদারী ও পরে বরকন্দাজী দিয়া আমার নিকটে রাখিয়াছিলাম। সে ব্যাটা চোর-ধরার কার্য্যে এমন পণ্ডিত ছিল যে সিঁধ দেখিয়া বলিতে পারিত যে ইহা অমুক চোরের, কিম্বা ইহা দেশী কি বিদেশী চোরের কার্য্য। ফলে তাহার সন্ধান অব্যর্থ ছিল এবং তাহাকে আমি রাখিবার পরে কৃষ্ণনগরে চুরি এককালে তিরোহিত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। বুদ্ধু এই দুই চুরি দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া পড়িল। সে বলিল যে ইহা কোন নূতন ব্যক্তির কার্য্য, দেশী চোরের কর্ত্তৃক হয় নাই। তথাপি আমি কৃষ্ণনগরের সকল বদমাএসকে ধরিয়া আনিয়া কত প্রহার করিলাম কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না। ইংরাজীতে বলে যে জলমগ্ন ব্যক্তি তৃণ অবলম্বন

করিয়াও বাঁচিতে চেষ্টা করে। আমার ঠিক তদ্রূপ হইয়াছিল। আমার চিত্ত এমন ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে আমাকে যে যাহা পরামর্শ দিত, তাহাই আমি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে শুনিলাম যে নবদ্বীপ হইতে একজন জ্যোতিষী ঠাকুর আসিয়াছেন তাঁহার গণনা অতি চমৎকার। গেলাম, সেই জ্যোতিষীর নিকটে। তিনি তাঁহার পাঁজি পুথি বাহির করিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন যে "পুব, পুব, দক্ষিণ দক্ষিণ।" "খর্ব্বাকার, লম্বা চুল, খড় ঢাকা" ইত্যাদি বাতুলের ন্যায় নানা অসংলগ্ন বাক্য ব্যয় ও পুথি নাড়াচাড়া করিয়া দুই ঘণ্টা সময় অপচয় করিলেন। ফল, কোনরূপে চেষ্টা করিতে আমি ত্রুটি করিলাম না।

থানার এক রীতি ছিল যে সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস থানার অধীনস্থ সকল গ্রামের চৌকীদারেরা ও ফাঁড়ির বরকন্দাজেরা দারোগার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় স্বীয় মহল্লার সংবাদ ব্যক্ত করিত। এই চুরির পরে আমি সকল চৌকীদার এবং ফাঁড়িদার বরকন্দাজকে এই ঘটনার ও চোর ধরিয়া দিতে পারিলে ১০০ টাকা পুরস্কারের সংবাদ জানাইয়া তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে ঈশ্বরবাবুর বাসায় যাই এবং প্রত্যহই অভয়বাবুর অনুযোগ তিরস্কার শ্রবণ করি। এমন করিয়া কয়েক দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না। চুরির নবম দিবসে ঈশ্বরবাবুর নিকট হইতে রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় গৃহে যাইতেছিলাম, এমন সময় থানার নাএব দারোগা আমাকে থানার মধ্যে ডাকিয়া বেলপুকুরের ফাঁড়িদার রামহিত ওঝা বরকন্দাজের প্রেরিত একখানা পত্র দেখাইল, তাহাতে কেবল এইমাত্র লেখা ছিল যে "পত্রপাঠ চলিয়া আসিবেন, এক ব্যক্তির উপরে আমার শোভে হইতেছে।" আমি তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরবাবুর নিকটে পুনরাগমন করিয়া তাঁহার দ্রব্য সকল চিনিতে পারে এমন একজন চাকর সঙ্গে লইয়া বেলপুকুর যাত্রা করিয়া শেষ রাত্রিতে সেইখানে

পৌঁছিলাম। ফাঁড়িদার বলিল যে সন্নিকটস্থ সুজনপুর গ্রামে ছিরা কায়েত নামে একজন প্রসিদ্ধ বদমাএস আছে, তাহাকে লোকে ছিরা চোর বলিয়াও ডাকিয়া থাকে। সে অদ্য ৪।৫ দিবস অবধি বেলপুকুরের বাজারের এক বেশ্যার বাটীতে প্রত্যহ রাত্রিতে খুব সরাপ খাইতে ও ধুমধাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং লোক তাহাকে নূতন নূতন রকমের বস্ত্রাদি পরিধান করিতে দেখিয়াছে, ইহাতে ফাঁড়িদার সন্দেহ করিয়া আমাকে সংবাদ পাঠাইয়াছে। আমি সেই বেশ্যার বাড়ী যাইয়া দেখি যে তখনও তাহারা বসিয়া সুরাপান ও আমোদ প্রমোদ করিতেছে। ছিরাকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটা বাঁশের আলনার উপরে একটা কামিজ ও পেণ্টেলুন ঝুলিতেছে দেখিয়া ঈশ্বর-বাবুর খানসামা বলিয়া উঠিল যে উহা তাহার বাবুর পোষাক। ছিরা তখন সরাপের নেশাতে বিভোর, ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে না। আমি তাহাকে ফাঁড়িঘরে প্রেরণ করিয়া ঐ বেশ্যার সহিত কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম যে সে আমার পূর্ব্ব-পরিচিত ব্যক্তি। আমি যখন নবদ্বীপ থানাতে ছিলাম তখন এই বেশ্যাও সেই থানার নিকটে বাস করিত। সে আমাকে মুক্তকণ্ঠে বলিল যে ছিরা অদ্য কয়েক দিবস ধরিয়া তাহার নিকট আসিয়া প্রত্যহ অনেক টাকা ব্যয় করিতেছে এবং একবাক্স পোষাক ও অন্যান্য দ্রব্য আনিয়া তাহার ঘরে রাখিয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে কিম্বা কোন্ স্থান হইতে আনিয়াছে তাহা সে জানে না। প্রাতে বেলপুকুরের বাজারের কয়েকজন লোক আনিয়া তাহাদের সমক্ষে বেশ্যার ঘর হইতে এই বাক্স বাহির করিয়া দেখিলাম যে তাহার মধ্যে সোনা-রূপার দ্রব্য সকল ভিন্ন আর সমুদায় অপহৃত দ্রব্য এবং বস্ত্র আছে। সুজনপুরের নীলকুঠীর মালিক মেঃ ডুব্রেপ ডি ডম্বাল সাহেব আমাকে বলিলেন যে ছিরা ধৃত হওয়াতে তাঁহার অত্যন্ত উপকার হইল, কারণ ছিরা প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার কুঠীর

দ্রব্যজাত চুরি করিত। সুজনপুর গ্রামে যাইয়া ছিরার বাড়ী তল্লাস করিলাম কিন্তু সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না। অবশেষে অনেক প্রহার খাইয়া ছিরা কহিল, যে সে গোয়াড়ীর খেয়াঘাটের ইজারাদার একজন বৈরাগীর সঙ্গে একত্রে এই চুবি করিয়াছিল, এবং সোনা-রূপার দ্রব্য সকল সেই বৈরাগীর নিকট আছে। কিঞ্চিৎ বেলা থাকিতে আমরা কৃষ্ণনগর প্রত্যাগমন করিয়াই প্রথমে সেই বৈরাগীর খানাতল্লাসী করিলাম, কিন্তু সেই স্থানে কিছুই পাইলাম না। ইতি-মধ্যে ঈশ্বরবাবুব বাড়ীর চুরির চোরামাল ও চোর ধৃত হওয়ার কথা শুনিয়া তাহা দেখিতে গোয়াড়ীর রাস্তায় এত লোকের সমাগম হইল যে ঈশ্বরবাবুর বাসাতে পৌছিয়া দেখিলাম, যে তাঁহার বাড়ীর ভিতর লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমি ধৃত দ্রব্য সকল লইয়া ঈশ্বরবাবুব বাড়ীর উত্তর ধারের বোয়াকের উপরে বসিলাম, ঈশ্বরবাবু ও তাঁহার সঙ্গে অভয়বাবু দোতালার জানালায় গলা বাহির কবিয়া দেখিতে লাগিলেন। আমি এক একটি দ্রব্য বাহির করিয়া এই "কামিজটি কার" বলিয়া জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরবাবু উপর হইতে বলেন "আমাব।" এইরূপে সমুদায় দ্রব্যগুলি ঈশ্বরবাবু তাঁহার দ্রব্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ার পরে আমি ছিরাকে রীতিমত ধৃত দ্রব্য সমস্ত সমভিব্যাহারে মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিলাম। সেই জ্যোতিষী ঠাকুব সকলের নিকট বলিতে লাগিলেন যে তাঁহার গণনার বলেই আমি এই চোর ধরিয়াছিলাম, এবং তাঁহার শ্রোতা-গণের মধ্যে এমন অনেক বুদ্ধিমান লোক ছিলেন যে, তাহাই তাঁহারা বিলক্ষণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন, নচেৎ, তাহার এক ব্যক্তি আমাকে বলিলেন কেন যে "দৈববল ভিন্ন এমন চোর ধরা মনুষ্যের সাধারণ বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে।" যাহা হউক, অন্য মোকদ্দমা হইলে তাহা এই স্থানেই শেষ হইয়া যাইত কিন্তু ইহা সেরূপ হইল না, ইহার রহস্যের ভাগ রহিয়া গেল, বিবৃত করিতেছি।

চোর ধরিলাম, মাল ধরিলাম, গোয়াড়ীর অধিবাসীরা নিশ্চিন্ত

ও সন্তুষ্ট হইল কিন্তু ঈশ্বরবাবুর সন্তোষ হইল না। তিনি আমাকে সেই রাত্রিতেই আহারের সময় বলিলেন যে "দারোগা তোমার কার্য্য তুমি একরূপ সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিলে কিন্তু আমার কিছুই উপকার হইল না, আসল টাকার মাল চোরের হস্তে রহিয়া গেল, বিশেষ সোনার ঘড়িটা যাহা আমি বিলাত হইতে ফরমাইস দিয়া আনিয়াছি, তাহা না পাইলে আমার কিছুতেই সন্তোষ হইবে না।" আমি কি করিব? চোরকে যত প্রহার করিতে হয়, তাহা আমি করিয়া দেখিয়াছি, তথাপি সে অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি দিলনা; বিশেষ সে এক্ষণে আমার হস্তে নাই, হাজতে গিয়াছে এবং মোকদ্দমাও এক-প্রকার শেষ হইয়াছে। তথাপি ঈশ্বরবাবু আমাকে উত্তেজনা করিতে ছাড়িতেন না। সর্ব্বদা বলিতেন যে "তুমি চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই, চেষ্টা করিলে অবশ্যই আমার ঘড়িটি আবিষ্কার করিতে পারিবে।" আমি অগত্যা জেলখানায় যাইয়া ছিরাকে ডাকিয়া অনেক মিথ্যা আশা-ভরসা দেখাইলাম কিন্তু তাহাতে সে কর্ণপাত না করিয়া আমাকে নিশ্চয় বলিল যে তাহার নিকট ঐ সকল দ্রব্য নাই। যাইয়া এই সংবাদ ঈশ্বর বাবুকে বলিলাম কিন্তু তিনি ছাড়িবার ব্যক্তি ছিলেন না। আমাকে হতাশ হইতে নিষেধ করিয়া পুনরায় চেষ্টা করিতে বলিলেন। ফলিতার্থে আমার এই বিষয়ে তাঁহার ন্যায় আর উৎসাহ ছিল না। কারণ, আমার নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি আর পাওয়া যাইবে না।

শুখাকালে কৃষ্ণনগরের স্থানে স্থানে বড় জলকষ্ট হইত, থানায় এক ছোট পুষ্করিণী ছিল, তাহাতে কায়কষ্টে স্নান করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য চলিত না। আমীনবাজারের পুষ্করিণী বড় বটে, কিন্তু তাহাতে জল থাকিত না। কেবল জেলখানার দক্ষিণে লালদীঘির জল উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী ছিল, কিন্তু তাহাতে কেহ স্নান করিতে পাইত না, কেবল আমি জেলদারোগার অনুমতি লইয়া তাহাতে মধ্যে মধ্যে স্নান করিতাম এবং স্নান করিতে যাইয়া

জেলদারোগার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতাম। সেই সময়ে নৈহাটী নিবাসী বাবু রাজীবচন্দ্র মিত্র ঐ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁহার সহিত আমার বন্ধুতা থাকাতে আমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাইতাম। উপরোক্ত ঘটনা সমস্তের প্রায় ১০।১২ দিবস পরে আমি একদিন প্রাতে জেলদারোগার নিকট বসিয়াছিলাম; এমন সময় দেখিলাম যে হাজতের আসামীরা পেতনীপুকুর নামক জেলখানার সম্মুখস্থিত একটা পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া জেলখানার ভিতরে প্রত্যাগমন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে আমার শ্রীধরও ছিলেন। ছিরা আমাকে দেখিয়া তাহার প্রহরী বরকন্দাজকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে সে আমার সঙ্গে কথা কহিতে চাহে। ছিরা আসিয়া আমাকে বলিল যে "দারোগা মহাশয়! হাজতে থাকিয়া আমার সুবুদ্ধি উদয় হইয়াছে, আমি অবশিষ্ট মাল সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়া আসিয়াছি, ফলে বৈরাগী আমার সঙ্গেও ছিল না এবং মালও তাহার হস্তে নাই। মাল আমার নিজ গ্রামে আমার একজন জ্ঞাতির নিকট আছে, আপনি আমাকে একবার সুজনপুর লইয়া যাইতে পারিলে, সেই মাল দেখাইয়া দিতে পারিব।"

দারোগা। তুমি এক্ষণে হাজতের আসামী; তোমাকে জেলখানা হইতে বাহির করিয়া স্থানান্তর লইয়া যাইতে আমার ক্ষমতা নাই। আমি তাহা করিতে পারিব না, তোমার যদি যথার্থই সন্তাপ হইয়া থাকে এবং মালগুলি দেওয়ার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির নাম এবং কোন্ স্থানে সে মাল গোপন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করিলেই আমি সেই স্থানে যাইয়া তাহা উদ্ধার করিতে পারিব।

চোর। না আপনি তাহা পারিবেন না, আমি সেখানে নিজে গমন না করিলে অন্যের কাহারও সাধ্য হইবে না।

দারোগা। তবে ইহাতে তোমার আরও কিছু অভিসন্ধি আছে।

চোর। থাকিতে পারে, কিন্তু আমি ইহা উপলক্ষ করিয়া আপনার হস্ত হইতে পলাইবার চেষ্টা করিব, এমন যেন আপনি মনে না করেন।

দারোগা। তাহা যে তুমি করিবে না, তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব।

চোর। আপনি যদি তাহা মনে করেন, তাহা হইলে আপনি পাগল। আমি যদিও দুরদৃষ্টবশতঃ চোর হইয়াছি তথাপি আমি ভালমানুষের ছেলে, লেখাপড়াও কিঞ্চিৎ জানি, অতএব আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি যে সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে এমন স্থান নাই, যেখানে যাইয়া ইংরাজের হস্ত হইতে লুকাইয়া থাকিতে পারিব। অতএব আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হউন, আমি পলাইব না। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে যেমন করিয়া হউক, আপনি আমাকে সুজনপুরে না লইয়া গেলে, আপনি সেই অবশিষ্ট দ্রব্যগুলিন পাইবেন না।

ছিরার এইসকল কথা শুনিয়া আমি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলাম যে, আমি কল্য প্রাতে যাহা হয় তাহাকে জানাইব। ঈশ্বরবাবুকে জানাইলাম। তাঁহার ইচ্ছা যে যেন তেন প্রকারেণ মালগুলি পাইলেই হয়; অতএব তিনি ছিরার কথায় কোন দোষ দেখিলেন না এবং আমাকে ছিরার কথানুযায়ী কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন। ছিরাকে জেলখানা হইতে বাহির করিয়া আনিতে হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের অবশ্যক কিন্তু সেই সময়ে মাজিষ্ট্রেট মেঃ এফ, আর, ককরেল্ সাহেব তখন মফঃস্বল ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন, কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমার সমুদায় কার্য্যের ভার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মৌলবী ইএতজাদ হোসেনের হস্তে অর্পিত ছিল। মৌলবী সাহেবের ন্যায় ধর্ম্মভীত এবং নিরীহ ভালমানুষ আমি চক্ষে দেখি নাই। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া সকল কথা ব্যক্ত করাতে তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন যে "বাবু আমি আর কিছু জানি না, তুমি যদি

আসামীর জেম্বা হইয়া বাহির করিয়া লইতে সাহস কর, তাহা হইলে আমি হুকুম দিতে পারি।" আমি অগত্যা তাহা স্বীকার করাতে তিনি জেলদারোগাকে সেই হুকুম প্রদান করিলেন।

পরদিবস প্রাতে আমি ছিরাকে জেলখানা হইতে বাহির করিয়া থানায় লইয়া যাইতে চাহিলাম কিন্তু সে থানায় যাইতে অস্বীকার কবিল। বলিল যে "আমি এখন থানায় যাইব না, আমাকে আপনার বাসায় লইয়া চলুন, আমি অনেক দিন ভাল দ্রব্য খাইতে পাই নাই, একটা রুই মাছের মুড়া ও দধি দুগ্ধ সন্দেশ খাইতে বড় সাধ হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা দিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ান।" আমি তাহাই করিলাম। বাসায় লইয়া যাইয়া সেইরূপ আহারের উদ্যোগ কবিলাম ও চৌকীদার দ্বারা তাহার স্নানের জল আনাইয়া দিলাম। অন্য ভদ্রলোকের ন্যায় সে আমার বিছানায় বসিল, আমার হুঁকায় তামাকু খাইল, আমাব গামছা ব্যবহাব করিয়া স্নান করিল এবং অবশেষে একজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মত বসিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করিল এবং ভোজন করিয়া খুব তৃপ্তি প্রকাশ করিল। ভোজনান্তে থানায় যাইয়া শয়ন করিল। এবং নিদ্রাভঙ্গের পরে আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিল যে "দারোগা* মহাশয়, আপনি জানেন যে আমার শবাব খাওয়ার অভ্যাস আছে,—আমকে ঈশ্বরবাবুর নিকট হইতে সেইরূপ এক বোতল শরাব আনাইয়া দিলে বড় ভাল হয়, কিন্তু তাহা থানায় বসিয়া খাইব না, আমীনবাজারে রমণী নাম্নী আমার এক প্রণয়িনী আছে, আমি তাহার ঘরে তাহার সঙ্গে বসিয়া

* ভগিনী সুরুচি এই স্থানে আপনি আমাকে কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা না করিলে, আমি মারা যাই। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন বঙ্গদেশে আপনার আবির্ভাব হয় নাই সুতরাং তখন আপনার নিয়মের বিরুদ্ধে এমন অনেক কার্য্য করিয়াছি, যাহার জন্ত আমরা এইক্ষণে অত্যন্ত লজ্জিত আছি। কিন্তু যে স্থলে প্রকৃত বৃত্তান্ত বর্ণনা করাই আমার সঙ্কল্প হইয়াছে, তখন সত্যের অপলাপ করিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিতেও পারিতেছি না—ক্ষমা প্রার্থনা করি।

অদ্য সমস্ত রাত্রি আমোদ করিতে চাহি। আপনি বেশ বুঝিতেছেন যে আমার নিস্তার নাই, ৫।৭ বৎসরের জন্য আমাকে কয়েদ থাকিতে হইবে এবং তাহা হইতে বাঁচিয়া পুনর্ব্বার বাড়ী যাইব কি না সন্দেহ, অতএব মনের সাধ মিটাইয়া আজকার একটা রাত্রি যদি আমাকে আপনি অনুগ্রহ করিয়া কাটাইতে দেন, তাহা হইলে চিরকাল আপনাব এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখিব। আমি পলাইবার চেষ্টা করিব বলিয়া আপনি যেন কিছুমাত্র আশঙ্কা করেন না, আর এক কথা এই যে আমি যখন রমণীর ঘরে থাকিব তখন সেখানে যেন কোন চৌকীদার কিম্বা বরকন্দাজ আমাদের উপরে প্রহরী স্বরূপে বসিয়া আমাদের আমোদের বিঘ্ন না করে।" ছিরার কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। হাসিব কি রাগ করিব, স্থির করিতে পাবিলাম না। অবশেষে "ইহাও একটি কম মজার তামাশা নহে" বলিয়া আমার মনে উদয় হওয়াতে আমি ছিরার সমুদায় অনুরোধ প্রতিপালন করিতে সম্মত হইলাম। অভয়বাবু শুনিয়া "ছি ছি" করিয়া উঠিলেন, কিন্তু ঈশ্বরবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন যে "যাও ব্যাটার আবদার প্রতিপালন করা উচিত, পুলিশ আমলার এই সকল কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।" তাঁহার নিকট হইতে দুই বোতল শেরী লইয়া আমীনবাজারে রমণী বেশ্যার বাড়ীতে গমন করিলাম। আমীনবাজার নিজ কৃষ্ণনগর ও গোয়াড়ির মধ্যস্থল এবং এইস্থানে একটি ভাল বাজার ও নীচ বেশ্যাদিগের উপনিবেশ আছে। রমণীকে সকল কথা অবগত করিয়া ছিরা তাহার ঘর হইতে পলায়ন করিতে না পারে তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলাম এবং অধিক শরাবের আবশ্যক হইলে আবগারীর দোকান হইতে যত ইচ্ছা শরাব আনিয়া লইতে বলিলাম এবং আরও কহিলাম, যে ছিরা যাহাতে শীঘ্র মাতাল হইয়া অজ্ঞান হয়, তাহা যেন রমণী চেষ্টা করে। তদুত্তরে রমণী মাথা নাড়িয়া কহিল যে "দুই কলসী মদ খাইলেও ছিরার কিছু হইবে না।" পরে রমণীর বাড়ীর পার্শ্বস্থ বেশ্যাদিগকে

সতর্ক করিয়া কৃষ্ণনগরের অনেক পাড়া খালি করিয়া চৌকীদার আনিয়া প্রত্যেক বাড়ীতে এক-একজন প্রহরী বসাইয়া দিলাম। থানার সমস্ত বরকন্দাজগুলিকেও স্থানে স্থানে রাখিলাম এবং তাহাদের উপরে থানার ও বালাগস্তির জমাদারদ্বয়কে মোতায়েন করিলাম এবং সকলের উপরে স্বয়ং রমণীর বাড়ীর নিকটে—এক দোকানদারের দোতালা ঘরে শয়নেব উদ্যোগ করিলাম। সেই ঘর হইতে রমণীর বাড়ী দেখা যায়। এইরূপে সাবধান হইয়া ছিরার আবদার পালনে ব্রতী হইলাম। সন্ধ্যার পরে ছিরা পুনরায় আমার বাসাতে আহার করিয়া আমীনবাজার যাইবাব পূর্ব্বে আমার চাকরের নিকট হইতে আমার একখানা পরিধেয় কোঁচান ধুতি ও চাদর চাহিয়া লইয়া পরিধান করিল, এবং কিঞ্চিৎ আতরও চাহিয়া লইয়া আমার জুতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার জুতা তাহার পায়ে ছোট হইল। পরে আমার বাসা হইতে নির্গত হইয়া আমাকে তাহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ কবিল, চৌকীদার কিম্বা বরকন্দাজের সহিত যাইতে অসম্মত হইল। আমরা যাইতে আরম্ভ করিলাম, কোন বরকন্দাজ কিম্বা চৌকীদার না দেখিয়া সে বড় সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু আমাদের পশ্চাতে এক ব্যাটা দাড়ীওয়ালা মুস্কিল-আসান একটা মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া আসিতেছিল। সেই মুস্কিল-আসান আমার বুদ্ধু বরকন্দাজ। ছিরাকে রমণীর বাড়ীতে পৌঁছছাইয়া আমি নিজ স্থানে গমন করিলাম এবং সেই দ্বিতল কক্ষ হইতে সমস্ত রাত্রি রমণীর ঘরে হাসি তামাশার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমাদের কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, অবশেষে ভোর হওয়ার পূর্ব্বে ছিরা টলিতে টলিতে থানায় প্রত্যাগমন করিল এবং আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। সেই দিবস ছিরা সুজনপুর যাইতে পারিল না। পরদিবস নায়েব দারোগার সঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম। নায়েব দারোগা প্রত্যাগতে মোহর ও টাকা ব্যতীত অপহৃত সমুদয় সোনা-রূপার দ্রব্য ও চেন সমেত ঘড়িটা আনিয়া উপস্থিত করিয়া ব্যক্ত করিল যে,

ছিরার জ্ঞাতির কথা মিথ্যা, সে নিজেই এক গোপনীয় স্থান হইতে ঐ দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া দিল। দায়রার বিচারে ছিরার ছয় বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইল এবং ঈশ্বরবাবু তাঁহার ঘড়িটি পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে আমার সহিত সেক-হাণ্ড করিলেন। চোরের আবদারের কথাও আমার এইস্থানে সমাপ্ত হইল।

চোর বড়, না, দারোগা বড় ?

চোরের অনুসন্ধানশক্তি যে কত তীক্ষ্ণ এবং অব্যর্থ, তাহা যাঁহারা সে কর্ম্মেব কর্ম্মী নহেন, তাহারা সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে পারেন না।

আমাকে একজন অতি বিশ্বস্ত ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, যে তাঁহাব বাসস্থানেব নিকট এক গ্রামে ইদাজোলা নামক একজন অতি বৃদ্ধ মনুষ্য ছিল; তাহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসব হইয়াছিল। পূর্ব্বে সে এমন চোর ও ডাকাইত ছিল, যে জীবনের অধিকাংশ কাল জেলখানায় অতিবাহিত হইয়াছিল; ইদা যখন কারাগার হইতে মুক্ত হইত, তখন অন্যান্য কয়েদীদিগকে বলিয়া আসিত যে "ভাই দেখিস্, তোরা যেন আমাব ভাতের হাঁড়িটা নষ্ট করিস্ না, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।" বাস্তবিকও সে জেলখানা হইতে নির্গত হইয়া, কখন ১০।১৫ দিবস এবং অধিক হইলেও দুই-তিনমাস বাহিরে থাকিয়া, পুনরায় দুষ্কর্ম্ম করিয়া কারাবদ্ধ হইত। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে শক্তিহীন হইয়া সে চুরি ডাকাইতি হইতে ক্ষান্ত হয়। এই সময় তাহার হাঁপানী কাশির পীড়া হওয়াতে এবং কবিরাজে ভাল পুরাতন ঘৃত ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়াতে, ইদা ঐ পুরাতন ঘৃতের জন্য সেই ভদ্রলোকটির নিকট আসিল; তিনি জানিতেন যে তাঁহার নিকট ঐ দ্রব্য নাই, তাহাতে ইদা বলিল যে "কি ঠাকুর ? আপনি আমাকে কি জন্য প্রবঞ্চনা করিতেছেন ? আমি নিশ্চয় জানি যে আপনার ঘরে যেমন পুরাতন ঘৃত আছে, এমন অন্য কোন স্থানে নাই।" তাহাতেও তিনি সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করাতে, ইদা জোলা

তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া বলিল যে "আপনি যদি সত্য সত্যই পুরাতন ঘৃতের বিষয়ে অনবগত থাকেন, তাহা হইলে আপনি যাইয়া আপনার অমুক ঘরে অমুক দিকের কোণের নিকট মাটি খুঁড়িয়া দেখুন, এক ভাঁড় বহুকালের ঘৃত পাইবেন।" গৃহস্বামী সেইস্থানে অনুসন্ধান করাতে যথার্থ ঘৃত আবিষ্কৃত হইল। ইদা কহিল, যে সে অবগত ছিল, যে সেই ভদ্রলোকের পিতামহ তাঁহার নিজের পীড়ার জন্য সেইস্থানে ঘৃত পুরাতন করিবার জন্য একটা ভাঁড়ে মাটির মধ্যে এক সের ভাল গাওয়া ঘৃত পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। দেখুন গৃহস্বামী নিজে যাহা জানিতেন না, তাহা ভিন্ন গ্রামের একজন চোর জানিত। ইহাত গেল আমার শুনা কথা, চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাও বড় সামান্য নহে। বিবৃত করিতেছি; কৃষ্ণনগরের পূর্ব্ব প্রান্তে এক বেটা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত যুগী ছিল, দেখিতে দরিদ্র, দুইখানা পুরাতন জীর্ণ চালাঘর মাত্র তাহার বিত্ত, এবং পরিবারের মধ্যে কেবল এক বিধবা ভগিনী। লোক দেখান দুই-একজোড়া নূতন কাপড় বিক্রয় করিয়া জীবনধারণ করিত। প্রতিবাসীরাও সকলে তাহাকে বিত্তহীন এবং ধনহীন বলিয়া জানিত, কিন্তু একজন চোর জানিতে পারিয়াছিল, যে "ইহার ধুকড়ির ভিতর খাশা চাউল আছে।" একরাত্রে ১০।১৫ জন অস্ত্রধারী মনুষ্য তাহার গৃহ আক্রমণ করিয়া লইয়া যায়। প্রাতে আমার নিকট সংবাদ আসিলে আমি ঘটনার স্থানে যাইয়া যুগীর ঘরবাড়ীর অবস্থা দেখিয়া প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না যে নিকটে অনেক সঙ্গতিপন্ন লোকের বাড়ী থাকিলেও ডাকাইতেরা কি জন্য সেই সকল বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া এমন দরিদ্রের বাড়ী ডাকাইতি করিতে আসিল। যুগীও প্রথমে আমার নিকটে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিল না; কিন্তু তাহার ভগিনীর পরামর্শে সে অবশেষে প্রকাশ করিল, যে অন্যান্য স্থানে তাহার কাপড়ের ব্যবসা আছে এবং তদ্দ্বারা সে অনেক নগদ সম্পত্তি আহরণ করিয়া তাহার দুই ভাঙ্গা গৃহে মাটির ভিতর গোপন করিয়া রাখিয়াছিল এবং

ডাকাইতেরা তাহা জানিতে পারিয়া প্রায় সহস্রাধিক টাকার মূল্যের বস্ত্র ও সোনা-রূপাব গহনা ও নগদ টাকা লইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন্ ব্যক্তির দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে, তাহা সে বলিতে পারে না। ডাকাইতেরা মুখে কালী চূণ মাখিয়া আসিয়াছিল সুতরাং সে কাহাকেও চিনিতে পারে নাই।

যদিও এই ডাকাতি কৃষ্ণনগরের একপ্রান্তে হইয়াছিল তথাপি নগরের সীমানার মধ্যে হওয়াতে আমার ও অধিবাসীগণের অত্যন্ত আতঙ্ক হইল; ভাবিলাম যে এই কার্য্যের কর্ত্তাদিগকে ধৃত করিতে এবং শাস্তি দিতে না পারিলে, তাহারা যে পুনরায় অন্যদিকে এবং অন্যের বাড়ীতে হস্ত প্রসারণ করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব আমার চর অনুচরদিগকে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলাম। আমি প্রত্যহ দুই বেলা যুগীর বাড়ীতে যাইয়া তাহার প্রতিবাসীদিগের মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিতাম কিন্তু দুই-তিনদিবস নিষ্ফলরূপে কাটিয়া গেল, কিছুই করিতে পারিলাম না। একদিন প্রাতে আমি যুগীর বাড়ী ঐরূপ যাইতেছিলাম, দেখিলাম যে নেঙটিয়া সেখ নামক একজন প্রতিবেশী পথের মধ্যে আমাকে দেখিয়া বিলক্ষণ সঙ্কুচিতচিত্তে অন্যদিকে যাইবার চেষ্টা করিল। যদিও আমি বেশ জানিতাম যে দারোগা দেখিলে ইতর লোক স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত হইয়া অন্যপথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে, তথাপি সেই সময়ে নেঙটিয়ার ঐরূপ ভীরুভাব দেখিয়া আমার মনে হঠাৎ একপ্রকার সন্দেহ হইল। তাহাকে ডাকিয়া সে কি জন্য আমাকে দেখিয়া পলায়ন করিতেছে, জিজ্ঞাসা করাতে সে ভালরূপে আমার কথাব উত্তর দিতে অসমর্থ হইল এবং আমার বোধ হইল, যেন তাহার কথাগুলি তাহার গলায় বাধিয়া থাকিতেছে, মুক্তকণ্ঠে কথা কহিতে পারিতেছে না। আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ রাগান্ধভাবে "কোথায় যাইতেছিস্" বলিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে মাটির দিকে তাকাইয়া বলিল "যে মহারাজ আমি চুরি করি নাই।" আমার সঙ্গে আমার

প্রধান গোয়েন্দা বুদ্ধু বরকন্দাজ ছিল; সে নেঙটিয়ার কথা শুনিয়া "ঠাকুরঘরে কে? না আমি কলা খাইনে; তুই চুরি করিস্ নাই, তবে কে করিয়াছে রে ব্যাটা? চল্ আমার সঙ্গে থানাতে চল্, এখনি দেখাইয়া দিব, কেমন তুই চুরি করিস্ নাই" বলিয়া সে নেঙটিয়ার হাত ধরাতে নেঙটিয়া আমার পা ধরিয়া বলিল যে "দোহাই দারোগা মহাশয়! আমাকে মারিবেন না, আমি যাহা জানি বলিতেছি!" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিল এবং তাহার ঘর হইতে অপহৃত দ্রব্যের সে যে অংশ পাইয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া দিতে সম্মত হইল। আমরা যুগীকে সঙ্গে লইয়া নেঙটিয়ার গৃহে যাওয়াতে, তাহার ঘরের মধ্য হইতে একটা বড় হাঁড়ীতে চাউল দ্বারা আচ্ছাদিত কয়েক জোড়া নূতন বস্ত্র বাহির করিয়া দিল এবং যুগীও তাহার দ্রব্য বলিয়া চিহ্নিত করিল। নেঙটিয়া যে সকল ব্যক্তির নাম করে, তাহাদের সকলের নিকট অপহৃত দ্রব্য পাওয়া গেল এবং সকলেই বলিল যে চিত্রশালী নিবাসী মুন্সী সেখ নামক এক ব্যক্তি তাহাদের সর্দ্দার ছিল এবং অপহৃত সোনারূপার অধিকাংশ দ্রব্য তাহারই নিকট আছে।

মুন্সী সেখ থানায় ধৃত হইয়া আসিবামাত্রই তাহার অপরাধ স্বীকার করিল এবং বলিল যে তাহার নিকট কোন অপহৃত দ্রব্য নাই, তবে তাহার সঙ্গীগণ তাহাদের নিজ নিজ অপরাধ লাঘব করার উদ্দেশ্যে তাহার নাম করিয়াছে। ফলে মুন্সীর ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হইল, যে সে যাহা বলিয়াছে, তাহাই যথার্থ, প্রবঞ্চনা নহে। আমি তাহার কথাগুলি যথাবিধি লিপিবদ্ধ করিয়া সেই লিপিসহ তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

তখন বি পামর নামে একজন যুবা সিবিলিয়ান মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি বহুকাল পশ্চিমাঞ্চলে থাকিয়া এইবার প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার ক অক্ষরও তিনি জানিতেন না, কিন্তু হিন্দিতে তাঁহার বিলক্ষণ দখল ছিল। চরিত্রও

খুব তেজস্বী ছিল। প্রজাদিগের যাহাতে শাস্তি হয় এবং বদমায়েস এবং কুচরিত্রের লোকেরা যাহাতে দমন থাকে; তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি একদিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় অশ্বপৃষ্ঠে সমস্ত কৃষ্ণনগর ভ্রমণ করিয়া থানায় উপস্থিত হইলেন এবং নগরের কোন স্থানে কোন গোলমাল দেখিতে না পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এক অশ্বের উপরে বসিয়া তিনি একঘন্টাকাল আমাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন তাহার মধ্যে একটি উপদেশ তিনি বারম্বার উল্লেখ করিয়া আমাকে স্মরণ করিতে বলিয়াছিলেন এবং তাহা এই যে "Daroga naver shew your teeth befoie you bite." অর্থাৎ "দারোগা কামড়াইবার পূর্ব্বে কখনও দাঁত দেখাইও না।"

এই মাজিষ্ট্রেটের নিকট আমি মুন্সীকে তাহার একরার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলাম। আইনের নিয়ম ছিল এবং তাহা অন্যান্য সকল মাজিষ্ট্রেটকে অনুসরণ করিতে দেখিয়াছিলাম, যে থানা হইতে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীকৃত কিম্বা অস্বীকৃত জবাবের সহিত একবার মাজিষ্ট্রেটের নিকট থানা হইতে প্রেরিত হইলে, সে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া সেই জবাবের পোষকতা করুক, কিম্বা না করুক, সে আর থানায় পুনঃপ্রেরিত না হইয়া, হাজতে প্রেরিত হইত কিম্বা জামিন দিয়া শেষ বিচার পর্য্যন্ত মুক্ত থাকিতে পাইত। কিন্তু পামর সাহেবকে তাহার বিপরীত করিতে দেখিলাম। মুন্সী সেখকে কাছারি পাঠাইবার কিছুকাল পরেই দেখিলাম, যে বরকন্দাজ তাহাকে লইয়া পুনরায় থানায় আনিল এবং প্রকাশ করিল যে সাহেবের নিকট মুন্সী উপস্থিত হইয়া তাহার অপরাধ অস্বীকার করাতে, তিনি বিরক্ত হইয়া আমলাদিগকে বলিলেন, যে "দারোগা আমার নিকট কি আসামি পাঠাইয়াছে? এ দেখিতেছি, একরার করে না; তবে ইহাকে আমার নিকট পাঠাইবার আবশ্যক কি ছিল? ইহাকে পুনরায় থানায় পাঠাইয়া দেও।" তখন আমি বুঝিলাম, যে মুন্সী সেখকে

আমি যেরূপ সরল ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম, সে সেরূপ নহে; অতএব তাহাকে খুব করিয়া প্রহার করিতে বরকন্দাজদিগকে শিখাইয়া দিলাম। পরদিবস প্রাতে মুন্সী পুনরায় কাছারিতে যাইয়া যথার্থ কথা বলিতে চাহিবায়, আমি তাহাকে পুনরায় সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলাম কিন্তু পুনরায় মুন্সী তঞ্চকতা ব্যবহার করাতে সাহেব তাহাকে আবার আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মুন্সীকে এইরূপ উপর্য্যুপরি দুইবার তঞ্চকতা ব্যবহার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে ব্যক্ত করিল যে "আমি জানিতাম, যে পুলিশ-আমলারা আসামিকে একরার করাইবার নিমিত্ত থানায় যন্ত্রণা দিয়া থাকে, কিন্তু একরার করুক কিম্বা না করুক মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে হাজতে প্রেরণ করেন এবং হাজতে গেলে আসামির কারারুদ্ধ থাকা ভিন্ন অন্য কোন কষ্ট কিম্বা জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না। আরও আমি জানিতাম যে শুদ্ধ একরার করাইবার এবং চোরামাল পাওয়ার নিমিত্ত পুলিশ আমলারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দিয়া থাকেন, আসামী একরার করিলে কিম্বা মাল বাহির করিয়া দিলে, তাহাকে থানায় কোন কষ্ট পাইতে হয় না। অতএব আমি থানায় আসিবা-মাত্রই একরার করিয়াছিলাম এবং আপনিও তজ্জন্য প্রথমে আমাকে কষ্ট না দিয়া কাছারিতে চালান করিয়া দিয়াছিলেন। আমি মনে জানিতাম, সেইখানে যাইয়া অস্বীকার করিলে আমার থানায় একরার বৃথা হইয়া যাইবে এবং আমি হাজতে প্রেরিত হইব; কিন্তু আমার কপালে তাহা ঘটিয়া উঠিল না, সাহেব দুইবার আমাকে থানায় পুনঃপ্রেরণ করিয়াছেন। নূতন রকমের আইন হইয়াছে না কি? নচেৎ কেন এইরূপ হইল! যাহা হউক, সাহেব আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনার যাহা করিতে হয় করিয়া দেখুন।" আমিও তাহাকে বরকন্দাজের গারদে একদিন একরাত্র সম্পূর্ণরূপে উপবাসী রাখিলাম, কত ছিদ্দৎ করিলাম এবং তাহার প্রতি আর যে সকল ব্যবহার করিলাম, তাহা এক্ষণে লিখিতে লজ্জা বোধ হয়।

হা পরমেশ্বর! সেই সকল নিষ্ঠুরাচরণের নিমিত্ত আমি বুঝি এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার ফল ভোগ করিতেছি। "বরমেব ভিক্ষা তরুতলে বাস" তথাপি যেন ভদ্রসন্তানেরা পুলিশের চাকরি না করেন।

এইরূপ দুই-তিনদিবস ধরিয়া ব্যবহার করিলাম, কিন্তু মুন্সী সেখ অটল হইয়া রহিল। খাইতে না পাইলে, খাইতে চাহে না এবং প্রহার করিলে নিষেধ করে না। অবশেষে আমি বিরক্ত হইয়া এক নির্জ্জন সময়ে মুন্সীকে হিতবাক্য প্রয়োগ করিয়া নানাপ্রকার বুঝাইলাম এবং বলিলাম যে "দেখ মুন্সী আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যবহার করিতেছি, কি করিব, যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছাড়েন না, তখন তোর একবার করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।" তাহাতে মুন্সী সেখ যে উত্তর করিল তাহা শুনিয়া পাঠকগণ অবশ্যই আশ্চর্য্য হইবেন এবং সে কত বড়দরের চোর তাহাও বুঝিতে পারিবেন। এত দীর্ঘকাল পরে, আমার তাহার বাক্যগুলি ঠিক স্মরণ নাই, মর্ম্ম প্রকটন করিতেছি শ্রবণ করুন। "আমি নূতন কিম্বা কাঁচা চোব নহি, আমার এক্ষণে প্রায় ৪০ বৎসর বয়স হইল কিণ্ড ইহার মধ্যে আমি চুরি ডাকাইতি ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম করি নাই, অতএব ভালরূপে আমি জানি, যে আমি নিজে অপরাধ স্বীকার না করিলে কিম্বা মাল বাহির করিয়া না দিলে, আমার সহস্র সঙ্গী তাহাদের স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিলে, জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার কিছু করিতে পারিবেন না, আমি সেইজন্য কখনও একরার করি নাই এবং তন্নিমিত্ত কখনও দণ্ডনীয় হই নাই। আমি অনেক জেলায় বড় বড় গুরুতর মোকদ্দমায় ধৃত হইয়া অনেক দারোগার হস্তে মার খাইয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন দারোগা আমাকে একরার কয়াইতে পারেন নাই।" এই স্থানে সে তাহার জানুর কাপড় উঠাইয়াই কয়েকটা কাল দাগ দেখাইয়া বলিল যে "এই দেখুন যশোর জেলার এক ব্যাটা পাপিষ্ঠ মুসলমান দারোগা তামাকের গুল পোড়াইয়া আমার জানুতে চাপিয়া

ধরিয়াছিল। আমার জানুর মাংস চড়্ চড়্ করিয়া পুড়িয়া দুর্গন্ধ বাহির হইল, আমি চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলাম বটে কিন্তু একরার করি নাই। পাবনার বিখ্যাত মৌলবী ওয়াসফদ্দীন দারোগা এক্ষণে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন; তিনি আমার হস্তের নখের ভিতর কাঁটা ফুটাইয়া দেখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; আর অন্যান্য কত দারোগার কাছে কত প্রকার যন্ত্রণাভোগ করিয়াছি, তাহা আমি কত বলিব। কিন্তু কেহ আমাকে দিয়া একরার করাইয়া লইতে পাবেন নাই। এক্ষণে আপনার হস্তে পড়িয়াছি, দেখি আপনিই বা কি করিতে পারেন? আপনারও বড় নাম শুনিয়াছি, দেখিব যে চোর বড়, কি দারোগা বড়? কিন্তু আপনি ধ্রুব জানিবেন যে মারপিট করিয়া আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না, প্রহার আমার শরীবে বিলক্ষণ সহ্য হয়, তবে অন্য কোন মন্ত্র দ্বারা যদি আপনি চোর অপেক্ষা বড় হইতে পারেন, তাহা অনায়াসে চেষ্টা করিতে পারেন।" এই কথোপকথনের পরে মুন্সীকে যন্ত্রণা দেওয়া অনর্থক বিবেচনা করিয়া আমি বরকন্দাজদিগকে নিষেধ করিয়া দিলাম কিন্তু সমস্ত রাত্র আমার মনে ঐ চিন্তা জাগরূক রহিল। ভাবিলাম যে এই দস্যু ব্যাটা যদি আমাদের হস্তে নিষ্কৃতি পাইয়া যায়, তাহা হইলে বড় লজ্জা ও বিপদের বিষয়। লজ্জা আমার, বিপদ সমাজের।

পরদিবস বুধবার থানায় গ্রাম্য চৌকীদারেরা হাজিরা দিতে আসিয়াছিল; তাহার মধ্যে মুন্সীর নিজ গ্রামের চৌকীদারকে দেখিয়া হঠাৎ আমার মনে কি এক ভাব উদয় হওয়াতে, আমি তাহাকে মুন্সীর পরিবারের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে সে কহিল যে মুন্সীর বিবাহিতা স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল হইল স্থানান্তর চলিয়া গিয়াছে এবং মুন্সী তাহার পরিবর্ত্তে আর একটি স্ত্রীলোককে নিকা করিয়া চিত্রশালী গ্রামের প্রান্তে এক ঘর উঠাইয়া তাহাকে লইয়া বাস করে। মুন্সীর বাড়ীতে কেবল তাহার মাতা থাকে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র আমি সেই চৌকীদারের সঙ্গে

একজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া মুন্সীর নিকার স্ত্রীকে থানায় আনিতে আদেশ করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেই স্ত্রীলোকটি থানায় উপস্থিত হওয়াতে দেখিলাম, যে সে ভদ্রলোকের মেয়ের ন্যায় দেখিতে সুশ্রী এবং বয়সও ২০।২২ বৎসরের অধিক নহে; ক্রোড়ে একটি ৬ মাসের শিশুকন্যা। মুন্সীর স্ত্রী আমাকে দেখিয়া আমার পায়ের উপরে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল যে "আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে মুন্সী বদমায়েস, নিকার আগে জানিতে পারিলে আমি তখন তাহাকে বিবাহ করিতাম না, মুন্সীর মাতাই সকল অনর্থের মূল এবং সেই জন্য আমার শাশুড়ির সহিত আমার বনিবনাও না হওয়াতে মুন্সী আমাকে গ্রামের বাহিরে স্বতন্ত্র ঘর করিয়া দিয়াছে। আমি মুন্সীকে চুরি ডাকাইতি করিতে নিষেধ করিয়া থাকি বলিয়া সে আমার নিকট সকল কথা গোপন করে। আমার কন্যার মাথায় হাত দিয়া বলিতেছি যে আমি কিছুই জানি না, আমার শাশুড়িকে আপনি ধরিয়া আনিয়া খুব শাস্তি দিলেই সকল কথা তাহার নিকট জানিতে পারিবেন।" এই স্ত্রীলোকের কথার উপর আস্থা করিয়া তাহাকে ভাল স্থানে রাখাইয়া মুন্সীর মাতাকে আনিতে পাঠাইলাম। পরদিবস সকালবেলায় মুন্সীর মাতা আমার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিলাম, যে তাহার ক্লিষ্টা শরীর, চক্ষু কোটরস্থ; সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল না। তাহার নিকট মুন্সীর স্ত্রীকে উপস্থিত করিলে উভয়ে ভারি বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিল। শাশুড়িকে বৌ চোরনী এবং বৌকে শাশুড়ি বেশ্যা বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল। অবশেষে মুন্সীর স্ত্রীকে স্থানান্তর করিয়া তাহার শাশুড়িকে ধমকাইতে লাগিলাম এবং থানায় তুড়ুমের নিকট টানিয়া লইলাম। তুড়ুম জিনিসটা কি, তাহা বোধ হয় আমার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে জানেন না। তুড়ুম শব্দ ফরাসীস ভাষা, ইংরাজিতে ইহাকে Stocks বলে। দুইখানা লম্বা

ভারি কাষ্ঠ একদিকে শক্ত লোহার কবজা দ্বারা আবদ্ধ, অন্যদিকে খোলা ; কিন্তু ইচ্ছা করিলে শিকলের দ্বারা বন্ধ করা যায়। এই খোলাদিকের মাথা ধরিয়া উপরের কাষ্ঠকে উঠান নামান যাইতে পারে। প্রত্যেক কাষ্ঠেই কয়েকটি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় এমনভাবে ছিদ্র করা আছে যে একখানা কাষ্ঠের উপরে দ্বিতীয়খানা পাতিলে দুই ছিদ্রে একটা গোলাকার ছিদ্র হয়। আসামিকে বসাইয়া কিম্বা শুয়াইয়া তাহার দুই পা একখানি কাষ্ঠের দুই ছিদ্রের ভিতরে রাখিয়া উপরের কাষ্ঠ দ্বারা তাহা চাপা দিলে পা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয় এবং আসামি আর নড়িতে পারে না। বিশেষ কষ্ট দেওয়ার মানস থাকিলে, পার্শ্ববর্ত্তী দুই ছিদ্রে পা না দিয়া, এক ছিদ্রমধ্যে রাখিয়া অন্তরের দুই ছিদ্রে পা আটকাইলে মানুষের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। রাত্রিকালে দুরন্ত আসামি-দিগকে নিশ্চিন্তরূপে আবদ্ধ রাখিবাব নিমিত্ত সকল থানাতে ইহার এক একটা তুড়ুম ছিল। মুন্সীর মাতাকে এই তুড়ুমের নিকট আনিয়া তাহার উপরিভাগেব কাষ্ঠটা টানিয়া উঠাইয়া নিম্ন কাষ্ঠের উপরে ছাড়িয়া দিলাম ; তাহাতে ঝন্ করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে, মুন্সীর মাতা কাঁপিয়া উঠিল এবং আমি তাহাকে রাগান্ধভাবে বলিলাম যে "দেখ্ বেটী, তুই যদি এই যুগীর দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া না দিস্ তাহা হইলে, এই তুড়ুমের মধ্যে এক ফুকব অন্তরে তোর পা আটকাইয়া ফেলিয়া রাখিব এবং সমস্ত দিন তোকে প্রহার করিব।" মুন্সীর মাতা আমার রাগান্ধভাব দেখিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বলিল যে "বাবা তাহা হইলে ত আমার মুন্সী মারা যাইবে।" সন্তানের প্রতি মাতার যে কি গাঢ় স্নেহ, তাহার ইহাই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সম্মুখে যন্ত্রণার এক ভয়ানক যন্ত্র, পশ্চাতে যমদূতের ন্যায় দারোগা এবং বরকন্দাজেরা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতে এবং যন্ত্রণা দিতে প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান, তথাপি মাতার মনে মুন্সীর যাহাতে অমঙ্গল না হয়, তাহাই প্রবল চিন্তা। মুন্সীর মাতার মুখে এইরূপ

বাক্য শুনিয়া আমি তাহাকে অনেক আশাভরসা দিলাম। স্ত্রীলোকের এবং সাধারণ লোকের মনে ধারণা আছে যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ক্ষতিকারককে শাস্তি দিতে না চাহে, তবে আদালত তাহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য। আমি ইহা জানিয়া মুন্সীর মাতাকে বলিলাম যে "যুগী আমাকে বলিয়াছে যে সে তাহার সমুদয় দ্রব্যগুলি পাইলেই সন্তুষ্ট হইবে কোন আসামিকে সে শাস্তি দেওয়াইতে চাহে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় আমি যুগীকে ডাকাইয়া আনিয়া মোকাবিলা করিয়া দিব।" ভাগ্যক্রমে যুগীও সেই সময়ে থানায় উপস্থিত ছিল। সে আমার ইঙ্গিতে মুন্সীর মাতাকে ঐরূপ আশ্বাস দিল; কিন্তু চোরের মা শুদ্ধ বাক্যের উপরে নির্ভর না করিয়া বলিল যে "তবে যুগী সেতাম্বর কাগজে একখানা দরখাস্ত দাখিল করুক।" অনভিজ্ঞ লোকে ষ্ট্যাম্প কাগজকে সেতাম্বর কাগজ বলে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার বাক্স হইতে এক তক্তা ফুলস্কেপ্ কাগজ বাহির করিয়া মুন্সীর মাতাকে তাহার মধ্যে জলের মার্কা দেখাইয়া প্রতীত করিলাম, যে যথার্থ উহা ষ্ট্যাম্প কাগজ এবং তাহা আমার নায়েব দারোগার হস্তে অর্পণ করিয়া তাহার দ্বারা মুন্সীর মাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী দরখাস্ত লিখাইয়া, তাহাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া যুগীর দ্বারা দস্তখত করাইয়া লইলাম এবং আমরাও কয়েকজন তাহাতে সাক্ষীস্বরূপে স্বাক্ষর করিলাম। স্ত্রীলোকটির মনে তখন বিশ্বাস হইল, যে অপহৃত মাল বাহির করিয়া দিলে মুন্সীর কোন ক্ষতি হইবে না এবং তখন সে মাল দিতে সম্মত হইয়া নায়েব দারোগার সঙ্গে চিত্রশালী যাত্রা করিল।

এ পর্য্যন্ত মুন্সী সেখ এই সকল ঘটনা বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতে পারে নাই। মুন্সীর মাতা থানা হইতে বাহির হওয়ার পরক্ষণেই আমি বরকন্দাজি গারদে যাইয়া মুন্সীকে বলিলাম যে "কেমন মুন্সী এখন ত মাল পাইলাম, তুই দিলি না কিন্তু তোর মা দিতে চাহিয়াছে, এখন তোরা মায়ে পোয়ে ফাটক খাটিবি।" এই

কথা শুনিয়া মুন্সী অবাক হইয়া তাহার মাতাকে দেখিতে চাহিল, আমি তাহাকে দ্বারেআনিলাম। কোতওয়ালীর সম্মুখস্থিত রাজবর্ত্মটি অতি সরল, থানার দ্বারে দাঁড়াইয়া উত্তর দক্ষিণ উভয়দিকে অনেক দূর দৃষ্টি হয়। মুন্সীকে যখন দ্বারে আনিলাম, তখন তাহার মাতা প্রায় ৫০০ হাত (যাঁহারা সেই স্থান দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে পুরাতন কলেজের হাতার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণের নিকট) গিয়াছে। মুন্সী তাহার মাতাকে চিনিয়া বলিল যে "এখন কি হইবে মহাশয়! আমার মাতাকে কি প্রকারে বাঁচাইব।" আমি বলিলাম "এক উপায় আছে, তুই যদি এখন নিজে মাল বাহির করিয়া দিয়া সাহেবের নিকট যাইয়া একরার করিস, তাহা হইলে তোর মা বাঁচিতে পারে, কেমন মুন্সী তোর মাকে ফিরাইব নাকি?" মুন্সী ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল যে "না ফিরাইবার দরকার নাই। ও ত চোরের মা, সে যে সহজে মাল বাহির করিয়া দিবে, এমন কথা আমার মনে লয় না, যাহা হউক আর কিছুকাল বিলম্বেই টের পাইব। এখন গাঙের মাঝে ঢেউ দেখিয়া কিনারায় নৌকা ডুবাইলে, কি পুরুষত্ব হইবে? বিশেষ আপনি সত্য কি মিথ্যা বলিতেছেন তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব, চলুন এখন থানায় ফিরিয়া যাই।" মুন্সী এমন শক্ত চোর, যে সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, তাহার মাতা এমন কাঁচা কর্ম্ম করিবে। বেলা ৪ টার সময় নায়েব দারোগা মুন্সীর মাতাকে ও একটা বড় পুরাতন কালা হাঁড়ির মধ্যে অপহৃত যাবতীয় সোনা-রূপার দ্রব্য ও নগদ টাকাগুলি সম্মুখে আনিয়া, ব্যক্ত করিল, যে, যে কৌশলে সকল দ্রব্য গোপন করা হইয়াছিল, তাহাতে উহারা দুইজন ভিন্ন আর কাহারও তাহা আবিষ্কার করার ক্ষমতা ছিল না। গ্রামের বাহিরে একটা মাঠের মধ্যে এক শিমুল ও খর্জ্জুর গাছের তলে, মাটির একটা অদৃশ্য গহ্বর আছে তাহার মধ্যে হাঁড়িটা উপুড় করিয়া রাখিয়া সকলের উপরে পাতা ও ঘাসের চাপড়া আচ্ছাদন করিয়া রক্ষিত হইয়াছিল।

মুন্সীকে ডাকিয়া দেখাইলাম, সে দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া আমার পা দুইখানা ধরিয়া তাহার মাতাকে রক্ষা করিতে বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং বলিল যে "এখন আপনি যাহা বলিবেন, তাহা আমি সমুদায় করিব।" আমি তাহার মাতাকে অব্যাহতি দিতে সম্মত হইয়া বিস্তারিতরূপে তাহার দ্বারা একবার লিখাইয়া লইলাম এবং মুন্সী দ্রব্য বাহির করিয়া দেওয়ার কথাও তাহাতে স্বীকার করিয়া লইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন আগুঘরে আগু খেলিতেছিলেন, মুন্সী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা স্বীকার করিল এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়া মুন্সীর প্রার্থনামতে সেই রাত্রিটা তাহাকে ফাটকে প্রেরণ না করিয়া, থানায় রাখিতে আদেশ করিলেন। সমস্ত রাত্রি মুন্সী তাহার মাতা ও স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অতিবাহিত করিল এবং পরদিবস প্রাতে কান্দিতে কান্দিতে তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া জেলখানায় গেল। যাইবার সময় তাহাতে আমাতে এইরূপ কথোপকথন হয়ঃ

মুন্সী। দারোগা মহাশয়। আপনি আমার নিয়ম ভঙ্গ করিলেন। আমার পায়ে কখনও বেড়ী উঠে নাই এইবার উঠিবে। আমি এখন দেখিতেছি, যে আপনি দারোগাই বড।

দারোগা। দারোগা বড নহে, ধর্ম্মই বড় মুন্সী সেখ।

মুন্সী। ঠিক বলিযাছেন, এবার যদি খোদার মেহেরবানীতে ফাটক খাটিযা প্রাণ লইযা বাড়ীতে আসিতে পারি, তাহা হইলে আর চুরি ডাকাইতি করিব না।

দারোগা। সবসে ওহি ভালা।

মুন্সীর সাত বৎসরের জন্য নির্ব্বাসনের সহিত কারাবাসের দণ্ড হয়।

খড়ে পারের রাবণ রাজা

কৃষ্ণনগর জেলায় নাকাশীপাড়া একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে অধিক লোকের বসতি নাই এবং গ্রামও বড় নয়; কেবল একঘর জমিদারের বাস, কিন্তু তাঁহাদের জন্যই গ্রামখানি অনেকে চিনে। এই জমিদারবাবুরা রাজপুত বংশীয় একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান। কিম্বদন্তী আছে যে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অধীনে চাকরী করিয়া অনেক সম্পত্তি উপার্জ্জন করত স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া এই নাকাশীপাড়াতে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সন্তানেরা সেই সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে কৃষ্ণনগর জেলার জমিদারগণের মধ্যে একঘর গণ্যমান্য জমিদার হইয়া উঠিয়াছিলেন। নাকাশীপাড়ার জমিদারবাবুদিগের আদিপুরুষ পশ্চিমদেশস্থ ব্যক্তি ছিলেন, এবং যদিও তাঁহার সন্তানেরা ক্রমান্বয়ে কয়েক পুরুষ যাবৎ বাঙ্গালায় বাস করিয়া সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে রাজপুতের রক্তের গুণ এখনও সম্যক্‌রূপে লোপ পায় নাই। এখনকার ছোকরা বাবুদের কথা আমি বলিতে পারি না; কিন্তু আমার সহিত নাকাশীপাড়ার যে সকল বাবুদিগের আলাপ পরিচয় ছিল, তাঁহারা সকলেই বিলক্ষণ বলবীর্য্যশালী পুরুষ ছিলেন। প্রত্যেকের তিন-চারিটি করিয়া ভাল জাতীয় অশ্ব থাকিত এবং কেহ পারতপক্ষে পালকি কিম্বা হস্তী চড়িয়া স্থানান্তর গতিবিধি করিতেন না; ঘোড়াই তাঁহাদের প্রিয় বাহন ছিল; এবং কৃষ্ণনগর জেলায় বাঙ্গালীর মধ্যে কেহই নাকাশীপাড়ার বাবুদিগের ন্যায় অশ্বারোহণে মজ্‌বুৎ ছিল না। নাকাশীপাড়ার

গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র এবং চতুর্দ্দিকে মাঠের মধ্যে স্থিত। ইহা পূর্ব্বে কাটোয়া মহকুমার অধীন অগ্রদ্বীপ থানার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু পরে নিজ নাকাশীপাড়াতেই থানা সংস্থাপিত হইল। যে কারণে নাকাশীপাড়ায় থানা স্থাপিত হয়, তাহা বিবৃত করাই আমার এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

এই গ্রামে কেবল বাবুদিগের এবং বাবুদিগের স্থাপিত কয়েক ঘর প্রজার ও নবশাখের বাস। বাবুদিগের বাড়ী বৃহৎ অট্টালিকা। সেকালের দস্যুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত যে কৌশলে গৃহ নিৰ্ম্মাণ করা হইত, তাহা নাকাশীপাড়ার জমিদার-দিগের গৃহ দেখিলেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। এই গ্রামে বাবুরা সুন্দর জলাশয় খনন এবং বিলাসভোগের নিমিত্ত কয়েকটি বাগিচা প্রস্তুত করিয়া গ্রামের শোভাবৰ্দ্ধন করিয়াছিলেন। নাকাশীপাড়ার কিয়দ্দূর পশ্চিমে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে গোটপাড়া নামক একটি গ্রাম আছে। নাকাশীপাড়ার এবং সেই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের গঙ্গাস্নান, শবদাহ এবং অন্যান্য পবিত্র কার্য্য সম্পাদনের জন্য গোটপাড়ায় আসিতে হয় এবং গোটপাড়াও এই বাবুদিগের অধিকারভুক্ত। আমি যখন নাকাশীপাড়া দেখিয়াছি তখনও রায়বাবুদিগের জমি, জমা, গোলাবাড়ী ইত্যাদি বিপুল বিত্তবিভব ছিল। কৃষ্ণনগর সহরের নীচে খড়িয়া নদীর উত্তর পারে, মায়াকোল ধুবুলিয়া গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত অনেক স্থানেই ইহাদিগের অধিকার ছিল এবং কলিকাতা হইতে বহরমপুর যাইবার যে সৈনিক রাজবর্ত্ম আছে, তাহার দুই পার্শ্বে এই পঁচিশ ক্রোশের মধ্যে অন্য দুই-একজন ভূম্যধিকারী থাকিলেও ঐ সকল স্থানে নাকাশীপাড়ার বাবুদিগের একাধিপত্য ছিল। ইঁহাদিগের যেমন বিস্তৃত ভূসম্পত্তি তেমনি নগদ টাকাও অধিক ছিল। প্রবাদ আছে যে ইঁহাদের গৃহের মধ্যে এক ধনাগারে বহু মুদ্রা ও অধিক মূল্যের প্রস্তরাদি স্তূপীকৃত ছিল। সেই ধনাগার

বেষ্টন করিয়া শরিকেরা তাঁহাদের অন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই ধনাগারে যাইতে হইলে বাবুদিগের বাহির ও অন্দর বাড়ী সকল অতিক্রম না করিয়া তথায় প্রবেশ করিতে কেহ সমর্থ হইত না। ধনাগারের এক শক্ত কবাট ছিল এবং তাহাতে সকল কর্ত্তার পৃথক পৃথক এক তালা দেওয়া ছিল, যে, ধনাগার খুলিতে হইলে সকল শরিক একত্র এবং সম্মত না হইলে, তাহা খুলিবার উপায় ছিল না। ধনাগারে কত টাকা ছিল, তাহা তখনকার কর্ত্তারাও সকলে জানিতেন না। বর্দ্ধমানের রাজবাড়ীর ধনাগারে যে পরিমাণে মুদ্রা ছিল, নাকাশীপাড়ার ধনাগারে অবশ্যই সেই পরিমাণে টাকা থাকা অসম্ভব, তথাপি ইহাতে যে বহু ধন ছিল, তাহা একসময়ে সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বিশেষ, পরের ধন ও নিজের আয়ু,—কেহই কম দেখে না; তাহাতে ধনাগারের নাম শুনিয়া সাধারণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে এই ধনাগারে না জানি কতই বা ধন লুক্কায়িত আছে। অংশীদিগের মধ্যেও অনেকের সেইরূপ বিশ্বাস ছিল এবং যতদিন ধনাগার পরীক্ষিত না হইয়াছিল ততদিন রায়বাবুদিগের সম্মান ও গৌরবের সীমা ছিল না। সহসা কেহ তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহস করিত না; কারণ, সকলে বিবেচনা করিত, যে আবশ্যক হইলে, ইঁহারা ধনাগার খুলিয়া যত ইচ্ছা ধন ব্যয় করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু চরমে পরীক্ষায় এই ধনাগারের প্রতিষ্ঠা টিঁকিল না।

একপক্ষে চন্দ্রমোহন রায়, কেশবচন্দ্র রায় ও বিহারীলাল রায় ও অন্যপক্ষে সর্ব্বচন্দ্র রায় ও ঈশানচন্দ্র রায়দিগের পরস্পর মহা মনোবাদ এবং সেই সূত্রে মহাকলহের সৃষ্টি হইল এবং ধনাগার সম্বন্ধে ঈশানবাবুর দলের সন্দেহ হওয়াতে, তাহা খুলিয়া তন্মধ্যস্থিত ধন বণ্টন অথবা বিবাদ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত রাজদ্বারে ক্রোক রাখার জন্য আবেদন করা হইল। এই বিবাদই চরমে এই ধনাঢ্য বংশের ধ্বংসের মূল হইয়া উঠিল। উপরিউক্ত প্রার্থনামতে কৃষ্ণনগর হইতে

কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ বাজকর্ম্মচাবীবা নাকাশীপাডায় গমন কবিয়া সকল অংশীগণেব সমক্ষে ধনাগাব খুলিলেন এবং দেখিলেন যে তাহাতে কয়েক শত পুবাতন টাকা ও সিকি,আধুলী ভিন্ন আব কিছুই নাই। সকলে অবাক, বিশেষ, ঈশানবাবুবা ধন পাইবেন বলিয়া আশা কবিয়াছিলেন, তাঁহাবা এককালে ভগ্ন-হৃদয় এবং মর্ম্মাহত হইযা পডিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সাধাবণ দর্শকবৃন্দও নিরুৎসাহ হইল। কেশববাবুব পক্ষে বলিল, যে ধনাগারেব অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ এবং তাহাতে যে কিছু ধন ছিল, তাহা তাঁহাদেব পূর্ব্ববর্ত্তীবা ব্যয কবিয়া গিযাছিলেন এব' যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা ধনাগাবে পাওয়া গেল। কিন্তু ঈশানবাবুব দলেব বিশ্বাস সেইরূপ নহে, তাঁহাবা বলেন যে ধনাগাবে বাস্তবিক বহুসংখ্যক মুদ্রা ছিল, কিন্তু কেশব ও বিহাবীবাবু গোপনে তাহা বাহিব কবিযা লইয়া ধনাগার শূন্য এবং অন্যান্য শবিকগণকে বঞ্চনা কবিয়াছেন। ।কন্তু সন্দেহ ভিন্ন এই অপবাদেব দ্রষ্টব্য কোন প্রমাণ না থাকাতে কেশববাবুব বিরুদ্ধে তাঁহাবা কিছু কবিতে পাবিলেন না। কেবল দুই পক্ষের মনে পরস্পব মর্ম্মান্তিক বোষেব সৃষ্টি হইযা বহিল এবং ইহকালে সেই বিচ্ছেদ আব জোডা লাগিল না এবং এ জন্মে তাঁহাবা কেহ কাহাবও সহিত পুনবায় আব বাক্যালাপ করিলেন না। এই বিবাদ-অগ্নি দুই পক্ষেব কাহাবও প্রাণ থাকিতে নির্ব্বাণ হইল না।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে নাকাশীপাডার জমিদাবদিগেব লাঠির ভযে সকল জমিদাব ও নীলকুঠীব সাহেবরা পর্য্যন্তও তটস্থ ছিলেন; কিন্তু এই ঘটনার পবে তাঁহারা আপনা আপনি পরস্পবের বিরুদ্ধে লাঠি চালাইতে লাগিলেন। যদি শুদ্ধ দেওয়ানী কিম্বা কালেক্টরিতে মোকদ্দমা উপস্থিত কবিয়া নাকাশীপাড়ার বাবুবা ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তত ক্ষতি ছিল না কিন্তু কেবল মোকদ্দমায় রাজপুতেব রক্তে শান্তি বোধ হইত না। যুদ্ধ করাব নিমিত্ত ইঁহাদের শরীব কামড়াইত। অন্যান্য বাঙ্গালী জমিদারেরাও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতেন

বটে, কিন্তু তাঁহারা কেবল টাকা দিয়া খালাস। লাঠিয়াল সড়কি-ওয়ালা সংগ্রহ করিয়া, অধিক বেতন দিয়া, একজন নাক-কান-কাটা কারাগার-বাসে-অভ্যস্ত দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিকে সেই দলের কাপ্তেন অর্থাৎ নেতা নিযুক্ত কবত, তাহার অধীনে লাঠিয়ালদিগকে দাঙ্গা করিতে পাঠাইতেন ; আপনারা নিজে তাহার ত্রিসীমানায় যাইতেন না বরং রাজদ্বারে দণ্ড হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য, দাঙ্গার দিবসে কিম্বা তাহার অগ্রে কোন সহর কিম্বা জেলার সদর স্থানে উপস্থিত থাকিয়া আপনার সাফাই অর্থাৎ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। যে কিছু আপদ বিপদ কিম্বা শাস্তি হইত, তাহা তাঁহাদেব কর্ম্মচারীগণের এবং অধিক পরিমাণে সেই কাপ্তেনের উপর ন্যস্ত হইত। কিন্তু নাকাশীপাড়ার রাজপুত জমিদার বাবুরা সেইরূপ ভীরু স্বভাবের মনুষ্য ছিলেন না। তাঁহাদের কার্য্যে পেশাদার কাপ্তেন কিম্বা সর্দ্দারের আবশ্যক হইত না। বেতনভোগী কাপ্তেনের কার্য্যে তাঁহারা সন্তুষ্টও হইতেন না। আপনারা লাঠিয়াল লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে যাইতেন এবং সেই জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা এইরূপ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। নাকাশীপাড়ার একটি যুবা জমিদার আমার নিকট কথায় কথায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে তিনি কয়েকবার এইরূপ যুদ্ধের নেতা হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া-ছিলেন যে শতাবধি অস্ত্রধারী লোক লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যখন তিনি উপস্থিত হইতেন এবং যোদ্ধাদিগের হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঘোড়া যখন নাচিতে নাচিতে শত্রুদলের দিকে ধাবমান হইত, তখন তাঁহার মনের মধ্যে এমন উল্লাস জন্মিত, যে তদ্রূপ উল্লাস তিনি আর কিছুতেই উপভোগ করেন নাই। বীর বংশের বীরপুরুষের উপযুক্ত কথাই বটে।

এই বীরপুরুষদিগের আত্মকলহ সাধারণের প্রতি যে কত অনর্থ ঘটাইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। তাঁহাদের অধিকারের মধ্যে গ্রামে গ্রামে স্থানে স্থানে দুইটি করিয়া দল

সংস্থাপিত হইল। প্রজা ও কর্ম্মচারীরা কেহ কেশববাবুর এবং কেহ বা ঈশানবাবুর পক্ষে বিভক্ত হইয়া পড়িল। নিরপেক্ষ হইয়া কাহারও থাকিবার উপায় ছিল না, কারণ তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে উভয় পক্ষের নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। এইরূপে দুই পক্ষের মধ্যে অসংখ্য মোকদ্দমা ও দাঙ্গা উপস্থিত হইতে লাগিল। এবং বহু লোক খুন জখম হইয়া গেল। ইহাতে বাবুদিগের যে কত টাকার শ্রাদ্ধ হইয়াছিল এবং নিয়ত তাঁহাদিগকে কেবল অশান্তি-ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার হিসাব দেওয়া অসাধ্য। অধিক টাকা, অস্ত্রধারী লোকের বেতনেই ব্যয় হইত। আমি শুনিয়াছি যে এক এক পশ্চিমা সর্দ্দারকে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং এই সকল অস্ত্রধারী ব্যক্তিদিগকে কেবল একটি কার্য্যের জন্য অল্প সময় ধরিয়া রাখা হইয়াছিল এমন নহে, বিবাদের সূত্র হইতে আমাদিগকে (পোলিশকে) আক্রমণ করা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ ইহারা বাবুদিগের স্কন্ধে বিরাজ করিয়াছিল। এই সকল দুর্বৃত্ত লোকের হস্তে সেই অঞ্চলের অধিবাসীগণকে অনেক দিন যাবৎ অনেক অশান্তিভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহারা একস্থানে সমবেত থাকিলে অনেক অনিষ্টের কারণ হইত না কিন্তু ইহাদিগকে দলে দলে বাবুদের ভিন্ন ভিন্ন মফঃস্বল কাছারীতে বিস্তীর্ণ করিয়া রাখাতে নানা স্থানে তাহাদের দৌরাত্ম্য ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল। পথিকদিগের নিরাপদে কৃষ্ণনগর হইতে বহরমপুর যাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

এই দুই দলের প্রত্যেক দলে যদিও কয়েকজন করিয়া বাবুরা ভুক্ত ছিলেন তথাপি একপক্ষে কেশববাবু এবং পক্ষান্তরে ঈশানবাবুর নামই বিখ্যাত ছিল। এই দুই ব্যক্তি দুই পক্ষের নেতা এবং কর্ত্তা ছিলেন এবং এই দুইজনের মধ্যে কেশববাবুই সর্ব্বসাধারণের নিকট আদরিত ছিলেন। ইনি যেমন বলবীর্য্যশালী তেমনই মুক্তহস্ত ছিলেন। হাপ-দাপ, রব-রবার কেশবের তুল্য তাঁহার বংশের মধ্যে

কেহই ছিলেন না। ইঁহার প্রখর বুদ্ধি এবং শ্রমসহিষ্ণুতা সমতুল্য ছিল। কেশববাবু অপরিমিত সাহসী ছিলেন, ভয় কি বস্তু তাহা তিনি জানিতেন না এবং সেই নিমিত্ত লাঠিয়াল সড়কিওয়ালাদিগের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। যোদ্ধারা যোদ্ধাকেই ভালবাসে। কেশববাবুর অধীনে চাকরী করা লাঠিয়ালদের বিবেচনায় অতি গৌরবের কথা ছিল, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে তাহারা এই বাবুর দলভুক্ত হইতে অগ্রসর হইত। কেশববাবু যে লড়াইয়ে নিজে যাইতে সংকল্প করিতেন তাহাতে তাঁহার যোদ্ধাগণ নৃত্য করিতে করিতে ধাবমান হইত। কেশববাবু খুব দীর্ঘচ্ছন্দ পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু বলিষ্ঠকায় ছিলেন। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং মুখখানা গোল ছিল। গম্ভীর স্বরে কথা কহিতেন; দেখিলে লোকে তাঁহাকে সম্মান এবং ভয় না করিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু তিনি মিষ্ট-ভাষী ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন এবং যে যেমন ব্যক্তি, তাহার সহিত তিনি সেইরূপ ব্যবহার করিতে জানিতেন। পক্ষান্তরে তাঁহার দোষও অনেক ছিল কিন্তু মৃত ব্যক্তির দোষ লইয়া আলোচনা করা হিন্দুর বিধেয় নহে। কেশববাবু শ্রমে অত্যন্ত অভ্যস্ত ছিলেন এবং অতি অল্পকাল নিদ্রা যাইতেন। শুনিয়াছি যে দুইজন বলবান ভৃত্য তাঁহার শরীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং চপেটাঘাত না করিলে, তাঁহার তৃপ্তিজনক নিদ্রা হইত না। ঈশানবাবুও বিলক্ষণ বলবান পুরুষ ছিলেন কিন্তু স্থূলতাবশত অধিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। ফলে কেশব ও ঈশানে অনেক বিষয়ে অনেক প্রভেদ ছিল। কেশববাবুই সাধারণের নিকট অধিক পরিচিত ছিলেন কিন্তু ঈশানবাবুকে লোকে কেবল কেশববাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া জানিত। তাঁহার নিজের কোন বিশেষ গুণের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

কেশব ও ঈশানের বিবাদে কৃষ্ণনগর জেলার স্থানে স্থানে এমন অশান্তির ঘটনা হইয়া উঠিয়াছিল, যে তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজ কেশববাবু ঈশানবাবুর এক-

খানা গ্রাম জ্বালাইয়া দিলেন, কাল ঈশানবাবু কেশববাবুর গ্রাম লুঠ করিলেন। একদিন এক দাঙ্গাতে কেশবের দশজন লোক জখম হইল, তাহার পরদিবস আর এক যুদ্ধে ঈশানের দুইজন লাঠিয়াল খুন হইল। অদ্য ঈশানবাবুর এক প্রজাকে নির্য্যাতন করার উদ্দেশ্যে কেশব তাহার ক্ষেত্রের ধান কাটিয়া লইয়া আসিলেন, কল্য কেশববাবুর এক গোলাবাড়ীর গোলা লুঠিয়া ঈশান তাহার প্রতিশোধ লইল। এক স্থানে একজন প্রজা নিরুদ্দেশ হইল আর এক স্থানেব কয়েকজন অধিবাসীকে প্রতিপক্ষ ধরিয়া আনিয়া খুব প্রহার করিল এবং কয়েদ করিয়া রাখিল। এইরূপে ফৌজদারী আদালত উভয় পক্ষের রাশি রাশি দরখাস্তে এবং মোকদ্দমায় ভরিয়া গেল। তখন সি. টি. মণ্ট্রেসর সাহেব কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট ও হিউএট নামক একজন সাহেব কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। হিউএট সাহেবকে আমি কেবল একবার মুহূর্ত্তমাত্র দেখিয়াছিলাম, বিশেষ তাহার কার্য্যদক্ষতার বিষয়ও আমি অধিক অবগত নহি সুতরাং এই হাকিমের সম্বন্ধে আমি এই স্থানে কিছুই বলিতে পারিলাম না। কিন্তু মণ্ট্রেসর সাহেবের কথা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি খুব তেজস্বী এবং প্রখর বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি ছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বেশ অধিকার ছিল, অনর্গল বাঙ্গালা কহিতে পারিতেন। কৃষ্ণনগরে যত সাহেব মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মণ্ট্রেসর সাহেব একজন অতি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। চোর ডাকাইতদিগকে একরার অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার করাইতে মণ্ট্রেসর সাহেব অনেক কৌশল জানিতেন এবং বিবাদপ্রিয় জমিদারদিগকেও তিনি দমন করার নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতেন। কিন্তু অনেক সময় তাঁহার কার্য্যদোষে, তাঁহার সদভিপ্রায়গুলি অত্যাচারে পরিণত হইয়া যাইত। সে যাহা হউক, এমন তেজস্বী এবং দক্ষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবও নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের বিবাদের

জটিলতায় দিশাহারা হইয়া গিয়াছিলেন। নানা স্থানে পুলিশ আমলা মোতায়েন করিলেন এবং জমিদারদিগকে কঠিন দণ্ড দিবেন বলিয়া ভয় দর্শাইলেন, কিন্তু বিবাদের শান্তি কবিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি সকল বাবুদিগকে কৃষ্ণনগব তলব দিয়া, তাঁহাব কাছারীতে উপস্থিত করিলেন এবং আদেশ কবিলেন যে তাঁহাব অনুমতি না লইয়া কেহ কৃষ্ণনগর হইতে স্থানান্তর গমন কবিলে তিনি তাহাকে কারারুদ্ধ করিবেন। তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রাতে বেলা ৬টা হইতে ৯।১০টা পর্যন্ত নিজের কুঠীতে অর্থাৎ গৃহে খাস কাছারী কবিতেন। সেই স্থানে কয়েকজন প্রধান আমলা উপস্থিত হইয়া জেলার থানা সমস্ত হইতে প্রাপ্ত বিপোর্ট সকল তাঁহাকে শুনাইয়া হুকুম লিখিয়া লইত এবং অন্যান্য বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যও সেই সময় সম্পাদিত হইত। পবে দুই প্রহরেব সময় কাছাবীতে আসিয়া বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতেন। এই শেষ কাছারী কোনওদিন শেষ বেলা এবং কোনওদিন সন্ধ্যাব পবে বাতি জ্বালাইয়াও হইত। মণ্ট্রেসর সাহেব নাকাশীপাড়ার বাবুদিগকে কৃষ্ণনগরে আনিয়া আদেশ করিলেন যে তাঁহারা প্রত্যূষে খাস কাছারীতে হাজির হইয়া আমলাদিগের সহিত বাসায় যাইবেন এবং আহার করিয়া পুনরায় আম কাছারীতে উপস্থিত থাকিয়া কাছারী ভাঙ্গিবার কালে তাঁহাকে সেলাম করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিবেন। বাবুদিগকে এইরূপ নজরবন্দী কয়েদ রাখিবার কারণ এই যে মণ্ট্রেসর সাহেব জানিতেন যে রায়বাবুরা নিজেই দাঙ্গা করিয়া থাকেন, কাপ্তেন নিযুক্ত করিয়া তাহার অধীনে দাঙ্গার স্থলে লাঠিয়াল পাঠাইবার অভ্যাস তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। অতএব তিনি মনে করিলেন যে তাঁহাদিগকে সমস্ত দিনরাত্র কৃষ্ণনগরে উপস্থিত থাকিতে বাধ্য করিলে দাঙ্গা হইতে পারিবে না। বিশেষ কৃষ্ণনগর হইতে নাকাশীপাড়া প্রায় দশক্রোশ ব্যবধান, সুতরাং প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাছারীতে থাকিয়া রাত্রিকালে

বাবুরা দশক্রোশ অতিক্রম করিয়া নাকাশীপাড়ায় যাইতে পারিবে না এবং পারিলেও তাহারা পুনরায় পরদিবস প্রাতে যথাসময় কৃষ্ণনগর আসিয়া তাঁহার কুঠীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবে না। তদতিরিক্ত তিনি গোয়াড়ির খেয়াঘাটের ইজারাদারকে বাবুদিগের কাহাকেও তাঁহার বিনা হুকুমে খড়িয়া নদী পার করিয়া দিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং কোতওয়ালীর দারোগাকেও বাবুদিগের প্রতি গোপনে দৃষ্টি রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। এইরূপে আটঘাট বন্ধ করিয়া মাজিষ্ট্রেট মণ্ট্রেসর সাহেব মনে করিলেন, যে তিনি এক্ষণে শান্তিভোগ করিতে পারিবেন। বাবুরা কেহ কোন আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু ও হরি! তাঁহার সাহেবী মন্ত্রণা ও কৌশলই সকল কেশববাবুর কাছে বৃথা হইয়া পড়িল।

বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে মিড়া নামক এক গ্রাম আছে, সেই গ্রামের সন্নিকটেই ক্লাইব সাহেবের সহিত নবাব সেরাজুদ্দৌল্লার সৈন্যের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহার অনতিদূরে লক্ষাবাগ নামক আম্রবাগিচা ছিল: তাহার মধ্যেই বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের তোপখানা স্থাপিত ছিল। সেই লক্ষাবাগ এখন আর নাই, নদীর ভাঙ্গনে সেই স্থানটা ভাগীরথীর গর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছে। যেখানে এমন পাপের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল বসুন্ধরা বোধ হয়, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে লজ্জাবোধ করিয়া, কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে তাহা গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছেন। সেই বাগানে নাকি বাঙ্গালার নবাবদিগের অর্জ্জিত নানাপ্রকার সুখাদ্য একলক্ষ আম্রবৃক্ষ ছিল এবং সেই জন্যই তাহার নাম হয় লক্ষাবাগ। একলক্ষ গাছের মধ্যে এখন একটি গাছও নাই। আমি যখন মিড়ায় গিয়াছিলাম, তখন মিড়ার কয়েকজন অধিবাসীর নিকট শুনিলাম যে লক্ষাবাগের শেষ বৃক্ষটি তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে নাকি তাহারা গোলার দাগ দেখিয়াছিল; কিন্তু এই কথা

বড় সত্য বলিয়া বোধ হইল না। মিড়ার চতুর্দ্দিকে যে সকল মাঠ আছে, তাহাতে কৃষকেরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে লাঙ্গলের মুখে কামানের গোলা পাইত এবং আমি তখনও দুই-একজনের ঘরে ঐরূপ গোলা দেখিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার একটা গোলা হস্তগত করিয়া আনিতে আমার বুদ্ধি হয় নাই। বোধকরি যাঁহাদিগের পুরাতন দ্রব্য সকল সংগ্রহ করার সখ আছে, তাঁহারা এখনও যত্ন করিলে ঐ গ্রামের কোনও না কোন অধিবাসীর নিকট পলাশী-যুদ্ধে ব্যবহৃত দুই এক লৌহ বর্ত্তুল সংগ্রহ করিতে পারেন।

মিড়া গ্রাম বহরমপুরের সৈনিক রাজবর্ত্মের পশ্চিম ধারে কৃষ্ণনগরের প্রায় বিশ ক্রোশ উত্তরে স্থিত। তাহাতে কয়েক ঘর সঙ্গতিপন্ন মুসলমান কৃষকের বাস এবং তাহা নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের অধিকারভুক্ত। মিড়াতে ঈশানবাবুর এক কাছারী ও গোলাবাড়ী ছিল এবং প্রজারা প্রায় সকলেই ঈশানবাবুর পক্ষ। এই গ্রামে কেশববাবু তাঁহার নিজের প্রভুত্ব সংস্থাপনের জন্য প্রথম হইতে চেষ্টিত ছিলেন কিন্তু ঈশানবাবুর সতর্কতায় এতদিন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদের সকলকে নজরবন্দী করাতে ঈশানবাবুর মনে বিশ্বাস হইয়াছিল, যে তাঁহাদের এই অবস্থায় কেহ কাহারও প্রতি কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না এবং বোধ হয় সেই বিশ্বাসে ঈশানবাবু মিড়াতে পূর্ব্বে যে সংখ্যক অস্ত্রধারী লোক রাখিয়াছিলেন তত লোক এখন রাখা অনাবশ্যক বিবেচনায়, তাহাদের অনেককে মিড়া হইতে স্থানান্তর করিয়াছিলেন। কেশববাবু এই সকল বিষয় অবগত হইয়া সেই অবকাশে মিড়ার বিপক্ষ প্রজাদিগকে দমন ও গ্রামখানা আপনার করতলে আনিবার বিলক্ষণ সুযোগ বিবেচনা করিলেন এবং সেই অভিপ্রায়ে কৃষ্ণনগরে থাকিয়া তলে তলে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগরের ওপারে মায়াকোল হইতে মিড়ার দক্ষিণে দেবগ্রাম নামক এক গ্রাম পর্য্যন্ত সমদূর তিন চারি স্থানে দুই দুইটা করিয়া বলবান অশ্ব রাখিতে

এবং বিক্রমপুর ও ঐ দেবগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে তিন-চারিশত লাঠিয়াল ও অস্ত্রধারী লোক প্রস্তুত করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। পরে নির্দ্দিষ্ট দিবসে কেশববাবু নিয়মমত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারী ভাঙ্গিলে পর মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অন্য দিন অপেক্ষা সেই দিবস অধিক বিনীতভাবে সেলাম ঠুকিয়া বিদায় হইলেন। পথে পালকি আরোহণ না করিয়া প্রধান প্রধান কয়েকজন আমলার সঙ্গে পদব্রজে বাসায় গেলেন। অবশেষে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গাত্রে একটা মেরজাই দিয়া স্কন্ধের উপরে একখানা চাদর ফেলিয়া ধীরে ধীরে গোয়াড়ির খেয়াঘাটের দিকে বায়ু সেবন করিতে গমন করিলেন এবং খেয়াঘাট হইতে নদীর ধার দিয়া ঘূর্ণী নামক কৃষ্ণনগরের এক পল্লীতে উপস্থিত হইয়া, ঠিক প্রদোষকালে সেই স্থানে এক ধীবরের নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইয়া ভদ্রলোকের দুর্গম প্রায় দুই ক্রোশ মাঠের রাস্তা হাঁটিয়া যে স্থানে তাঁহার নিমিত্ত অশ্ব প্রস্তুত ছিল, সেইখানে পৌঁছিলেন। লম্ফ দিয়া একবার অশ্বপৃষ্ঠে বসিতে পারিলে, কেশবকে আর কে পায়? তোমার আমার পক্ষে যেমন এক পোয়া আধ পোয়া রাস্তা বিচরণ করা অক্লেশের কার্য্য, অশ্বপৃষ্ঠে দশ বিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করাও কেশবের পক্ষে তদ্রূপ। সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রে রাজপুত মর্দ্দ একাকী অশ্বপৃষ্ঠে বায়ুবেগে ১৫ ক্রোশ পথ পার হইয়া বিক্রমপুর এবং দেবগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে যে সকল অস্ত্রধারী লোক তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাহারা কেশববাবুকে দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে চলিল এবং রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে মিড়াতে যাইয়া পৌঁছিল। ঈশানবাবুর কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বে কিছুই জানিতে না পারিয়া, আক্রমণের জন্য সম্যক্‌রূপে অপ্রস্তুত ছিল এবং সেকারণে কেশব তাহাদিগকে যদৃচ্ছা জয় করিতে পারিলেন। ঈশানবাবুর কাছারী ও কয়েকজন প্রধান প্রজার বাড়ী প্রথমে লুঠ করিয়া পরে তাহাতে অগ্নি লাগাইয়া জ্বালাইয়া

দিলেন এবং নিজের কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক ও একজন কর্ম্মচারীকে মিড়া গ্রামে বসাইয়া গ্রাম দখল করিলেন। এই সকল কার্য্য সমাধান্তে কেশব কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাত্রা করিয়া প্রভাত হইবার পূর্ব্বে বেলপুকুরে গঙ্গাস্নান করিলেন এবং কৃষ্ণনগর আসিয়া যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে উপস্থিত হইলেন তখনও আমলারা সেখানে আসে নাই। সেইদিন মাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনার কিছুমাত্র সংবাদ পাইলেন না; কারণ মিড়া হইতে ডাক ভিন্ন একজন পদাতিক একদিনে কৃষ্ণনগর আসিতে পারে না। পরদিবস পুলিশের রিপোর্ট ও ঈশানবাবুর দরখাস্ত পাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া কেশবকে ছয় মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারারুদ্ধ থাকিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কেশব জজসাহেবের নিকট এই বলিয়া আপীল করিল যে "মণ্ট্রেসর সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে আমি সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া পরদিবস প্রত্যূষে তাঁহার আমলাদের অগ্রে তাঁহার কুঠীতে হাজির হইয়াছিলাম; তবে কি প্রকারে আমি একরাত্রির মধ্যে বিশ ক্রোশ পথ যাইয়া কথিত অপরাধ করিয়া পুনরায় সেই রাত্রির মধ্যে বিশ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণনগর আসিতে সমর্থ হইয়াছিলাম? এমন কার্য্য মনুষ্যের অসাধ্য অতএব অভিযোগ মিথ্যা। আমাকে খালাস দিতে আজ্ঞা হউক।" জজসাহেব তাঁহার রায়ে লিখিলেন যে "কেশববাবু যে হেতুবাদ দেখাইয়াছেন, তাহা অন্য ব্যক্তির পক্ষে বলবৎ হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা কেশবের অসাধ্য কার্য্য নহে কারণ তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে কেশব একদিন কিম্বা একরাত্রির মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে অনায়াসে ৪০ ক্রোশ কেন, তাহার অধিক পথও অতিক্রম করিতে পারে; অতএব তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম বাহাল রাখিলেন।" কিন্তু কেশব সদর নিজামত আদালতে আপীল করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেশবের অত্যন্ত হাপদাপ রবরবা ছিল। সামান্য লোকে তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিত। এমনকি তাঁহার শব্দ শুনিলে তাঁহার ভৃত্য এবং প্রজাবা ভয়ে কম্পবান হইত। কেবল তাঁহার চাকব এবং প্রজা নহে, তাঁহার শত্রুপক্ষীয় লোকেও তাঁহাকে বড ভয় কবিত। তাহাব একটি দৃষ্টান্ত আমি এই স্থানে ব্যক্ত কবিব।

কেশবেব বিরুদ্ধে ঈশানবাবু কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এক অভিযোগ কবায়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কেশব-বাবুকে তাঁহাব আদালতে উপস্থিত হওয়াব নিমিত্ত আদেশ করেন। কেশববাবুও সেই আদেশমতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটেব নিকট হাজির হইয়াছিলেন। ইহা বলা অনাবশ্যক, যে ভাবতবর্ষে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন প্রচলিত হওয়াব পূর্ব্বে এখনকার ন্যায় তখন সাক্ষীব জবানবন্দী বিচাবকেব স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করার প্রথা ছিল না। সাক্ষী উপস্থিত হইলে, একজন আমলা বিচাবকেব দৃষ্টি চলিতে পাবে, কাছাবীঘবেব এমন এক স্থানে বসিয়া সাক্ষীর মূল জবানবন্দী লিখিয়া লইত এবং তাহা লেখা শেষ হইলে, বিচারকের সমক্ষে তাহা পঠিত হইলে, তাহাব উপরে বিচারক এবং দুই পক্ষের উকীল মোক্তারের কূট প্রশ্ন হইত। কেশব আদালতগৃহে প্রবেশ করার পূর্ব্বে ঈশানের দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী একজন আমলা কাছারীঘবেব মধ্যে বিচারকের সম্মুখে একস্থানে লিখিয়া লইতে-ছিল। তাহাবা বলিতেছিল, যে তাহারা স্বয়ং কেশববাবুকে ঘোড়া চড়িয়া দাঙ্গা করিতে দেখিয়াছে। এমন সময় কেশববাবু সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে সাক্ষীদ্বয় এইরূপ সাক্ষ্য দিতেছে। শুনিবামাত্র কেশব বলিয়া উঠিল যে "কি রে ব্যাটাবা কি বলিতেছিস্!" সাক্ষীরা এতক্ষণ কেশববাবুকে দেখিতে পায় নাই কিন্তু তাঁহার শব্দ শুনিয়া তাহারা ফিরিয়া কেশববাবুকে দেখিতে পাইয়া "ওমা কেশব-বাবু" বাক্য উচ্চারণ করিয়া এক লম্ফে আদালতের গৃহ হইতে বাহির

হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক্। বলিলেন যে "দেখ দেখ, ইহারা আমার সম্মুখ হইতে কেশবের ভয়ে পলায়ন করিল।"

কেশববাবুর যেমন অন্যদিকে দৌরাত্ম্য ছিল, তেমন এ দিকে বিলক্ষণ দানশীলতাও ছিল। দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে তাঁহার বেশ প্রবৃত্তি ছিল এবং সাধারণের উপকারজনক কার্য্যের নিমিত্ত তিনি মুর্শিদাবাদ ও কৃষ্ণনগর জেলায় অনেক টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন। সাঁওতাল যুদ্ধের সময় এখনকার ন্যায় ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হয় নাই। এই যুদ্ধে এক সময় গবর্ণমেণ্টের এমনও আশঙ্কা হইয়াছিল, যে সাঁওতালেরা বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ সহর আক্রমণ করিবে এবং সেই আশঙ্কায় ঐ স্থান হইতে কলিকাতায় শীঘ্র সংবাদ পৌঁছিতে পারে, তজ্জন্য কলিকাতা হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত শীঘ্র একহারা টেলিগ্রাফের তার ঝুলান আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। কিন্তু তখন গবর্ণমেণ্টের ভাণ্ডারে টেলিগ্রাফ তার ঝুলাইবার উপযুক্ত মালমসলা ছিল না এবং ধাতুময় স্তম্ভ প্রভৃতি উপকরণ সকল আবিষ্কৃত হয় নাই। বিশেষ রেলপথের অভাবে আবশ্যকীয় দ্রব্য সমস্ত বাঞ্ছিত সময়ের মধ্যে স্থানে স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ারও উপায় ছিল না। তদ্ভিন্ন এই টেলিগ্রাফ স্থায়ীরূপে সংস্থাপন করার আবশ্যক ছিল না। সাঁওতালদিগকে দমন করার কার্য্য সমাপ্ত হইলে এই টেলিগ্রাফ উঠিয়া যাইবে। সুতরাং যেন তেন প্রকারে ইহা খাড়া করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত রাখিতে পারিলেই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেই নিমিত্ত অন্য কোনপ্রকার স্থায়ী স্তম্ভ ব্যবহার না করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উচ্চ বংশখণ্ড সকল পুঁতিয়া সেইগুলার মাথার উপর তার ঝুলাইবার প্রস্তাব হইল। অন্যান্য অনেক স্থানে মূল্য দিয়া গবর্ণমেণ্টকে বংশ ক্রয় করিতে হইয়াছিল এবং কৃষ্ণনগর অঞ্চলে সেই কার্য্যের ভার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার উপরে ন্যস্ত করিলেন। এক দিবস কেশববাবুর সহিত এই সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হওয়াতে তিনি

ব্যক্ত করিলেন যে মাজিঃষ্ট্রেট সাহেব অনুমতি করিলে, তিনি নিজ ব্যয়ে খড়িয়া নদীর ওপার হইতে কৃষ্ণনগর জেলার উত্তর সীমা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে বাঁশ সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে, তাঁহার একজন কর্ম্মচারী সেই মজলিসে উপস্থিত ছিল, সে তাঁহাকে এই ঝঞ্ঝাটে হস্তক্ষেপণ করিতে নিষেধ করিল। তাহাতে কেশববাবু তাহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিলেন, যে তাঁহার নিজের কার্য্য উপস্থিত হইলে, যেমন তিনি তাঁহার প্রজা-দিগের নিকট সাহায্যের প্রত্যাশা করেন, সেইরূপ তাঁহার রাজাকেও তাঁহার সাহায্য করা উচিত, না করিলে তাঁহাকে ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে। মহতের মহৎ উক্তি! ইহা বলা অনাবশ্যক, যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অতি আহ্লাদেব সহিত কেশববাবুর সাহায্য গ্রহণ করিলেন।

ইহাব কিছুকাল পরে কেশববাবুর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্রেরা খুব সমারোহের সহিত তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিকে যেমন ধুমধাম, পক্ষান্তরে সেই শ্রাদ্ধে তেমন বিভ্রাটও ঘটিয়াছিল। কেশববাবুর মৃত্যু হওয়াতে সকলে বিবেচনা করিয়াছিল যে এখন বাবুদিগের আত্মকলহ মিটিয়া যাইবে এবং এমনও জনরব উঠিয়াছিল, যে কেশবের মরণে ঈশানবাবু বিস্তর শোক ও খেদ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কেশববাবুর অভাবে তিনি আব কাহার সহিত বিবাদ করিবেন? তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি আর কে আছে? কিন্তু রায়বাবুদিগের মনে মনে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব এমন দৃঢ় হইয়া রহিয়াছিল, যে তাহা আর কিছুতেই বিলুপ্ত হইল না। কেশব-বাবুর শ্রাদ্ধের দিবস কি এক কথা লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় যে বিবাদ-অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তাহা আর লাঠিযুদ্ধে মিটিল না। অবশেষে দুইপক্ষে বন্দুক বাহির করিয়া পরস্পরের উপরে গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ কবিলেন। যদিও তাহাতে কাহারও প্রাণ নষ্ট হয় নাই, তথাপি অনেকে গুরুতর আঘাতিত হইয়াছিল। ইহাকেই বলে শ্রাদ্ধ গড়ান। যুদ্ধের পরে উভয় পক্ষের জ্ঞান জন্মিল এবং সকলে মনে

মনে ভীত হইলেন। বুঝিলেন মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া রাজার কানে এই বিষয় উঠাইলে, উভয় পক্ষের নিস্তার নাই; গুরুতর দণ্ড পাইতে হইবে। অতএব দুই পক্ষই পরামর্শ করিয়া একবাক্যে নালিশ করিতে ক্ষান্ত রহিলেন। কিন্তু বাবুরা ক্ষান্ত থাকিলে কি হয়, ধর্ম্মের ঢোল বাজিতে ক্ষান্ত থাকে না। ক্রমশঃ এই যুদ্ধের আভাস চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং অবশেষে মাজিষ্ট্রেটের কর্ণে উঠিল। তখন এ, জে, এলিয়ট নামক একজন যুবা সিবিলিয়ান কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট। তিনি কমিসনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিলেন এবং কমিসনর সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই বিষয়ের নিগূঢ় অনুসন্ধান করিয়া অপরাধী ব্যক্তিদিগকে দৃঢ়রূপে দণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎক্ষণাৎ কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নাকাশীপাড়ায় যাইয়া এই বিষয়ের তদন্ত করিতে হুকুম দিলেন। কিন্তু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট একপক্ষকাল ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে এলিয়ট সাহেব আমাকে সেই কার্য্যে ব্রতী করিয়া নাকাশীপাড়ায় পাঠাইয়া দিলেন। সেই তদন্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলে চরমে আমার যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা আর এক প্রবন্ধে বিবৃত করিব।

এই কেশববাবুকেই কৃষ্ণনগর অঞ্চলের লোকে "খড়ে পারের রাবণ রাজা" বলিয়া অভিহিত করিত।

আমরা মার খাই

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি, যে নাকাশীপাড়ার কেশবচন্দ্র রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধের দিবসে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে উভয় পক্ষে বন্দুকের যুদ্ধ হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সংবাদ অবগত হইয়া কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে সেই বিষয়ের তদন্তের জন্য ঘটনাক্ষেত্রে প্রেরণ করেন; কিন্তু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রায় ১৫দিবস পর্য্যন্ত সেই স্থানে থাকিয়া, কোনও কথা আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হওয়াতে, বিশেষ মহকুমা পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল তিনি স্থানান্তর থাকিতে পারিবেন না বলিয়া, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে কাটোয়ায় প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়া, তাঁহার পরিবর্ত্তে আমাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

এই স্থানে আমার বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দারোগাদিগের ন্যায় আমি কোনও মোকদ্দমার তদন্তের জন্য প্রেরিত হইলে, ঘটনার স্থলে উপস্থিত হইয়া অধিবাসীদিগের উপরে 'ধর মার পাকড়' করিতাম না। পূর্ব্ব দারোগারা অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ কার্য্য করিতেন, এমন নহে। অধিক সময়ে তাঁহারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের হুকুমের ভাবে সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা কোনও পুলিশ আমলার উপরে কোনও কার্য্যভার অর্পণ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ আদেশ করিতেন যে "দারোগা তিন (কিম্বা মোকদ্দমার গুরুত্ব বুঝিয়া সাত) দিবসের মধ্যে আসামি হাজির কিম্বা মোকদ্দমার কেনারা করে, যদি সে এই সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য করিতে অকৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে

আপনাকে সাস্‌পেণ্ড (কিম্বা কোনও স্থলে পদচ্যুত) বিবেচনা করিয়া, নায়েব দারোগার হস্তে শীলমোহর অর্পণ করিয়া, জবাবদিহির নিমিত্ত হুজুরে হাজির হয়।" সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ কড়া হুকুম দেখিয়া পুলিশ আমলারা আপনাদের চাকরী রক্ষার জন্য গ্রামে পৌঁছিয়া চৌকিদার, মণ্ডল মাতব্বর এবং জমিদার প্রভৃতির উপরে যারপরনাই অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিত। মুসলমান দারোগা হিন্দুর গ্রামে যাইয়া প্রকাশ্যরূপে হিন্দুর অখাদ্য জীব সকল জবাই এবং হিন্দুর অস্পর্শীয় দ্রব্য সকল চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিত, যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইত, তাহাকে ধরিয়া নানারূপ কষ্ট দিত এবং চৌকিদার ও মণ্ডলকে মনের সাধ মিটাইয়া প্রহার করিত। এদেশে এমনও সময় ছিল, যখন পুলিশের আগমনে গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়িত। গ্রামবাসীরা পুলিশের অত্যাচারের ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত এবং কখনও কখনও হাট-বাজার বন্ধ হইয়া যাইত। পুলিশের এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে জমিদার কিম্বা অধিবাসীরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রতিবাদ করিলে তিনি তাহাতে প্রায়ই কর্ণপাত করিতেন না, অধিক হইলে দারোগার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিতেন এবং দারোগা সাহেবকে এই বলিয়া প্রবোধ দিত, যে এই প্রণালীতে কার্য্য না করিলে, মোকদ্দমায় কৃতকার্য্য হওয়া, তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে। কিন্তু পুলিশ আমলার অত্যাচারে প্রায়ই তাহাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল উৎপত্তি হইত. কারণ ইহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে, যে গ্রামস্থ লোকের আন্তরিক সাহায্য ভিন্ন পুলিশ আমলা কোন কথাই জানিতে পারে না। সে স্থলে তাহাদিগকে যতদূর মিত্রভাবে রাখা যাইতে পারে ততই পুলিশ আমলার মঙ্গলকর কার্য্য হইত; কিন্তু দারোগারা তাহার বিরুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেক সময় বিঘ্ন উপস্থিত করিত। আমিও দারোগা হইয়া অনভিজ্ঞতাবশত, প্রথমাবস্থায় অধীন কর্ম্মচারীদিগের কুপরামর্শে উপরিউক্তরূপে কার্য্য

করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল না দেখিয়া, আমার চক্ষু ফুটিল এবং উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলাম। যত অল্প সংখ্যায় অধীন কর্ম্মচারীগণকে সঙ্গে লইয়া গেলে কার্য্য চলিতে পারে, তাহাই লইয়া নিস্তব্ধে গ্রামে উপস্থিত হইতাম এবং একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে বাসা করিয়া গ্রামের সমস্ত লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া কাল কাটাইতাম। প্রথম কয়েক দিবস কোনও ব্যক্তির নিকট মোকদ্দমার কিছুমাত্র উল্লেখ করিতাম না। যে দুই-একজন বরকন্দাজ সঙ্গে থাকিত তাহাদিগকে গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিতাম এবং তাহাদিগকে পুলিশের চাপরাশ এবং উষ্ণীষ পরিধান করিতে এবং অধিবাসীদিগের প্রতি কোনওপ্রকার অসদ্ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া দিতাম। ফলে, গ্রামে যাইয়া পুলিশ আমলার ন্যায় কিছুমাত্র ব্যবহার করিতাম না। গ্রামের কোনও অধিবাসীর একজন আগত কুটুম্বের ভাবে কার্য্য করিতাম। এইরূপ ব্যবহার করাতে আমার উদ্দেশ্যসাধনের কোনও ব্যাঘাত হইত না। ফলে আমার মনে পড়ে না যে কেবল একটি মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে, আমায় কখনও অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব নাকাশীপাড়ার এই মোকদ্দমা তদন্ত করার নিমিত্ত কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে নিযুক্ত করিয়া, নাকাশীপাড়াতে জমিদারেরা উপস্থিত থাকিলে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইবার আশঙ্কায়, তাঁহাদিগের সকলকে নাকাশীপাড়া হইতে স্থানান্তর করার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণনগরে নিজের কাছারীতে হাজির রাখিয়াছিলেন এবং আমাকে নাকাশীপাড়ায় পাঠাইবার সময়ও, সেই হুকুম বলবৎ রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই ঐ জমিদার বাবুদিগের সহিত আমার উত্তম আলাপ পরিচয় ছিল, বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রমোহনবাবুর পুত্রদিগের সহিত আমার বন্ধুত্বই ছিল। এইরূপ সম্প্রীতি হওয়ার কারণ

এই যে, কোতওয়ালী থানার দক্ষিণ অতি নিকটে কৃষ্ণনগর সহরে নাকাশীপাড়ার জমিদার বাবুদিগের বাসাবাড়ী ছিল, সুতরাং সর্ব্বদা বাবুদিগের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার গতিকে, আমার সহিত তাঁহাদের অনেকের সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। আমার উপরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নাকাশীপাড়ার মোকদ্দমার তদন্তের ভার অর্পণ করিয়াছেন শুনিয়া, বাবুদিগের মধ্যে আমার বন্ধুরা অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইলেন এবং আমি নাকাশীপাড়ায় যাইয়া তথায় যতদিন অবস্থিতি করিব, আমার আহারাদির কোন ক্লেশ না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চন্দ্রমোহনবাবুর পুত্রেরা তাঁহাদের নাকাশীপাড়ার কর্ম্মচারীগণের প্রতি আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। চন্দ্রমোহনবাবুর পুত্রদের এইরূপ অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহারের ফলে, আমার বিস্তর উপকার হইয়াছিল, নচেৎ কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় আমাকে অনেক কষ্টভোগ করিতে হইত।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম পাইয়া আমি দুই-একদিবসের মধ্যে কৃষ্ণনগর হইতে মধ্যাহ্নের পরে যাত্রা করিয়া রাত্রি ৮।৯ ঘণ্টার সময় নাকাশীপাড়ায় পৌঁছিলাম। দেখিলাম, যে এক মাঠের মধ্যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের তাম্বু স্থাপিত রহিয়াছে। অন্ধকার, লোকজনের কোন শব্দ নাই; কেবল একটি ভাঙ্গা দেশী লাণ্ঠানের মধ্যে একটি মাটির প্রদীপ টিম টিম করিয়া জ্বালিতেছে এবং তাহার সম্মুখে একখানা কেদারা চৌকীর উপরে, একজন আধবুড়া সাহেব উপবিষ্ট আছেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, আমার পরিচয় দিয়া তাঁহার হস্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্র দিলাম। বহু কষ্টে সেই প্রদীপের আলোকে তিনি পত্রখানা পাঠ করিয়া চৌকী হইতে উঠিয়া, আমার মাথায় হস্ত দিয়া বলিলেন যে "বাবু পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি আমাকে যে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে, তাহা তোমাকে বলিয়া উঠিতে পারি না। দেখ আমার অবস্থা কি শোচনীয়, এই স্থানের জমিদার রাস্কেলেরা একযোট হইয়া আমাকে প্রাণে মারিবার

রকম করিয়া তুলিয়াছে। অদ্য ৮ দিবস ধরিয়া আমার আহারের যথোচিত দ্রব্যাদি যুটাইতে পারি না। মুর্গী কিম্বা অন্যপ্রকার মাংস পাওয়া কথা দূরে থাকুক, চা খাইবার জন্য এক ছটাক দুগ্ধ কিম্বা প্রদীপ জ্বালিবার জন্য একটু তৈল পাইবার উপায় নাই। দোকান-দারেরা আমার লোকজনকে কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে না। বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিতে সাহস করে না, কারণ তাহা হইলে তাহারা জানে যে আমি তাহাদিগকে দণ্ড করিব কিন্তু দ্রব্য চাহিলে তাহা তাহাদের দোকানে নাই বলিয়া, আমার লোককে প্রতারণা করে। কল্য সন্ধ্যার পরে তৈল অভাবে বাতি জ্বালাইতে না পারিয়া, সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে কাটাইয়া ছিলাম, অদ্য আমার চাপরাশি একজনের নিকট ভিক্ষা করিয়া একটু তৈল আনিয়াছে, তাহাতেই এই প্রদীপটি এতক্ষণ জ্বলিতেছে। যে মোকদ্দমা তদন্ত করিতে আসিয়াছিলাম, তাহা গোপন করার জন্য জমিদারদিগের দুই পক্ষেরই সমান চেষ্টা এবং এখানকার লোকে কেহ তাহাদের ভয়ে কোনও কথা প্রকাশ করিতে চাহে না। একে ত এই অঞ্চলের অধিবাসীরা লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে যদিও দুই-একজন ইতর লোকের সহিত দেখা হয়, তাহা হইলে তাহারা বলে যে, তাহারা কিছুই অবগত নহে। এক্ষণে এলিয়ট সাহেব তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি যাহা জান তাহা কর, আমি চলিলাম; আমি আর এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত এখানে বিলম্ব করিব না।" বলিয়া তিনি বহু কষ্টে কাহার সংগ্রহ করিয়া কাটোয়া অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হিউএট সাহেবের দুরবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া, আমি অত্যন্ত ভীত হইলাম। ভাবিলাম যেস্থলে, একজন সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে এইরূপ পরাস্ত হইতে হইল, তখন আমি একজন সামান্য বাঙ্গালী দারোগা আর অধিক কি করিতে পারিব? যাহা হউক, সেই রাত্রে আমি চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ীতে অবস্থিতি করিলাম এবং চিন্তা করিয়া দেখিলাম, যে নিজ নাকাশীপাড়া গ্রামে

থাকিয়া তদন্তের সুবিধা করিতে পারিব না। হিউএট সাহেবের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া কৃষ্ণনগর প্রত্যাগমন করিতে হইবে। নিকটে যে গ্রামে নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের অধিকার নাই, এমন স্থানে থাকিতে পারিলে সুবিধা হওয়া সম্ভাবনা; কিন্তু তেমন স্থান কোথায়? অনুসন্ধানে জানিলাম, যে নাকাশীপাড়ার অনতিদূরে বিল্বগ্রাম নামক একটি গ্রাম আছে, তাহাতে বাবুদিগের অধিকার নাই কিন্তু অধিবাসীদিগের উপরে কিছু প্রভুত্ব না আছে, এমন নয়। এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাড়ী এবং ইহাতে অনেক ভদ্র ব্রাহ্মণের বাস। অতএব এই স্থানটি মন্দের ভাল বিবেচনা করিয়া, তথায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে স্থির করিলাম এবং পরদিবস প্রাতে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একজন সম্পর্কীয় ব্যক্তির বহির্বাড়ীতে যাইয়া বাসা সংস্থাপন করিলাম। চন্দ্রমোহনবাবুর পুত্রদিগের কল্যাণে হিউএট সাহেবের ন্যায় আহারাদি সম্বন্ধে আমাকে কোনও কষ্ট পাইতে হইল না; আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই আমরা ইচ্ছামত পাইতাম।

এইরূপে বিল্বগ্রামে থাকিয়া আহারের সময় আহার করি এবং নিদ্রার সময় নিদ্রা যাই এবং দুইবেলা নাকাশীপাড়া যাইয়া বাবুদিগের কর্ম্মচারীদিগের সহিত আলাপ করি এবং মধ্যে মধ্যে বন্দুক হস্তে করিয়া এগ্রামে ওগ্রামে ঘুঘু প্রভৃতি পক্ষী মারিয়া বেড়াই। পক্ষী শিকার করা কেবল উপলক্ষ মাত্র; নির্জ্জনে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহার মুখে মোকদ্দমার কোন কথা আবিষ্কার করিতে পারি কি না, তাহারই চেষ্টা করি। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল। দেখিলাম যে আমরা কে কি করি, তাহার অনুসন্ধানের জন্য বাবুদিগের গুপ্তচর নিয়ত আমাদের অদৃশ্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। আমি বিল্বগ্রাম হইতে বাহির হইলেই একজন লোক ছদ্মবেশে আমার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইত। কোন কর্ম্মই আমি ঐ সকল চরকে গোপন করিয়া করিতে পারিতাম না এবং যদিও অকস্মাৎ দুই এক ব্যক্তির

সহিত নির্জ্জনে দেখা হইত, তথাপি তাহাতেও কিছু ফল হইত না ; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সকলে একভাবে উত্তর করিত যে তাহারা কিছু দেখে নাই, শুনে নাই এবং জানে না। অধিক ব্যস্ত করিলেও, তাহারা এইমাত্র বলিত, "যে আমাকে মাপ করুন, ও সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, কারণ কোন্ কথা বলিতে কোন্ কথা বলিয়া অবশেষে বাবুদিগের কোপে পড়িব, সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে আমাব এদেশে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিবে।" আমার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের বেহারারা ছিল কিন্তু কখনও আবশ্যক হইলে, সেই স্থানের কাহার আনিয়াও কর্ম্ম চালাইতাম। এক দিবস এক স্থানে যাইবার সময় স্থানীয় একজন বেহারাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর কারল যে "আপনি যদি আমাদিগকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমরা আর আপনার ডাকে আসিব না এবং আপনার পালকিও স্কন্ধে করিব না।" নাকাশীপাড়ার জমিদার-দিগের একদলের দর্পে রক্ষা নাই, তাহাতে তাহারা দুইদল একত্র হইয়া যোটবদ্ধ হইলে যে কি প্রমাদ এবং তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা যে পুলিশের পক্ষে কত দুরূহ কার্য্য, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। আমি এই সকল বিষয় এলিয়ট সাহেবকে লিখিয়া অবগত করাতে তাঁহার আরও জেদ বাড়িল। আমাকে নিরুৎসাহী হইতে নিষেধ করিয়া যতকালে এবং যে প্রকারে হয় এই ঘটনার যথার্থ আবিষ্কার করিতে লিখিলেন এবং সেই সময় অগ্রদ্বীপ থানার দারোগা-পদ খালি হওয়াতে, তিনি আমার অনুরোধমতে কোতওয়ালী থানার নায়েব দারোগা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমার নিকট থাকিয়া তাহার নিজ থানার কর্ম্ম সম্পাদন করিতে এবং তদতিরিক্ত আমার সাহায্য করিবার নিমিত্ত, আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

এই স্থানে বৈদ্যনাথের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা আমার আবশ্যক, কারণ ইনিই এই মোকদ্দমার চরম অবস্থা পর্য্যন্ত আমার সহিত ব্রতী

ছিলেন, এবং তাহাতে আমাদের যে কষ্ট পাইতে হয়, তাহার অধিক ভাগ বৈদ্যনাথেরই ভোগ করিতে হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ উলা গ্রামের দেওয়ান মুখোপাধ্যায়দিগের বংশোদ্ভব; কৃষ্ণনগরের জজ্ আদালতের উকীল রামগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ইনি ইংরাজী জানিতেন না, কিন্তু ইঁহার পুলিশ আমলার উপযুক্ত প্রখর বুদ্ধি ছিল। বৈদ্যনাথ গৌরবর্ণ, দেখিতে সুন্দর এবং তাঁহার বংশের অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় বলবান পুরুষ ছিলেন। বয়সে আমার অপেক্ষা বৈদ্যনাথ অল্পবয়স্ক ছিল। সেই জন্য আমাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিত। বৈদ্যনাথ চরমে নূতন পুলিসের ডিটেকটিব বিভাগের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ আর এইক্ষণে নাই, পরলোকগমন করিয়াছে।

বৈদ্যনাথ আসিয়া আমার সহিত যোগ দেওয়াতে আমার উৎসাহ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল কিন্তু আমরা দুইজন প্রায় দুইমাস নাড়াচাড়া করিয়া ধরিয়া কিছুমাত্র করিতে পারিলাম না। তথাপি এলিয়ট সাহেবের উৎসাহভঙ্গ হইল না। তিনি প্রত্যেক পত্রে আমাকে সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিতে আদেশ করিতেন এবং এক পত্রে লিখিলেন যে "আমি তোমাকে এক বৎসর পর্য্যন্ত নাকাশী-পাড়ায় রাখিয়া দেখিব, তথাপি কি কিছু করিতে পারিবে না? লোকে বলিয়া থাকে যে "লেগে থাকিলে মেগে খায় না"। এই কথা নিতান্ত সত্য বটে, কারণ আমরা অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম যে গোটপাড়ার নিকটে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে পাটুলী নামক একখানি গ্রাম আছে তাহাতে কয়েক ঘর কীর্ত্তনকারী ব্রাহ্মণের বাস। তাহারা ধনাঢ্য লোকের শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং তাহাদের কয়েকজন কীর্ত্তনীয়া কেশববাবুর শ্রাদ্ধে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিল এবং আদ্যোপান্ত সকল অবস্থা অবগত আছে। আমরা এমনও শুনিলাম যে ঐ সকল কীর্ত্তনীয়াদের দুই-এক-জনের শরীরে বন্দুকের গুলি লাগিয়া আঘাতিত হইয়াছিল। পাটুলী

গ্রাম নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের অধিকারভুক্ত নহে এবং পাটুলীর একজন স্বতন্ত্র ধনাঢ্য জমিদার আছে, কিন্তু ঐ গ্রাম আমাদের কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত নহে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। অতএব ভিন্ন জেলার পুলিশের সহায়তা না লইয়া তাহাতে কার্য্য করিতে গেলে, নানাপ্রকার গোলযোগ উপ.স্থিত হইবার সম্ভাবনা। বিশেষ কীর্ত্তনীয়ারা যদি একবার জানিতে পাবে, যে আমরা তাহাদিগকে ধবিবার উদ্যোগে আছি, তাহা হইলে তাহাদিগের দেখা পাওয়া কঠিন হইবে, এবং নাকাশীপাড়ার বাবুরাও তাহাদিগের বশীভূত এবং স্থানান্তর করিয়া ফেলিবে। এই আশঙ্কায় আমরা পাটুলী যাইবাব পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই সংবাদ জানাইলাম। কয়েক দিবস পরে তিনি আমাকে লিখিলেন, যে তিনি আমাব পত্র পাইয়া বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে লেখাতে তিনি স্বয়ং আসিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অতএব এলিয়ট সাহেব একটি দিন অবধারণ করিয়া আমাকে লিখিলেন যে সেই দিবস তিনি ও বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট পাটুলীর অনতিদূর দক্ষিণে সাবী সাহেবের এক নীলকুঠীতে উপস্থিত থাকিবেন এবং আমাদিগকে সেই তারিখে পাটুলী যাইয়া কীর্ত্তনীয়াদিগকে সংগ্রহ করিতে এবং তাহাদিগকে সেই কুঠীতে সংবাদ দিতে আদেশ করিলেন।

অবধারিত দিবসের রাত্রি থাকিতে গোটপাড়ায় গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার উপলক্ষে সঙ্গে চারিজন বরকন্দাজ লইয়া আমি এবং বৈদ্যনাথ বিল্বগ্রাম হইতে নিস্তব্ধে বাহির হইয়া বেলা ৮।৯ ঘণ্টার সময় পাটুলী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। পাটুলীর বাজার খোলায় পালকি বেহারা ও বরকন্দাজদিগকে বাখিয়া আমরা দুইজন দারোগা কীর্ত্তনীয়ারা যেস্থানে বাস করে সেই স্থানে ছদ্মবেশে গমন করিলাম। ভাগীরথী নদী পার হওয়ার পরেই আমরা বরকন্দাজদিগের চাপরাশ ও উষ্ণীষ গোপন করিতে আদেশ করিয়াছিলাম যেন পাটুলীর বাজারে উপস্থিত হইলে কেহ আমাদিগকে পুলিশ আমলা বলিয়া বুঝিতে

না পারে। কীর্ত্তনীয়া ঠাকুরদের আলয়ে যাইয়া বলিলাম, "দেওয়ান মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ী হইতে আসিতেছি, সেখানে এবার সমারোহ পূর্ব্বক দোল-যাত্রা হইবে। অতএব পাটুলীর কীর্ত্তনীয়া ঠাকুরদিগের প্রশংসা শুনিয়া আমরা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে ও বায়না দিতে আসিয়াছি।" দোঁলের বায়নার কথা শুনিয়া সকল কীর্ত্তনীয়ারাই স্ব স্ব গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া যৎপরোনাস্তি আদর অভ্যর্থনা করিয়া আমাদের দুইজনকে তাহাদের বাহির বাড়ীতে বসাইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল। আমি জানিতাম, যে কেশববাবুর শ্রাদ্ধে অনেক গরদের ধুতি বিতরিত হইয়াছিল। কীর্ত্তনীয়াদের মধ্যে একজনের পরিধানে একখানা গরদের ধুতি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এত দেখি কেশববাবুর শ্রাদ্ধের গরদের ধুতি, আপনারা সেই কাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন নাকি?" কীর্ত্তনীয়ারা সকলে একত্র উত্তর করিল যে "হা সরকার মহাশয় গরদ পাইয়াছি বটে, কিন্তু প্রাণ লইয়া আমবা যে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলাম, সে কেবল আমাদের পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যবল ও কৃষ্ণের ইচ্ছা।" তাহার পর তাহাদের মধ্যে একজনের বুকের নামাবলী তুলিয়া একটা চিহ্ন দেখাইয়া বলিল যে "এই দেখুন সেদিনের দুর্গতি।" আমি যেন কিছুই জানি না,—এইভাবে জিজ্ঞাসা কবিলাম, যে "শ্রাদ্ধে আবার দুর্গতি কি?" উত্তর "দুর্গতির কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতে আছে, সরকার মহাশয় তুমি কি কিছুই শুন নাই যে, সেই শ্রাদ্ধে বন্দুক দিয়া গুলি মারামারি হইয়াছিল।" প্রশ্ন "সত্য নাকি, যথার্থ কি এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল, আপনারা কি তাহা চক্ষে দেখিয়াছেন?" উত্তর "হাঁ আমরা সকলেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম এবং গুলি মারামারি চক্ষে দেখিয়াছি।" প্রশ্ন "আপনারা সেই কাণ্ডকারখানা দেখিয়া কি করিলেন?" উত্তর "কি আর করিব? ইহার গায়ে গুলি লাগিবামাত্র, আমরা যে যেমতে পারিলাম পলাইয়া বাড়ী আসিলাম এবং তাহার দুই-তিন

দিবস পরে, নাকাশীপাড়ায় যাইয়া বিদায় লইয়া আসিলাম।" প্রশ্ন "এত দেখি অতি আশ্চর্য্য কারখানা! আর কখনও এমন শুনি নাই, আপনাদের যে সকলের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল তাহাই যথেষ্ট ভাগ্য বলিতে হইবে। সে যাহা হউক, রাজপুতের কাণ্ড লইয়া আমাদের মাথা-ব্যথা করিবার আবশ্যক নাই, এক্ষণে আমাদের সঙ্গে চলুন, বাজারখোলায় আমাদের বাসাতে আর একজন কর্ত্তা আছেন, তাঁহার সহিত আপনাদের কথাবার্ত্তা হইলে আপনারা বায়না পাইতে পারিবেন।" এইরূপ কৌশল করিয়া আমরা তাহাদের ৮।১০ জনকে কথা কহিতে কহিতে, বাজারখোলায় আনিয়া আমাদের বাসাঘরের মধ্যে বসাইয়া ব্যক্ত করিলাম যে, "দোলের বায়না দেওয়ার কথা মিথ্যা, আমরা কৃষ্ণনগর জেলার পুলিশ-দারোগা, আপনাদের জবানবন্দী লওয়ার জন্য আপনাদিগকে এখানে আনিয়াছি ; অতএব যে পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব এইখানে আগমন না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আপনাদিগকে এখানে থাকিতে হইবে।" আমার এই কথা শুনিয়া কীর্ত্তনীয়া ঠাকুরদের প্লীহা চম্‌কিয়া গেল, সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কহিলাম যে, আপনাদের কিছুই চিন্তা নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেব অতি নিকটেই আছেন তিনি আসিয়া আপনাদের জবানবন্দী লিখিয়া লইলেই, আপনারা স্ব স্ব গৃহে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন।" উত্তর "আর মশাই পরমানন্দ, আপনি যে পরমানন্দ দেখাইলেন, তাহা আর মরিলেও ভুলিব না, আমাদের কোন পুরুষে যাহা কখনও না হইয়াছিল, তাহা আজ আপনাকে দিয়া হইল।" অর্থাৎ সাক্ষী দেওয়া। এদিকে আমি কীর্ত্তনীয়াদিগকে লইয়া বাজারখোলায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পথ হইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ দেওয়ার নিমিত্ত গোপনে একজন বরকন্দাজকে সেই নীলকুঠীতে পাঠাইয়াছিলাম। সাক্ষীরা বাজারে আসিবার প্রায় ৪ ঘণ্টার পরে অর্থাৎ বেলা দুই পহরে দুই ঘণ্টার সময় ঝড় ও শিলাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। সেই শিলা ও বৃষ্টি মাথায় করিয়া

এলিয়ট সাহেব এক অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমাদের একখানা পালকির ছাদে মেজ করিয়া তাহার উপরে কাগজ রাখিয়া উপস্থিত কীর্ত্তনীয়াদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিলেন। পরে তাহাদিগেব প্রত্যেকের নিকট কৃষ্ণনগরে তলব-মতে হাজির হওয়ার নিমিত্ত, পাঁচ পাঁচ শত টাকার মুচলেকা লইয়া বিদায় হইলেন। আমরাও মহাআনন্দে বিল্বগ্রাম প্রত্যাগমন করিলাম।

আমি যদি এইস্থানে মোকদ্দমার তদন্ত সমাপ্ত করিয়া চলিয়া যাইতাম, তাহা হইলে সকল কুল রক্ষা হইত। অভাবনীয় প্রমাণও সংগৃহীত হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবও সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমাদেরও কোন বিঘ্ন হইত না। কিন্তু আমাদিগের স্কন্ধে দুষ্ট সরস্বতী আসিয়া ভর করিলেন। আমরা এক বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া নাচিয়া উঠিলাম, মনে করিলাম যে আমাদেব অসাধ্য কাজ নাই, চেষ্টা করিলে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিব এবং বাবুদের খালাসের পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দিব। সত্যকথা বলিতে কি, পরিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বৈদ্যনাথেরই বিশেষ উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল। সে নূতন দারোগা হইয়া এই মোকদ্দমার তদন্ত ভালরূপে সমাপ্ত করিতে পারিলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং যদিও আমার মনে মনে শীঘ্র কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিবার সম্পূর্ণ বাসনা হইয়াছিল, তথাপি বৈদ্যনাথের উৎসাহ দেখিয়া আমি লজ্জায় আর তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বৈদ্যনাথ এক দিবস কোথা হইতে সংবাদ আনিল, যে নাকাশীপাড়ার নিকট পলাশডাঙ্গা নামক গ্রামে বাবুদিগের সংসারের দুইজন পুরাতন কায়স্থ কর্ম্মচারী আছে; যাহারা অতিশয় ধার্ম্মিক এবং প্রাণান্তে মিথ্যা কথা কহে না। তাহাদের নাম আমি এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছি, বোধ হয় তাহাদিগের "সরকার" পদবী ছিল, সে যাহা হউক এই

প্রবন্ধে আমি তাহাদিগকে সবকার বলিয়াই উল্লেখ করিব। বৈদ্যনাথের বিশ্বাস যে এই সবকাব দুইজনকে কোনওপ্রকারে উপস্থিত কবিতে পাবিলে, মোকদ্দমাব আদ্যোপান্ত যথার্থ বিবরণ আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু আমাদিগেব নাকাশীপাড়ায় আগমনেব পব পর্য্যন্ত এই দুই ব্যক্তি স্বীয স্বীয় গৃহমধ্যে গোপনভাবে বহিযাছিল। পূর্ব্বকাব ন্যায় তাহাবা এক্ষণ প্রত্যহ গঙ্গাস্নান কবিতে যায না এবং বহিবাড়ীতেও ক্কচিৎ আসে। এমন অবস্থায় খানাতল্লাসী ভিন্ন তাহাদিগকে ধবিবাব আব কোন উপায় না দেখিয়া বৈদ্যনাথ ও তাহাব সঙ্গে সঙ্গে আমি একত্র হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবেব নিকট বিপোর্ট কবিলাম। দেখিলাম, যে এলিযট সাহেবও বৈদ্যনাথ হইতে বড কম উদ্যমশীল নহেন। কীর্ত্তনীয়াদিগেব প্রদত্ত প্রমাণে তাহাব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই, আবও প্রমাণ পাওয়ার অভিলাষী ছিলেন। আমাদেব উপবিউক্ত বিপোর্টের উত্তবে তিনি উল্লেখিত মর্ম্ম অনুকবণ কবিয়া, খানাতল্লাসীব দ্বাবা সবকাবদিগকে হাজিব কবাব হুকুমযুক্ত এক পবওয়ানা আমাদিগেব প্রতি প্রচাব কবিলেন। এই হুকুমটি অতি অন্যায় হুকুম এবং আইন-বিরুদ্ধ হইয়াছিল। তাহা বোধ হয় এলিয়ট সাহেব বুঝিতে পাবেন নাই, বুঝিলে কখনই ঐরূপ হুকুম দিতেন না। আমবা পুলিশ আমলা, আপন নিষ্কৃতি এবং অভীষ্টসিদ্ধিব নিমিত্ত খানাতল্লাসীর দ্বাবা সাক্ষী ধরিবার প্রার্থনা কবিতে পারি এবং তাহাতে কেহ আমাদেব প্রতি দোষাবোপ করিতে পারে না; কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পক্ষে তদনুযায়ী আদেশ প্রদান কবা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য বলিতে হইবে। কিন্তু সেকালে আইনে অধিকার প্রায় সকলেরই সমান ছিল এবং মাজিষ্ট্রেট এলিয়ট সাহেবের এই হুকুমটি অন্যায় বলিয়া কাহারও অনুধাবন হয় নাই। সে যাহা হউক, এতদিন আমরা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া বসিয়াছিলাম দেখিয়া নাকাশীপাড়ার বাবুরা হর্ষযুক্ত এবং নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু যে দিবস

আমরা পাটুলীর কীর্ত্তনীয়াদিগকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত করিলাম সেই দিবস হইতে তাঁহাদেব মনে আশঙ্কার উদয় হইল এবং তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে ইহাদিগকে সেই অঞ্চল হইতে দূরীকৃত করিতে না পাবিলে, আরও না জানি, কোন্ সর্ব্বনাশ এবং কোন্ স্থান হইতে আর কি প্রমাণ সংগ্রহ করিবে। এইজন্য তাঁহারা, বিশেষতঃ সর্ব্ব ও ঈশানবাবুদ্বয় আমাদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া যাহাতে আমরা নাকাশীপাড়া পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু কর্ম্মচারীদিগের চেষ্টা বৃথা হওয়াতে, সর্ব্ববাবু নাকি তাহাদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে "যদি অন্যরূপে ফল না হয়, তাহা হইলে দারোগাদিগকে উত্তম মধ্যম ফল দিয়া বিদায় করিয়া দিবে।" এই হুকুম পাইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত বাবুদিগের কর্ম্মচারীরা অবসব অনুসন্ধান কবিতেছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা পাইয়া উঠে নাই। খানাতল্লাসীব পবওয়ানা পাওয়ার পবে আমরাই আমাদের কার্য্য দ্বারা সেই সুযোগ ঘটাইয়া দিলাম। ঐ পরওয়ানা লইয়া একদিবস অনেক রাত্রি থাকিতে আমি এবং বৈদ্যনাথ পালকি করিয়া আমাদের সকল বরকন্দাজগুলিকে সঙ্গে লইয়া পলাশডাঙ্গায় যাইয়া সরকারদিগের বাড়ী ঘের দিলাম। সূর্য্যোদয় পরে যথারীতি মতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু সাক্ষীদিগের দেখা পাইলাম না। এই কার্য্যে আমাদিগের প্রায় দুইঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। খানাতল্লাসীর পরে আমরা অন্দরবাড়ী হইতে বাহির হইয়া বাহির বাড়ীর দুর্গামণ্ডপের সম্মুখস্থিত দাঁড়ঘরাতে আসিয়া উপবিষ্ট হইলাম এবং নাকাশীপাড়া হইতে বাবুদিগের একজন কর্ম্মচারী আনাইয়া, তাহার সম্মুখে, আমরা খানাতল্লাসী করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গৃহস্থিত কোন দ্রব্য অপচয় কিম্বা অপহরণ করি নাই, তদ্বিষয়ে একখানা রসিদ সে গৃহের একটি লোকের দ্বারা লিখাইয়া লইয়া, বিষগ্রাম

প্রত্যাগমন করার নিমিত্ত যাত্রা করিলাম। আমাদের দুইজনের দুইখানা পালকি পাশাপাশি এবং তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রে বরকন্দাজেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতেছিল। আমার একটি দু-নলী বন্দুক তুলসীসিংহ নামক একজন বৃদ্ধ বরকন্দাজের হস্তে এবং পালকিমধ্যে একটা একনলী পিস্তল ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, সে সময় রিবল্বর পিস্তল আবিষ্কৃত হয় নাই তখন আমার হস্তে একটা রিবল্বর থাকিলে বোধ হয় ঘটনার মূর্ত্তি অন্যরূপ হইত। পালকিতে বিছানা ও একটা রূপা বাঁধানো হুঁকা ও একটা পিতলের নদীয়ার গাড়ু ও একটা বাক্সে থানার কাগজপত্র ও শীলমোহর এবং নগদ অল্প কয়েক টাকা ছিল। আমার পরিধানে একখানা অর্দ্ধ-মলিন সামান্য মোটা আটপ্রহরী ধুতি এবং গাত্রে একখানা পুরাতন ভাগলপুরী খেস ছিল, মের্জাই কিম্বা অন্যপ্রকার পোষাক ছিল না। বৈদ্যনাথের পালকিতেও একটা বাক্সে তাহার কাগজপত্র ও শীলমোহর ছিল, অন্য কি কি দ্রব্য ছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই। কেবল ইহা খুব মনে আছে যে তাহার পরিধানে রজক-গৃহ হইতে নবাগত ধপ্‌ধপে শান্তিপুরের মিহি ধুতি ও অঙ্গে মের্জাই এবং চিকণ চাদর দ্বারা মাথায় উষ্ণীষ বান্ধা ছিল। দাঁড়ঘরা হইতে আমাদের পালকি ৫০ হাতের অধিক দূর যাইতে, না যাইতে যে বরকন্দাজের হস্তে আমার বন্দুকটা ছিল, সে শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে কহিল যে "বাবুদের লোক আসিতেছে পালকি হইতে নামুন।" "লোক আসিতেছে" বাক্য শুনিয়া আমার প্রথমে বোধ হইল যে বুঝি বাবুদের কোন কর্ম্মচারী কোনও কথার নিমিত্ত আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে। তাই ভাবিয়া আমি আমার পালকির বাম দ্বার দিয়া এবং বৈদ্যনাথ তাহার পালকির দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির হইলাম। বাহির হইয়া দেখি যে আমাদের সম্মুখবর্ত্তী অনুমান ৬০।৭০ হাত অন্তরে একদল ৩০।৪০ জন পশ্চিমদেশীয় পালোয়ান মল্লবেশে কেহ ঢাল তরবার, কেহ বর্শা এবং কেহ লোহাঙ্গী হস্তে করিয়া মহা আস্ফালন করিতে

করিতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইয়া আসিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া, পালকির মধ্য হইতে পিস্তলটা উঠাইয়া, হস্তে লইয়া বৈদ্যনাথের সহিত একত্র পালকির দণ্ডের নিকট অগ্রসর হইলাম এবং আমাদের বরকন্দাজগুলিও সেইখানে আসিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। বৈদ্যনাথ এবং আমাদের সঙ্গে যে তিনজন পশ্চিমা বরকন্দাজ ছিল, তাহারা হস্ত প্রসারণ করিয়া দস্যুদিগকে বলিতে লাগিল যে "ভাগো ভাগো এয়্সা কাম মত্ করো, নেহি তো ফাঁসী যাওগে।" কিন্তু চোর না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী ; তাহারা উত্তর করিল যে "তোম্ লোক হট্ যাও তোম লোককো কুচ্ নেই বোলেঙ্গে, সেরেফ ঐ কালা দারোগা শারোয়াকা শীর লেঙ্গে, ওসকো ছোড়েঙ্গে নেহি।" বরকন্দাজেরা তদুত্তরে বলিল যে "আগে হাম লোক মরেঙ্গে, পিছে যো জানো সো করিও।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় আমাদের পশ্চাদ্ভাগে পালকির ছাদের উপরে ধুপ্ধাপ্ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি যে, সেই দাঁড়ঘরা দেশী শড়কিওয়ালায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কোঁচড়ে ঢেলা এবং হস্তে একখানা করিয়া ফরিদ ঢাল ও তাহারা কয়েকগাছা বাঁশের শড়কি লইয়া ঢেলা নিক্ষেপ করিতে করিতে আমাদিগের দিকে আসিতেছে। তাহাদেরই কয়েকটা ঢেলা পালকির ছাদের ওপরে পতিত হইয়া শব্দ হইয়াছিল। অতএব দেখা গেল যে আমরা কোনও দিক দিয়া পলায়ন করিতে না পারি সেইজন্য দুই পথ বন্ধ করিয়া সম্মুখ এবং পশ্চাৎ দিয়া দুইদল অস্ত্রধারী লোক আগমন করিতেছিল। প্রথমে সম্মুখের লোক দেখিয়া আমার যথার্থই আশঙ্কা হয় নাই কিন্তু শেষে পশ্চাদ্ভাগে শড়কিওয়ালা দেখিয়া ঘোর বিপদ বিবেচনা করিলাম। শড়কিওয়ালারা আসিবামাত্র দেখিলাম, যে বৈদ্যনাথ যে আমার দক্ষিণ পালকির দক্ষিণদিকে দণ্ডায়মান ছিল তাহাকে, বাবুদের সেই কর্ম্মচারী, যে আমাদিগকে রসিদ লিখিয়া দিয়াছিল সে, রক্ষা করার অভিপ্রায়ে হস্তে ধরিয়া টানিয়া দাঁড়ঘরের

নিকট এক ঘরের দিকে লইয়া গেল। সেই কর্ম্মচারী আমাকে কিছু না বলিয়া বৈদ্যনাথের প্রতি ঐরূপ কৃপাবান হওয়াতে, আমার বিবেচনায় তাহার অভিপ্রায় এইরূপ বোধ হইল যে দারোগাদ্বয়ের মধ্যে কেবল আমাকে লক্ষ্য করিয়া লোক প্রেরিত হইয়াছে, বৈদ্যনাথকে লক্ষ্য করিয়া লোক প্রেরিত হয় নাই। কারণ বৈদ্যনাথ নূতন দারোগা এবং বাবুদিগের উকীল রামগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, অতএব তাঁহাকে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু কর্ম্মচারীটির বুদ্ধির গতিকে শেষে হিতে বিপরীত ঘটিয়া উঠিয়াছিল। এদিকে পশ্চাদ্ভাগে শড়কিওয়ালাদিগের আগমন দেখিয়া আমার পার্শ্বস্থ বৃদ্ধ, বরকন্দাজ ও আমার কৃষ্ণনগরের বেহারারা আমাকে তাহাদের মধ্যখানে করিয়া ঠেলিয়া বামদিকে স্থিত এক গোহালঘরের পিছনে লইয়া গমন করিল। তখন পশ্চিমা ব্যাটারা আমার পালকির নিকট আসিয়া "দারোগা শ্বশুর কাঁহা" বলিয়া আমাকে তল্লাস করিতেছে, আমরা তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলিলাম, তথাপি তাহারা আমাকে চিনিতে পারিল না। তাহার কারণ এই যে, একেই আমি কৃষ্ণবর্ণ এবং দেখিতে কদাকার তাহাতে আমায় পরিধানে অতি সামান্য পরিচ্ছদ ছিল, শরীরে মের্জাই কিম্বা অন্য কোন আচ্ছাদন ছিল না, সুতরাং তাহারা আমাকে সেই পলায়ন উদ্যত বেহারাদিগের মধ্যে একজন বেহারা বিবেচনা করিয়া লক্ষ্য করিল না এবং আমিও বেহারাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলাম। শৈশবকালে আমার জনক-জননী আমার শ্রীহীন দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ করিতেন কিন্তু এই ঘোর দুর্দ্দিনে দেখিলাম, যে আমার শ্রীহীনতাই এক সময়ে আমার জীবন-রক্ষার একমাত্র কারণ হইয়াছিল। বেহারারা আমাকে লইয়া সেই গোহালঘরের পিছাড়া দিয়া সরকারদিগের বাড়ীর খিড়কী খণ্ডে উপস্থিত হইল। দেখিলাম যে সে স্থানে জন-মনুষ্য নাই, কারণ সকলেই আমাদিগকে আক্রমণ করার তামাশা দেখিতে বাহির বাড়ীর দিকে গিয়াছে সুতরাং আমরা কোন্

দিক দিয়া কোন্ দিকে পলাইলাম, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। তৎপর আমরা কয়েকটা গড়, খন্দ ও আম্রবাগিচা অতিক্রম করিয়া, একটা মাঠের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলাম। পথে দেখিলাম দুই ধারে গ্রাম্য লোকেরা দলে দলে তামাশা দেখিবার জন্য বাহির হইয়া স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে একদলের একজন লোক আমাদের দেখিয়া বলিয়া উঠিল যে "ওগো তোমরা পলাও কেন? তোমাদের কোনও ভয় নাই, বাবুদের লাঠিয়াল দারোগা ঠেঙ্গাইতে গিয়াছে।" বাবুদের গৌরবেই তাহাদের গৌরব এবং বাবুদের সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারে না এই বিশ্বাসে তাহাদের মনে যৎপরোনাস্তি অহঙ্কার ছিল। গ্রামবাসী লোকেরা কেহ আমাদিগকে চিনিতে পারে নাই, চিনিতে পারিলে বোধ হয় আমাদের দুর্গতির পরিসীমা থাকিত না। যাহা হউক, এইরূপে আমরা নাকাশীপাড়া ও পলাশডাঙ্গার মধ্যস্থিত মাঠের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাহার পরে কোন্ স্থানে গমন করিলে আমরা নিরাপদে থাকিতে পাইব, তাহাই চিন্তা এবং পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম যে সেই অঞ্চলে বাবুরা ভিন্ন কেহই আমাদের পরিচিত ব্যক্তি নাই। বিশেষ গ্রাম্য লোকেদের মুখে যেরূপ কথা শুনিতে পাইলাম, তাহাতে কোনও ব্যক্তির গৃহে রক্ষা পাওয়ার প্রত্যাশায় প্রবেশ করিলে, আমরা যে তাহার নিকট সহানুভূতি প্রাপ্ত হইব তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই বরং বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা। বিল্বগ্রামে আমাদের বাসায় যাইবার পথও আমরা ভালরূপে জানিতাম না। একে আশঙ্কায় এবং দুশ্চিন্তায় রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাতে চৈত্র-মাসের রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ, তৃষ্ণায় মুখের মধ্যে ছাতু উড়িতেছে, এমত অবস্থায় 'কর্ত্তব্যং মহদাশ্রয়ং' ঋষিবাক্য স্মরণ করিয়া, নাকাশী-পাড়ার সেই আক্রমণকারী বাবুদিগের শরণ লওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় মনে উদয় হইল না। ভাবিলাম যে "রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব," অতএব চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ীতে যাইয়া

তাঁহার স্ত্রীর শরণাগত হওয়াই আমার কর্ত্তব্য। তিনি ভদ্র হিন্দু পরিবার, অবশ্যই আমার প্রতি কিছু না কিছু দয়া করিবেন। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া নাকাশীপাড়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যে এই গ্রামও জনশূন্য, কারণ সকল লোক লাঠিয়ালদিগের সঙ্গে সঙ্গে পলাশডাঙ্গার দিকে গিয়াছে। চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার দেহুড়ীতে কেবলমাত্র তাঁহার একটি বৃদ্ধ জমাদারকে দেখিতে পাইলাম। সে আমাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ তটস্থ হইল। বোধ হয়, আমাকে জীবিত দেখিয়া তাহার আশ্চর্য্যবোধ হইয়াছিল। যাহা হউক, আমি তাহাকে বলিলাম যে "জমাদার, তুমি তোমার ঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া বল, যে আমি ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়া তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার শরণাগত হইলাম। তাঁহার পুত্র যদু ও হরিবাবুরা আমার পরম বন্ধু, অতএব তাঁহাদের মাতা, আমারও মাতা, তিনি এক্ষণে মাতার ন্যায় কার্য্য করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।" জমাদার সত্বর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বসিবার আসন দিয়া বলিল, যে "আপনি এইখানে বসুন, মাঠাকুরাণী বলিয়াছেন, যে আপনার কোনও চিন্তা নাই, তাঁহার এই বাড়ীতে আপনার প্রতি কেহ কোনরকম বদিয়ত করিতে পারিবে না।" ইত্যাকার বাক্যে আমাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়া, অন্দর হইতে জল ও কিঞ্চিৎ আহারের দ্রব্য আনিয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিল।

আমি তো একরূপে নির্ব্বিঘ্নে আশ্রয়ের স্থান পাইলাম কিন্তু বৈদ্যনাথের কি অবস্থা হইল, তাহা জানিতে না পারিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। চন্দ্রমোহনবাবুর জমাদারকে বৈদ্যনাথের অনুসন্ধান করিতে বলিলাম কিন্তু সে বলিল যে এমন সময় আমাকে একাকী এই শূন্য বাড়ীতে রাখিয়া সে স্থানান্তর গমন করিলে, আমার পক্ষে বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা আছে, বিশেষ তাহার কর্ত্রী তাহাকে দেহুড়ী ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আমার বৃদ্ধ বরকন্দাজও বলিল যে সে আমাকে একলা ফেলিয়া এক পাও নড়িবে না। অন্যে

অনেক বলিয়া কহিয়া আমার একজন কৃষ্ণনগরের বেহারাকে বৈদ্যনাথের অন্বেষণে পাঠাইলাম। চন্দ্রমোহনবাবুর দেহুড়ীতে বসিয়া শুনিতে পাইলাম যে পলাশডাঙ্গার দিক হইতে হৈ হৈ রৈ রৈকার শব্দে লাঠিয়ালদিগেব হাঁকার উঠিতেছে, কিন্তু সে স্থানে কি কাণ্ড হইতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এক একটা হাঁকার উঠে, আব শুনিয়া আমার বুকের একপোয়া রক্ত শুখায়; ভাবি, যে আমি চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ীতে আছি শুনিয়া ব্যাটারা বুঝি উল্লাস-ধ্বনি করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে; কিন্তু জমাদার আমার মনের ভাব বুঝিয়া বারম্বার আমাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, যে আমার কোন চিন্তা নাই, সেখানে কাহারও আসিবার ক্ষমতা নাই এবং কেহ আসিবেও না। এইরূপে প্রায় একঘণ্টাকাল অতীত হওয়ার পরে দেখিলাম, যে দুইটি লোকের স্কন্ধে ভর দিয়া বহুকষ্টে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বৈদ্যনাথ আমাদের দেহুড়ী অভিমুখে আগমন করিতেছে। তাহার সমস্ত শরীর জলে ও রক্তে আর্দ্র। মাথা, হস্তের বাহু, এবং জানু দিয়া রক্তের স্রোত বহিতেছে এবং লাঠির আঘাতে শরীরের অনেক স্থান নীলবর্ণ ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। বৈদ্যনাথ আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং আমরা উভয়ে ক্রন্দন কবিতে লাগিলাম। বৈদ্যনাথ বলিল যে "দাদা আমার যা হবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তোমার ভাবনা ভাবিয়া আমি আকুল। আমি মনে করিয়াছিলাম, যে এতক্ষণ তোমাকে দুইখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, ভাবিয়াছিলাম, যে একস্থানে তোমার ধড় ও আর একস্থানে তোমার মাথা দেখিতে পাইব। ব্যাটারা তোমাকে ধরিবার জন্য পলাশডাঙ্গার প্রত্যেক বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতেছে, তোমাকে একবার হাতে পাইলেই, আমি শুনিয়াছি যে, তোমাকে বলি দিয়া ফেলিবে। এইক্ষণ তোমার প্রাণ-রক্ষা কিসে হয় তাহার উপায় কর। তোমার উপরেই তাহারা জাতক্রোধ, তোমাকে মারিবার জন্যই ব্যাটারা এই সাজ-সজ্জা করিয়া গিয়াছে,

তোমাকে নিশ্চয় তাহারা বধ করিবে, আমি কেবল তোমার সঙ্গের সঙ্গী বলিয়া মার খাইয়াছি।" বৈদ্যনাথের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম যে, "আমার আর কোন ভয় নাই, চন্দ্রমোহনবাবুর স্ত্রী আমাকে অভয়দান করিয়াছেন ; নচেৎ এতক্ষণে লাঠিয়ালেরা এইখানে আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইত।" বৈদ্যনাথেব মুখে শুনিলাম যে, যখন সেই কর্ম্মচারী তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতেছিল, তখন দাঁড়-ঘরার শড়কিওয়ালারা বৈদ্যনাথকে দেখিয়া "আরে এও এক শালা দারোগা" বলিয়া তাহাকে শড়কিব খোঁচা মারিতে আরম্ভ করিল এবং তাহা দেখিয়া একজন পশ্চিমা আসিয়া একটা লাঠির দ্বারা বৈদ্যনাথকে আঘাত করিল। কর্ম্মচারীরা বারম্বার নিষেধ করাতেও তাহাবা শুনিল না দেখিয়া সে নিজে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার আপন শবীব দ্বারা বৈদ্যনাথকে আচ্ছাদন করিল এবং লাঠিয়ালদিগকে বলিল যে "আহাম্মকেরা তোবা একি কার্য্য করিতেছিস্ ? তোরা যাহাকে মারিতে আসিয়াছিস্ সে কোথা গেল তাহার খোঁজ কর ; ইহাঁকে অনর্থক মারিয়া কি হইবে ? ইনি আমাদেব লোক।" কর্ম্মচারীর এই সকল কথা শুনিয়া দস্যুরা বৈদ্যনাথকে মারিতে ক্ষান্ত হইয়া আমার অন্বেষণে গমন করিল। পরে বৈদ্যনাথকে কয়েকজন ভদ্রলোকে ধরিয়া একটি পুষ্করিণীতে স্নান করাইয়া নাকাশীপাড়ায় আনিয়া আমাব নিকট উপস্থিত করিল। তদনন্তর তদন্ত করিয়া দেখিলাম, যে বৈদ্যনাথের দুই বাহুতে চারিটা ও দক্ষিণ পদের ডিমের মধ্যে একটা শড়কির গভীর আঘাত, মাথায় লাঠির আঘাতে এক স্থান ফাটিয়া গিয়াছে এবং পৃষ্ঠে ও পঞ্জরে লাঠির আঘাতে অনেক স্থান বিবর্ণ এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। এই সকল আঘাত দিয়া এত রক্তস্রাব হইয়াছিল, যে বৈদ্যনাথ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং এমন গ্রীষ্মের সময়েও শীতে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রমোহনবাবুর স্ত্রী কিছু টার্পিন ও একখানা পুরাতন বস্ত্র পাঠাইয়া

দেওয়াতে তদ্দ্বারা আমরা বৈদ্যনাথের আঘাত বেষ্টন করিয়া রক্ত পড়া বন্ধ করিলাম এবং স্ফীত স্থান সমস্তে টার্পিন ও অগ্নির সেক দিতে আরম্ভ করিলাম। এমন সময় বাড়ীর মধ্যে একটা শোরগোল শুনিতে পাইয়া আমাদের অত্যন্ত ভয় হইল। শুনিলাম, যে আমি চন্দ্রমোহন বাবুর দেহুড়ীতে আশ্রয় লইয়াছি শুনিয়া সর্ব্ববাবুর যে একজন কুটুম্ব লাঠিয়ালদিগের নেতা হইয়া পলাশডাঙ্গায় আমাদের আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, সে কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক লইয়া অন্দরমহলের মধ্য দিয়া পুনরায় আমাকে মারিবার জন্য আসিতেছিল কিন্তু চন্দ্রমোহনবাবুর স্ত্রী তাহাদিগকে তাঁহার বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়া বলিলেন যে "তোরা যে কর্ম্ম করিয়াছিস্ তাহাই আগে সামলা, পরে আবার মারিতে যাইস্।"

চন্দ্রমোহনবাবুর স্ত্রী এই দুরাত্মাদিগকে তাঁহার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন বটে কিন্তু বোধ হয় তাঁহার মনের সন্দেহ দূর হইল না, কারণ দেখিলাম যে তিনি ক্ষণেক পরেই আমাদিগকে আমাদের বিল্বগ্রামের বাসায় পৌঁছিয়া দিতে উদ্যোগ পাইলেন এবং তাঁহার জমাদার এবং আর কয়েকজন লোক আমাদের সমভিব্যাহারে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে ইহারা আমাদের সঙ্গে থাকিতে আমাদের কোনও আশঙ্কা করিবার আবশ্যক নাই। আমরাও অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান ও তাঁহার পুত্রদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিল্বগ্রাম যাত্রা করিলাম। পালকি অভাবে বৃদ্ধ বরকন্দাজ বৈদ্যনাথকে স্কন্ধে করিয়া লইল, এবং আমি পরিধানে কেবল একখানা ধুতি ও হস্তে সেই পিস্তলটা লইয়া নত-মস্তকে নাকাশীপাড়া হইতে প্রস্থান করিলাম। নাকাশীপাড়া পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই একটা জনরব শুনিয়াছিলাম যে বিল্বগ্রাম হইতে আমরা বাহির হইলে, দুরাত্মারা পুনরায় আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া আঘাতিত বৈদ্যনাথকে হস্তগত করিবে। আমি ইহা শুনিয়া একজন দ্রুতগামী বরকন্দাজকে মুড়াগাছায় দেবীদাস

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রদিগের নিকট কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক চাহিয়া পাঠাইলাম, যে তাহারা আসিয়া অদ্য রাত্রিতেই আমাদিগকে মুড়াগাছা লইয়া যায়। এই বন্দোবস্ত করিয়া আমরা নাকাশীপাড়া হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখি, যে পথমধ্যে আমাদের বেহারারা আমাদের পালকি দুইখানা পলাশডাঙ্গা হইতে লইয়া আসিতেছে। দেখিলাম যে লাঠিয়ালেরা লাঠি মারিয়া দুইখানা পালকিরই ছাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং তন্মধ্যস্থিত তৃণটি পর্য্যন্ত দ্রব্য সকল লুটিয়া লইয়াছে। বন্দুকটি প্রথমেই একজন দস্যু সেই বৃদ্ধ বরকন্দাজের গালে চড় মারিয়া কাড়িয়া লইয়াছিল। বৈদ্যনাথকে পালকিতে বসাইয়া বিল্বগ্রাম পৌঁছিলাম এবং কিছুকাল পরে মুড়াগাছার বাবুদিগের প্রেরিত প্রায় ৪০ জন অস্ত্রধারী লোক আসিয়া পৌঁছিলে, আমরা তাহাদের সঙ্গে মুড়াগাছায় গমন করিলাম এবং সেইস্থানে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া তাহার পরদিবস প্রাতে আসিয়া কৃষ্ণনগর পৌঁছিলাম।

গোয়াড়ীর খেয়াঘাটের নিকটে বৈদ্যনাথের পিতার বাসাবাড়ী ছিল। সেইখানে আসিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ দেওয়াতে তিনি ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন এবং আমাদের নিকট সকল সংবাদ অবগত হইলেন। ডাক্তার সাহেব বৈদ্যনাথের আঘাতের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিলে পর, এলিয়ট সাহেব আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার কুঠীতে লইয়া অনেক পরামর্শ করিলেন এবং যাহা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়া বিদায় দিলেন। বৈদ্যনাথ সুন্দররূপে আরোগ্যলাভ করিতে প্রায় একমাস কালের অধিক লাগিল। নাকাশীপাড়া হইতে আমাদের কৃষ্ণনগরে প্রত্যাগমন করার পরে, সাধারণের, বিশেষ বাবুদের, মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব না জানি তাঁহাদের প্রতি কত অত্যাচার করিবেন, কিন্তু ঘটনার পরে একমাসের অধিককাল অতিবাহিত হওয়াতে বাবুদের সেই আশঙ্কা দূর হইল এবং তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে, মাজিষ্ট্রেট

এই বিষয়ে কিছুই কবিবেন না, অধিক হইলে, তাঁহাদেব কিঞ্চিৎ জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। বাবুদিগের সহিত কথোপকথন হইলে আমিও এলিয়ট সাহেবের ইঙ্গিতে সেই ভাবেব আভাস প্রকাশ কবিতাম সুতবাং বাবুবা অনেকে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ দিকে এলিয়ট সাহেব গোপনে কমিসনর ও গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন। বৈদ্যনাথ ভালরূপে আরাম হইলে পর, একদিন রাত্রি অনুমান ১১ ঘণ্টাব সময় আমার থানাতে ৮টা হস্তী ও দুইশত বরকন্দাজ এবং আরও দুইজন আমার অপবিচিত সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শীঘ্র আমাব থানাব সকল ববকন্দাজ ও দুইজন জমাদাব ও কৃষ্ণনগর সহবেব সমুদয় চৌকিদার সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। আমি পূর্ব্বেই ইহা অবগত থাকিয়া উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলাম। অল্পক্ষণেব মধ্যে সাহেবদের আদেশ পালন কবিয়া আমরা সকলে নাকাশীপাড়ার বাবুদিগের বাসা-বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বাবুবা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যাইয়া, বাবুবা তখন যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় দুইজনকে এক হস্তীব উপবে বসাইয়া প্রত্যেক হস্তীব পৃষ্ঠের আলানের দুইধাবে অর্থাৎ দুইজন বাবুকে মধ্যে করিয়া দুইজন সাহেব উপবিষ্ট হইলেন এবং প্রত্যেক সাহেবের হস্তে এক একটা দোনালা পিস্তল বাহির করিয়া বাবুদিগকে দেখাইয়া তাহার মধ্যে গুলি ও বারুদ ভরিয়া লইলেন এবং বাবুদের বলিলেন যে তাহাবা কেহ কোন উচ্চবাচ্য কিম্বা কোনওরূপ অবাধ্যতা দেখাইলে, তৎক্ষণাৎ পিস্তলের দ্বারা তাঁহার মস্তক উড়াইয়া দেওয়া হইবে। গোয়াড়ীর ঘাটে আসিয়া দেখিলাম যে সেইখানে বৈদ্যনাথ একশতজন লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালা লইয়া আমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। আমি ও বৈদ্যনাথ চন্দ্রমোহনবাবুর দুই পুত্রকে লইয়া এক হস্তীতে উপবেশন করিলাম এবং তাঁহাদের দুইজনের কোন চিন্তা নাই বলিয়া আশ্বাস দিলাম। সূর্য্যোদয়ের সময় আমরা সকলে নাকাশীপাড়ার

সম্মুখে পৌঁছিয়া দুইদলে বিভক্ত হইলাম ; একদল পলাশডাঙ্গার দিকে গমন করিল এবং দ্বিতীয় দল নাকাশীপাড়া প্রবেশ করিল। নাকাশীপাড়ায় আসিয়া এলিয়ট সাহেব ব্যক্ত করিলেন, যে তাঁহার দারোগাদিগকে যে সকল লোকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদের ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আসিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, আসামী ধৃত করা কেবল উপলক্ষমাত্র, বাবুদের অপমান করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার ও বৈদ্যনাথের অনুরোধে কেবল চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ীতে সকলকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া, নাকাশীপাড়ার ও পলাশডাঙ্গার অন্য সকলের বাড়ীতে যাইয়া আসামীদের অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা প্রচারিত হইল এবং আমাদের কার্য্য সমাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত বাবুদের সকলকে এক প্রকাশ্য স্থানে বসাইয়া, তাঁহাদের উপরে বরকন্দাজ ও জমাদার প্রহরী সংস্থাপিত হইল। চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ী ভিন্ন অন্যান্য বাবুদের বাড়ী ও নাকাশীপাড়া ও পলাশডাঙ্গা গ্রামের সেইদিন আমাদের সঙ্গের লোকের হস্তে, যে কি দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা এস্থানে বিস্তারিত বর্ণনা করার আবশ্যক রাখে না। পাঠক অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারেন। এই খানাতল্লাসীতে আমাদের আক্রমণকারী লোকের মধ্যে কেবল ১০ জন লোক ধৃত হইয়াছিল। খানাতল্লাসী সমাপ্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব গবর্ণমেণ্টের হুকুমমতে সেই তারিখে নাকাশীপাড়াতে নাকাশীপাড়ার থানা নামক থানা সংস্থাপন এবং তাহার আবশ্যকীয় দারোগা প্রভৃতি পুলিশ আমলা নিযুক্ত করিয়া, কৃষ্ণনগর প্রত্যাগমন করিলেন। সেই পর্য্যন্ত নাকাশীপাড়ার বাবুরা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের কি অবস্থা তাহা আমি জানি না।

আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নাকাশীপাড়ার নাম আমার চিত্তের মধ্যে অঙ্কিত থাকিবে এবং নাকাশীপাড়ার লোকেরাও আমার নাম শীঘ্র ভুলিবে না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত বিবৃত করিয়া আমি এই

প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। কয়েক বৎসর পরে এফ, আর, ককরেল সাহেব মাজিষ্ট্রেট এক খুনী মোকদ্দমার তদন্তের জন্য আমাকে নিযুক্ত করাতে, পুনরায় আমার নাকাশীপাড়ায় যাইতে হইয়াছিল। নাকাশীপাড়ার লোকেরা আমাকে দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, "ভাই সাবধান! আবার সেই মুষল নাকাশীপাড়ায় আসিয়াছে।"

হাকিম ও আমলাদের কথা

সকলেই জানেন যে ইংবাজের আমলেব প্রথমাবধি দেশের শাসন, বিচার প্রভৃতি সমুদয় রাজকার্য্যের ভার সাহেবদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। দেশীয় লোকে উচ্চপদে প্রবেশ করিতে পারিত না, তবে যে দেওয়ানী মুচ্ছুদ্দীগিরি চাকরি কবিয়া পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালী সম্যক্ মর্য্যাদা এবং বহু ধনসংগ্রহ বিকায় গিয়াছিলেন, তাহাও কেবল অধীন আমলার কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়াব দীর্ঘকাল পবে সাহেবেবা আমাদের হস্তে বিচার-কার্য্যের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। এখন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, সবজজ প্রভৃতিব ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি আধুনিক কালের সৃষ্টি। সেই সৃষ্টি আমাদের যুবা বয়সেই প্রথম আরম্ভ হয়। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মাতুলের সহিত ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে পরে, বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। কাশিমবাজারেব প্রাতঃস্মরণীয় দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী ৺কৃষ্ণনাথ কুমার যে খুনী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার তদন্তের ভার এই চন্দ্রমোহনবাবুর হস্তে অর্পিত হয়। প্রবাদ আছে যে দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজে কুমার কৃষ্ণনাথের অনুকূলে চন্দ্রমোহন বাবুকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ লক্ষাধিক টাকারও প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন কিন্তু দৃঢ়চিত্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে কর্ণপাত না করাতে অভিযুক্ত কুমার নিস্তারের উপায়ান্তর না দেখিয়া কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার জোড়াসাঁকো

ভবনে বন্দুকের দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তখন আমরা কলেজে পড়ি। "কৃষ্ণনাথ কুমার গুলি খাইয়া মরিয়াছে" এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে সেই দিবস কলিকাতায় এমন একটা হুল-স্থুল পড়িয়া গেল, যে তেমন আর কখনও দেখি নাই। আন্দামান উপদ্বীপে লর্ড মেয়োব বধের সংবাদ যে দিবস কলিকাতায় প্রচারিত হয়, সেই দিবসেও আমি কলিকাতায় ছিলাম, কিন্তু তাহাতে আপামর সাধারণের চিত্ত তত আকর্ষণ কবে নাই বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ এই যে, কুমারজীর মৃত্যুর সময় কলিকাতায় সংবাদপত্রের ব্যবহার ছিল না; যে দুই একখানা ছাপা হইত, তাহাও লোকেব দ্বারা বড় গৃহীত কিম্বা পঠিত হইত না। সংবাদের জন্য সকলেই জনরবের উপর নির্ভর করিত। হাটে বাজারে, রাস্তায় ঘাটে, ধনী লোকের বৈঠকখানায়, দরিদ্রের কুটীরে, গাঁজার আড্ডায় ও শরাবের দোকানে এবং স্কুল কলেজে—সকল স্থানেই কয়েক দিবস ধরিয়া ঐ কথার ঘোব আন্দোলন ও বাদানুবাদ চলিয়াছিল। স্কুল ও কলেজ সমস্তে ইহাব বিশেষ উল্লেখ হওয়ার কাবণ এই যে, ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী বালকের বন্ধু হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার জন্য কোন চিরস্মরণীয় চিহ্ন স্থাপনের উপায়ের নিমিত্ত মেডিকাল কলেজের দরবার ঘরে এক মহতী সভা আহ্বান করা হয়। তাহাতে কৃষ্ণনাথ কুমার বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন এবং নিজে তিন হাজার টাকা দান করিয়া, আবশ্যক হইলে আরও অধিক টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। হেয়ার সাহেবের যে শ্বেত প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি এইক্ষণে কলিকাতার পটলডাঙ্গায় হেয়ার স্কুলের সম্মুখে বিরাজমান, তাহা সেই টাকায় নির্ম্মিত হয় এবং সেই নিমিত্ত কুমার বাহাদুর ছাত্রবর্গের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন।

মুন্সেফীপদও ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালীদিগের জন্য খোলা ছিল কিন্তু বেতন ছিল কেবল ২৫ টাকা মাত্র, সুতরাং মুন্সেফদের যে অতি নিকৃষ্ট অবস্থা ছিল তাহা আর বলিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না। কিন্তু যদিও

সাহেবেরা দেখিতে দেশের বিচারপতি ছিলেন তথাপি প্রকৃতপক্ষে সকল বিচারালয়ে বিচাব করার কার্য্য সেই সেই আদালতের দেওয়ান ও তদধীন আমলাব হস্তে অনেকটা নির্ভর করিত। আমি এমন কথা বলি না, যে সাহেবদের মধ্যে কেহই বিচারকার্য্যে পটু ছিলেন না। সিবিলিয়ান বিচারপতিগণের মধ্যে হারিংটন, ডি, সি, স্মিথ প্রভৃতি অনেকে সুবিচারের নিমিত্ত অত্যন্ত প্রশংসিত ছিলেন;। সুবিচার করার নিমিত্ত অনেক সাহেবেরই মনে সম্পূর্ণ চেষ্টা ছিল কিন্তু শুদ্ধ বিচারকের চেষ্টায় এবং ইচ্ছায় তো বিচারকার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে নিষ্পাদিত হয় না। একে বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাহাতে আইন-কানুনের অল্পতা ও অনিশ্চিততা, বিশেষ কোন্ স্থানে কোন্ আইন খাটিবে কি খাটিবে না, তাহা দেখাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত এখনকার মত তখন শিক্ষিত উকীল সম্প্রদায় ছিল না, সুতরাং হাতুড়িয়া কবিরাজের হস্তে রোগের যেরূপ চিকিৎসা হইয়া থাকে, সেকালের বিচারকদিগের হস্তেও বিচারকার্য্য সেইরূপে নিষ্পাদিত হইত। কিন্তু অনেক স্থানে এবং সময়ে সাহেব হাকিমেরা কেবল সাক্ষীগোপালের ন্যায় এজলাসে বসিয়া থাকিতেন, আসল কার্য্য দেওয়ানজীর দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। দেওয়ানজীরা অতি উচ্চদরের লোক ছিলেন এবং ফারসী ভাষায় তাঁহাদের দক্ষতা থাকা আবশ্যক ছিল। মোকদ্দমার রায় ফয়সালা সমুদয় আবশ্যকীয় কাগজ দেওয়ানজীকেই লিখিয়া প্রস্তুত করিতে হইত। যে আদালতের সাহেব কার্য্যক্ষম হইতেন তিনি অধিক করিলে নিজে কেবল ডিক্রী কি ডিসমিস বাক্য উচ্চারণ করিয়া অবসর লইতেন। হেতুবাদ সমস্ত ব্যক্ত এবং লিপিবদ্ধ করা দেওয়ানজীর কার্য্য ছিল। অনেক আদালতে দেওয়ানের ইঙ্গিতমতে সাহেবেরা নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য হইতেন সুতরাং সাহেবেরা খুব ভাল লোক দেখিয়া দেওয়ান নিযুক্ত করিতেন।

তবে টাকা লওয়াটা সাধারণ প্রথা ছিল এবং পূর্ব্বে সাহেবেরা

অনেকেই এই দোষে মুক্ত ছিলেন না। বর্ত্তমান সময়ে ঘুস লওয়াকে আমরা যেমন দুষ্কর্ম্ম মনে করি তখন লোকের সে জ্ঞান ছিল না। ঘুস না দিলে কোনও কার্য্য হইত না। কিন্তু এক্ষণে সেই দোষের হ্রাস হইয়াছে বলিয়া অর্থী প্রত্যর্থীগণের বড বিশেষ সুবিধা হয় নাই। সকল কালেই তাহাদের ভাগ্যে সমান কষ্ট, তখনও দেওয়ানজীকে কিম্বা অন্যান্য আমলাকে টাকা না দিলে মোকদ্দমার সুবিধা ছিল না এখনও ষ্টাম্প রুসুম, আদালতের নানা প্রকার ফীস্ ও উকীল কৌন্সলীর মেহেন্নতানা দিতে লোকের সর্ব্বস্বান্ত হয়। তখনও দেওয়ানজীর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাকে টাকা দিয়া তাহাব উপাসনা করিতে হইত, এখনও সেইরূপ উকীল বাবুদিগকে টাকা দিতে ও উপাসনা কবিতে হয়। তবে তখন দেওয়ানজীকে পরিতোষ করিতে পারিলেই জয়লাভেব সন্দেহ থাকিত না কিন্তু এইক্ষণে উকীল বাবুদিগকে মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিতে পারিলেও সেইরূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না।

কাছারীব আমলাদিগেব মধ্যে উৎকোচ লওয়ার প্রথা এক্ষণে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়। আমলারা ঘুস লয়েন না বলিয়া লোকের বিশেষ সুবিধা কিম্বা উপকার বর্দ্ধিত হয় নাই ববং অসুবিধা এবং অনুপকারের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। যখন আমলারা ঘুস লইত, তখন কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলেই আপনার স্বেচ্ছাধীন সময়ের মধ্যে আমলা দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিয়া লওয়া যাইত, ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইত না। পূর্ব্বে আমলাকে যে টাকা উৎকোচ স্বরূপ দেওয়া যাইত বরং তাহার অধিক টাকা সেই কার্য্যের জন্য এখন আদালতের ফীস্ স্বরূপে দিতে হয়, কিন্তু নিয়মের অধীন হইয়া আমলাদিগের ইচ্ছা এবং সাবকাশের প্রতীক্ষা করিতে হয়। আগে চারি গণ্ডা পয়সা দিলে আমলার দ্বারা অর্দ্ধঘন্টার মধ্যে যে কার্য্য সম্পাদিত করিয়া লওয়া যাইত, এক্ষণে আদালতে সেই কার্য্যের জন্য একটাকা ফীস্

দিয়া তিন দিবস আদালতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া প্রাণান্ত হইতে হয়। বিশেষ আর যে এক উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অনেক স্থানে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে সকল আমলারা বেরোঁয়া হইয়াছেন, অহঙ্কারে তাঁহাদের মাটিতে পা পড়ে না। তাঁহারা ঘুস গ্রহণ করেন না বলিয়া প্রার্থীদিগকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন এবং কটুকাটব্যের সহিত তাহাদিগের ব্যবহার করিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

এই স্থানে এতৎসম্বন্ধে আমি একটা রহস্যের কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আমি কিছুকাল তমলুকের নিমক মহলের হেড কেরাণী ছিলাম। তমলুকে নিমকের এজেন্ট সাহেবই সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু ছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যালয়ই তাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল এবং তদনুযায়ী ডাকঘরও তাঁহার অধীনে ছিল। সেই ডাকঘর আমাদের নিমক মহলের কাছারী বাড়ীর এক ঘরে স্থাপিত ছিল, এবং ডাক মুন্সী ছিলেন,—একজন বৃদ্ধ কায়স্থ। ইহা কাহারও অবিদিত নাই, যে পূর্ব্বে নিমক মহলের আমলাদিগের খুব রোজগার ছিল এবং প্রকৃতপক্ষেও কলিকাতার অনেকানেক ধনাঢ্য ঘরের মূল ভিত্তি সেকালের এই নিমক মহলের চাকরির টাকা। লোকে বলিত যে

নূনে ভণ্ড, কাপাসে চোর।
দেখ্ তোর্, না দেখ্ মোর্॥

নিমক মহল ও কাপড়ের কুঠী উভয়ই সেকালে টাকার গাছ (Paogdatr ee) ছিল। কিন্তু আমি যে সময়ে তমলুকে চাকরী করিতে যাই তখন "তালপুকুরের" কেবল নাম ছিল, তাল অথবা পুকুর কিছু ছিল না। তথাপি নামের মাহাত্ম্য কোথায় যায়? এমন ভগ্নাবস্থায়ও আমলারা প্রতি বৎসর দাদনের সময় মলঙ্গীদিগের নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বার্ষিক পাইতেন এবং সেই বার্ষিকই তাঁহাদের নিমিত্ত প্রচুর ছিল। দাদনের সময় নিমক মহলের সকল আমলার

কিছু না কিছু লাভ হইত, কেবল হইত না,—আমাদেয় ডাক মুন্সী মহাশয়ের। কারণ ডাক মুন্সীর সঙ্গে নূনের মলঙ্গীদিগের কি সম্পর্ক যে তাহারা তাঁহাকে বার্ষিক দিবে? সেই নিমিত্ত মুন্সী মহাশয়ের মেজাজ সর্ব্বদা গরম থাকিত। দাদনের সময় সকল মলঙ্গীরা টাকা লইতে তমলুকের কাছারীতে আসিত এবং হাঁ করিয়া কাছারী বাড়ীর সকল ঘরের সাহেব আমলাদিগকে দেখিয়া বেড়াইত। স্বয়ং এজেণ্ট সাহেবের ঘরে যাইলেও সাহেব মলঙ্গীদিগকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু কেবল আমাদেব ডাক মুন্সী মহাশয়েব তাহা সহ্য হইত না। কোনও মলঙ্গী তাঁহার ডাকঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনি আরক্ত লোচনে এবং একটা রুল হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া মলঙ্গীদিগকে এই বলিয়া তাড়াইয়া দিতেন যে "তোম লোক হিঁয়াসে নিকাল যাও, আমি তোমাদের রেস্বদ খাই না, এখানে রেস্পাদেব কোনও এলাকা নাই।" আদালত ফৌজদারী ও কলেক্টরীর আমলারা যে কোন কারণে হউক এইক্ষণে বেরোঁয়া হইয়াছেন বলিয়া উক্ত ডাক মুন্সীর মত অর্থী প্রত্যর্থীদিগের প্রতি কটূ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে সিবিলিয়ানদিগের নিয়োগের স্বতন্ত্র প্রণালী ছিল। তাঁহারা সুপারিশে নির্ব্বাচিত হইয়া ইংলণ্ডে হেলিবারী বিদ্যালয়ে কিছুদিন পাঠ করিয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইতেন এবং কলিকাতায় আসিয়া পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নামক বিদ্যালয়ে, বাঙ্গালা, পার্সী, হিন্দি প্রভৃতি দেশীয়ভাষা সকল শিক্ষা করিয়া কার্য্যে নিয়োজিত হইতেন। কলিকাতায় লালদীঘীর উত্তর ধারে যে পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা এক বৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা ছিল এবং যাহা এক্ষণে বহুব্যয়ে সংস্কার করিয়া বঙ্গদেশের সেক্রেটারিয়েট আফিসে পরিণত করা হইয়াছে, সেই গৃহেই এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত ছিল এবং তাহার এক এক ঘরে এক এক জন সিবিলিয়ান যুবা পাঠাবস্থা পর্য্যন্ত থাকিতে পাইতেন। প্রথমে সিবিলিয়ানদিগের নাম Writer (কেরাণী) ছিল বলিয়া তাঁহাদের এই বাসের গৃহকে লোকে

Writers Buildings (কোম্পানির বারিক) বলিত।

সিবিলিয়ান যুবক সাহেবদিগের শিক্ষার নিমিত্ত অনেক ভাষাভিজ্ঞ দেশীয় পণ্ডিতেরা নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁহারা সরকার হইতে বেতন পাইতেন এবং ছাত্রেরাও তাঁহাদিগকে পারিতোষিক দিত। ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা শ্যামাচরণ সবকার প্রথম বয়সে এইরূপ একজন শিক্ষক ছিলেন। হাইকোর্টেব প্রসিদ্ধ উকীল বাবু কালীপ্রসন্ন দত্তের পূর্ব্বপুরুষেরাও এই কার্য্য করিতেন, কিন্তু সকলের উপরে রাজনারায়ণ গুপ্ত নামক শ্রীখণ্ডেব হরি হরি খাঁ বৈদ্য কুলীন এইরূপ শিক্ষকবৃত্তি দ্বারা অনেক ধন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতাব বাহিব সিমলা বেচু চাটুয্যীর গলির যে স্থানে এক্ষণ রাজা দুর্গাচরণ লাহার বাড়ী, সেই স্থানে উক্ত রাজনারায়ণ মুন্সীর এক বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও এই কার্য্যে প্রতিষ্টালাভ কবিয়াছিলেন। এই সিবিলিয়ান যুবকদিগের পাঠের নিমিত্ত বাঙ্গালা এবং অন্যান্য দেশীয় ভাষা সমস্তে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করা হইয়াছিল এবং বঙ্গভাষায় প্রথম গদ্য পুস্তক এই সকল সাহেবদিগেব হিতার্থেই লিখিত হয়। এক্ষণে আব সেই সকল পুস্তকের চলন নাই, কিন্তু তথাপি প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের বঙ্গসাহিত্যের শৈশব পুস্তক বলিয়া বরাবর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রায় ৩ বৎসরকাল বিদ্যা অধ্যয়ন কবিয়া পরীক্ষান্তে সিবিলিয়ানরা ভিন্ন ভিন্ন জেলায় আসিষ্টাণ্ট পদ পাইয়া চলিয়া যাইতেন।

বর্ত্তমান কালে যেমন যে সে ব্যক্তি ১৯ বৎসর বয়সেব মধ্যে লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই সিবিলিয়ান হইতে পারেন, পূর্ব্বে সেরূপ যে সে মনুষ্য সিবিলিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারিতেন না। ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত বিলাতে যে কোর্ট অব ডাইরেক্টর নামক সভা ছিল, তাহার প্রত্যেক সভ্যের প্রতি বৎসর দুই একজন করিয়া সিবিলিয়ান নিযুক্ত করার

ক্ষমতা ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতে না পারিলে, সিবিলিয়ান হওয়ার উপায় ছিল না এবং সেই কারণে পূর্ব্বে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংলণ্ডের মর্য্যাদাপন্ন এবং ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তানেরা অনেক স্থলে সিবিলিয়ানিতে প্রবেশ করিতেন এবং তাঁহাদের গুণেই এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বংশোদ্ভব সাহেবেরা পর্য্যায়ক্রমে সিবিলিয়ান হইয়া আসিতেন। ইহাঁরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভারতবর্ষেব শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকার সিবিলিয়ান সাহেবদিগের এদেশেব লোকের প্রতি দয়া মমতা ছিল এবং তাঁহারা নিজে যেমন ভদ্র বংশে উদ্ভূত, সেইরূপ এখানকার ভদ্রলোককেও তাঁহাবা যথোচিত সম্মান কবিতে ক্রটি করিতেন না। সিবিলিয়ান সাহেবেরা যতদিন ভাবতবর্ষে অবস্থিতি করিতেন, ততদিন তাঁহাদের সকলেবই এক একজন দেওয়ান মুচ্ছুদ্দী থাকিত। তাঁহাবা বিলাত যাইবার সময় তাঁহাদিগকে নিদর্শন কিম্বা সুখ্যাতি পত্র দিয়া যাইতেন, যে তাঁহাদেব সন্তানেবা ভাবতবর্ষে সিবিলিয়ান হইয়া আসিলে, সেই সকল নিদর্শন পত্র দেখিলে, দেওয়ান মুচ্ছুদ্দীর সন্তানেরাও তাঁহাদেব দ্বারা উপকৃত হইতে পারে এবং অনেক যুবক সিবিলিয়ান তাঁহার পিতার ঐরূপ নিদর্শন পত্র দেখিয়া আগ্রহের সহিত সেই দেওয়ানের উত্তরপুরুষদিগকে চাকরি দিতেন কিম্বা প্রকারান্তরে উপকার করিতেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত আমি এইস্থানে বিবৃত করিব। ডাম্পিয়ার সাহেব যিনি অতি অল্পদিন হইল রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর হইয়া চাকরী হইতে অবসর লইয়াছেন, তিনি যখন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরি ছিলেন, তখন, আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা ৺রামকুমার বসু মহাশয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। রামকুমার দাদা শুনিলেন, যে তাঁহাকে ২৪ পরগণা হইতে এক দূর জেলায় বদলি করার কথা হইতেছে। তিনি তাহা শুনিয়া ডাম্পিয়ার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঐ সাহেবের সহিত পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয় ছিল না। ডাম্পিয়ার সাহেব

রামকুমার দাদার প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন এমন তাঁহার বোধ হইল না বরং তিনি সাহেবের উল্টা অভিপ্রায়ই বুঝিলেন। তাহাতে রামকুমার বাবু সাহেবকে বলিলেন যে "মহাশয় আপনার অনুগ্রহের উপরে আমার কিছু দাবি আছে।" সাহেব এতক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া রামকুমার দাদার সহিত কথা কহিতেছিলেন, কিন্তু উপরি-উক্ত বাক্য শুনিয়া তিনি বক্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে "কিরূপে আমার অনুগ্রহের উপরে তোমার দাবি আছে?" রামকুমার দাদা উত্তর করিলেন যে "আপনার পিতার নিকট আমার শ্বশুর চাকরি করিতেন।" সাহেব রামকুমার দাদার শ্বশুরের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা নাম ব্যক্ত করিবামাত্র সাহেব তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং তাহার পরে রামকুমার দাদার সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মিষ্টালাপ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। ইহা অতি অল্পদিনের কথা, কিন্তু পূর্ব্বতন সিবিলিয়ানদের দল এক্ষণে প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

নূতন প্রণালীমতে যাঁহারা সিবিলিয়ান হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের প্রকৃতি ও মনের ভাব অন্য রকমের। কয়েকখানা নির্দ্দিষ্ট কেতাব পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই, যে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি উত্তম শাসনকর্ত্তা এবং বিচারক হইবেন, তদ্বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে; কিন্তু যাউক সে কথা। আমি কেবল পূর্ব্বকালের হাকিমের কথা বর্ণনা করিব সুতরাং নূতন সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ আমার অনধিকার এবং তাহাতে আমি হস্তক্ষেপণও করিব না। সেকালের হাকিমদের পুঁথিগত বিদ্যা না থাকিলেও তাঁহারা যে কম বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন এমন নহে। বিশেষ তাঁহারা অহঙ্কার-শূন্য ছিলেন এবং ভাল কথা শুনিলে তাহা গ্রহণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। এখন যেমন সাহেবেরা ভারতবর্ষে দুইদিন পদ-নিক্ষেপ করিয়া "হাম জান্তা" এবং "সব জান্তা" প্রভু হইয়া পড়েন, তখনকার হাকিমেরা তাহা করিতেন না। তখনও অল্প বয়সে

সিবিলিয়ান সাহেবদিগের উপরে অনেক গুরুতর কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইত, কিন্তু তাঁহারা নিজে যে সকল বিষয় ভালরূপে বুঝিতে পারিতেন না, সেই সকল বিষয়ে আমলাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অপমান কিম্বা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন না। কাছারীর সকলেই এক কার্য্যের জন্য ব্রতী বলিয়া তাঁহাদিগের অনুধাবন ছিল। এমন ভাবিতেন না যে আমি উচ্চপদস্থ অতএব আমি সকল অপেক্ষা ভাল বুঝি এবং আমাব অধীন আমলারা কিছুই বুঝিতে পারে না।

কলিকাতার বড় ট্রেজরিতে এখনকার ন্যায় পূর্ব্বেও অনেক কেরাণী ছিল কিন্তু কেরাণীবা অনেকে ইংরাজী কেবল লিখিতে পারিতেন। বর্ত্তমান কালের কেরাণীদিগেব ন্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন না। কায়কষ্টে উপরিতন সাহেবকে মনের ভাব বুঝাইতে পারিতেন। একবার একজন কেরাণী একটি হিসাব প্রস্তুত কবিয়া কর্ত্তা সব্‌ট্রেজবব সাহেবের নিকট উপস্থিত করিলে, সাহেব সেই হিসাবের কয়েক দফা খরচ অন্যায্য বিবেচনা করিয়া তাহা কর্ত্তন করার মানসে কলম তুলিয়া লইলেন। কেরাণী তাহা দেখিবামাত্র অগ্রসর হইয়া সাহেবের হাত ধরিয়া ব্যগ্র চিত্তে বলিয়া উঠিলেন যে "নাট্ কাট্ নাট্ কাট্ স্যার্ রীজন গাট্ !" অর্থাৎ "কাটিবেন না কাটিবেন না মহাশয় কারণ আছে।" সাহেব কেরাণীর কাণ্ড দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং কেরাণীর নিকট কারণ শুনিয়া সেই সকল খরচ মঞ্জুর করিলেন। বলুন দেখি এখনকার দিনে কেরাণী ওরূপ কার্য্য করিলে, তাহার প্রতিফল কি হইত ?

আর একবার ২৪ পরগণায় কলেক্টরীতে এক পল্টনেব রসদের জন্য পল্টনের কাপ্তেন সাহেব কলেক্টর সাহেবকে পত্র লেখেন। কলেক্টর সাহেব সেই পত্রের উত্তর মুসাবিদা করিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিবার নিমিত্ত কেরাণীখানায় পাঠাইয়া দেন। যে কেরাণীর উপর ঐ সকল চিঠি লিখিবার ভার ছিল, সে দস্তুরমত কাপ্তেন সাহেবের নামের নীচে N. I. অর্থাৎ Native Infantry

বলিয়া লিখিয়া দস্তখতের জন্য কলেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরণ করিল। সাহেব N. I. কাটিয়া তাহার স্থলে I. N. করিয়া দিয়া পুনরায় চিঠিখানা সাফ করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু কেরাণী I. N. না লিখিয়া পূর্ব্ববৎ N. I. লিখিয়া চিঠি কলেক্টরের নিকট পাঠাইল। সাহেব তাহাতে বিরক্ত হইয়া কেরাণীকে ডাকিয়া সে কি জন্য বারম্বার ভুল লিখিল, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেরাণী বলিল যে, যে "Servant not make fault. Master make fault." অর্থাৎ "আমার ভুল হয় নাই, হুজুরের ভুল হইয়াছে।" সাহেব বলিলেন যে "না তোমারই ভুল হইয়াছে।" তাহাতে কেরাণী আর উত্তর না করিয়া দ্রুতবেগে কেরাণীখানায় যাইয়া চিঠির নকল বহিখানা আনিয়া সাহেবকে দেখাইয়া দিল, যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যত কাপ্তেন সাহেবকে ঐরূপ পত্র লেখা হইয়াছিল, তাহার সকলেতেই N.I. লিখিত আছে, অতএব সে পুনরায় কিঞ্চিৎ অহঙ্কারের সহিত বলিল যে, "See Sir Master make fault" অর্থাৎ দেখুন হুজুরেরই ভুল হইয়াছে। সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন যে তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য বটে, কিন্তু এই কাপ্তেন Native Infantryর কাপ্তেন নহে Indian Navyর কাপ্তেন অর্থাৎ ইনি পদাতিক সৈন্যের কাপ্তেন নহেন, নৌ-সেনার কাপ্তেন অতএব ইহাঁকে I.N. লিখিতে হইবে। কেরাণী তখন দন্তে জিহ্বা কাটিয়া যোড় হাত করিয়া সাহেবকে বলিল যে "Then Servant make fault Sir" অর্থাৎ তবে অধীনের দোষ হইয়াছে। এমন শীতল-প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং ক্ষমাশীল হাকিম এখন কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়?

ইহারও পূর্ব্বের হাকিমদিগের আরও ভাল প্রকৃতি ছিল। নবাব সুভার নিকট হইতে রাজ্য লইয়া সাহেবেরাও অনেক বিষয়ে তাহাদের অনুকরণ করিতেন। ঘরকন্নার বিষয়ে কেহই নিজে দৃষ্টিপাত করিতেন না, তাহার ভার আমলা এবং ভৃত্যদিগের উপরে ন্যস্ত থাকিত। সাহেবেরা কেবল চাহিতেন এবং ভোগ করিতেন।

অনেকে বোধ হয় জানেন না যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের লক্ষ্মীশ্রীর মূল তিনটি P ছিলেন অর্থাৎ তিনজন সাহেবের নামের প্রথমাক্ষর P ছিল। Parker, Plowden, Pattle এই সাহেবত্রয়ের অনুগ্রহেতেই তিনি ভাগ্যধর হইয়াছিলেন এবং চরিত্রও তাঁহাদের অত্যন্ত উদার ছিল। পার্কার সাহেব কেবল উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ান ছিলেন এমন নহে, ইংরাজী সাহিত্যেও তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তাঁহার রচিত ইংরাজী কবিতা অত্যন্ত মধুর এবং তাহা পাঠ করিলে তৃপ্তি জন্মে। D.L. Richardson সাহেবের Selection বহিতে পার্কার সাহেবের কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। প্যাটেল সাহেব কিঞ্চিৎ উগ্রভাব বিশিষ্ট লোক ছিলেন এবং প্লাউডেন সাহেব অতি উচ্চ ঘরের লোক। তাঁহার বংশের ব্যক্তি এখনও বঙ্গদেশে সিবিলিয়ান আছেন। যখন দ্বারকানাথবাবু নিমক মহালের দেওয়ান ছিলেন, তখন প্লাউডেন সাহেব ২৪ পরগণায় নিমকের এজেন্ট (Salt Agent) ছিলেন। ২৪ পরগণা এজেন্সির অধীনে নানা স্থানে এক একজন নিমকের দারোগা নিয়োজিত ছিল, ইহার মধ্যে আলীপুরের দারোগার উপরে এজেন্ট সাহেবের বাড়ীর তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। ইহা বলিবার আবশ্যক নাই যে এই সকল দারোগা এবং তাহাদের নিম্ন আমলা সমস্তই দ্বারকানাথবাবুর নির্ব্বাচিত কিম্বা নিজের লোক ছিল। একদিন সাহেব একটা গাভী ২০সের দুগ্ধ দেয় শুনিয়া তিনি অনেক টাকায় ক্রয় করেন এবং তাহা বাড়ীতে আনিয়া তাহাকে খুব যত্নে রাখিতে দারোগাকে আদেশ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই গাভীটা সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া ৬।৭ সেরের অধিক দুধ দিত না। বোধ হয় ইহার পূর্ব্বেও সে ঐ পরিমাণে দুগ্ধ দিত, কিন্তু বিক্রেতা সাহেবকে বঞ্চনা করিয়াছিল। সে যাহা হউক, বিক্রেতা বঞ্চনা করিলে কি হয়, সাহেবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে গোরুটা যথার্থই ২০সের দুগ্ধ দেয়। বিক্রেতার কথামত গাভী দুগ্ধ দেয় না দেখিয়া সাহেব মনে করিলেন যে হয় দারোগা উহাকে ভাল করিয়া সেবা

করে না, নচেৎ দুগ্ধ চুরি করে। তাঁহার ধারণা ছিল যে বাঙ্গালীরা অত্যন্ত দুগ্ধপ্রিয় অতএব তাঁহার চাকরেরা তাঁহার গাভীর প্রদত্ত দুগ্ধ আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় স্বীয় উদর পোষণ করে। এইজন্য তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগের উপর শাসন করিতে এমন কি তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দারোগা সাহেবের এই ব্যবহার দেখিয়া দ্বারকানাথবাবুকে আসিয়া অবস্থা জ্ঞাত করিল এবং বলিল যে "আমাদের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, আপনি সাহেবকে বুঝাইয়া বলুন।" দ্বারকানাথবাবু উত্তর করিলেন যে "বুঝাইলে কিছু ফল হইবে না, সাহেবকে যে প্রকারে হউক সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে, তাঁহাকে ২০ সের দুগ্ধ বুঝাইয়া দিতেই হইবে।" দারোগা বলিল "গরু দুগ্ধ না দিলে তাহা কি প্রকারে হইবে।" দ্বারকানাথ উত্তর করিলেন যে "গরুর বাঁটে দুধ না হয় নিজের পয়সায় বাকী দুধ কিনিয়া সাহেবকে ২০ সের দুধ বুঝাইয়া দেও, তথাপি মনিবের আকৃত পালন করা আবশ্যক।" তাহাই হইল। তাহার পর দিবস প্লাউডেন সাহেব দ্বারকানাথবাবুকে অতি হর্ষচিত্তে বলিলেন যে "দেখ দ্বারকানাথ লাঠির বড় গুণ, লাঠির চোটে আমার গরু পূর্ব্ববৎ ২০ সের করিয়া দুগ্ধ দিতেছে।"

দ্বারকানাথবাবুর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই প্রবন্ধে তাঁহার প্রসঙ্গ শেষ করিব। তাঁহার যখন খুব উন্নত অবস্থা, যখন তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া, কার ঠাকুর কোম্পানির হাউসের এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা, তখন তাঁহার সহিত সেই প্যাটেল সাহেবের বিলক্ষণ মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল; এমন কি প্যাটেল সাহেব দ্বারকানাথবাবুর অনিষ্ট করিতে পারিলে ছাড়িতেন না, কিন্তু মৌখিক সদ্ভাব কি আলাপের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এই সময়ে ঢাকা বিভাগের বরদাখাত পরগণা জমিদারীর সদর খাজনা বাকী পড়াতে সেই জমিদারী লাটে উঠিয়াছিল। প্যাটেল সাহেব তখন সদর বোর্ডের প্রধান সেক্রে

এবং আমার সর্ব্বাচ্ছাদক পূজ্যপাদ মাতুল ৺রামলোচন ঘোষ সেই বোর্ডের দেওয়ান অর্থাৎ সেরেস্তাদার। বরদাখাত পরগণা লাটে উঠিলে প্যাটেল সাহেব স্থির করিলেন যে, যেহেতু ইহা অতি বৃহৎ এবং বহুমূল্যের সম্পত্তি, অতএব নিজ জেলায় ইহার নিলাম হইলে উপযুক্ত মূল্য উঠিবে না; কলিকাতাব বোর্ডের কাছারীতে নিলাম হইলে অনেক ধনাঢ্য ক্রেতা উপস্থিত হইতে পারিবে সুতরাং অধিক মূল্যে বিক্রয় হওয়া সম্ভব। বরদাখাতের মালিকেরা এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইল; কারণ তাঁহাদের পুনরায় ঐ জমিদাবী ক্রয় করার অভিপ্রায় ছিল, এবং জানিতেন যে নিজ জেলায় নিলাম হইলে অপর ক্রেতাকে তাঁহারা অনুরোধ করিয়া নিরস্ত রাখিতে এবং আপনারা সুলভ মূল্যে তাহা ক্রয় করিতে পারিবেন। অতএব কলিকাতায় যাহাতে নিলাম না হয়, তাহাব চেষ্টার নিমিত্ত সেই জমিদারেরা কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে আমার মাতুলের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মাতুলের নিজের চেষ্টায় সেই কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে না জানিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে পরামর্শের নিমিত্ত দ্বারকানাথ-বাবুর নিকট যাইতে বলিলেন। আমার মাতুল জানিতেন যে এই কার্য্য উদ্ধার করিতে যদি কাহারও ক্ষমতা থাকে, তবে তাহা দ্বারকানাথবাবুর আছে, অন্য কাহারও নাই। কিন্তু তখন প্যাটেল সাহেবের সহিত দ্বারকানাথবাবুর অত্যন্ত বৈরঙ্গভাব, পাছে হিতে বিপরীত ঘটিয়া উঠে, তাহাও মাতুলের মনে সন্দেহ হইল, কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বুদ্ধির কৌশলের উপরে তাঁহার এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে প্যাটেল সাহেবের সহিত উক্ত বাবুর শত্রুতাভাব জানিয়াও তিনি প্রার্থীদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। দ্বারকানাথবাবু যত টাকা চাহিলেন, তাহা জমিদারেরা দিতে স্বীকার করাতে, তিনি তাহাদিগকে সেই টাকা তাঁহার নায়েব রুক্মিণীকান্ত বাবুর নিকট আমানত করিতে বলিয়া দিয়া, পরদিবস প্যাটেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য কথার

পরে দ্বারকানাথবাবু বরদাখাত পরগনার নিলামের কথা উত্থাপন করিয়া প্যাটেল সাহেবকে অবগত করিলেন যে "আপনি এই জমিদারীর নিলাম কলিকাতায় হওয়ার জন্য যে হুকুম দিয়াছেন, তাহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমার নিজের উহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে, জেলায় নিলাম হইলে আমার সুবিধা হইত না, এখানে নিলাম হইলে আমি স্বয়ং আসিয়া ডাকিব, এবং আমি ডাকিলে, বোধ হয় অন্যান্য ক্রেতা আমার প্রতিবন্ধকতা করিবে না।" এই কথাতে চারে মৎস্য লাগিল। একেই দ্বারকানাথ প্যাটেলের চক্ষুশূল, তাহাতে সাহেব উপবস্তু দেখিলেন যে তিনি যে সদভিপ্রায়ে নিলাম কলিকাতায় হওয়ার জন্য স্থির করিয়াছেন, তাহা তাঁহার শত্রু দ্বারকানাথ ঠাকুর নষ্ট করিতে উদ্যত। কাবণ প্যাটেল সাহেব জানিতেন যে দ্বাবকানাথ মনে করিলে যথার্থই অন্যান্য ক্রেতাকে অনুবোধ করিয়া থামাইয়া রাখিতে পারিবে। অতএব যে কার্য্যে দ্বাবকানাথের মঙ্গল হইবে তাহা প্যাটেলেব কখনও করিতে দেওয়া হইবে না। তিনি দ্বারকানাথবাবুকে বলিলেন যে "হাঁ আমি এইরূপ হুকুম দিয়াছিলাম বটে কিন্তু বাকীদায় মালিকেরা আমাব নিকট দরখাস্ত করাতে, আমার এক্ষণে অন্যমত হইয়াছে।" উপসংহারে তিনি হাস্যবদনে তাঁহাকে বলিলেন, যে "না দ্বারকানাথ আমি তোমাকে বরদাখাত জমিদারী কিনিতে দিব না, ইহার নিলাম জেলাতেই হইবে।" এইস্থানে বিবৃত করা আবশ্যক, যে সেই দিবস দ্বারকানাথের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বে জমিদারেরা যথার্থই প্যাটেল সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু সাহেব তখন তাহা না-মঞ্জুর করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ প্যাটেলের নিকট বিদায় লইয়া যাওয়ার পরক্ষণেই তিনি আমার মাতুলকে ডাকিয়া পুনরায় সেই দরখাস্ত পেশ করিয়া জেলাতে নিলাম হওয়ার আদেশ প্রচার করিলেন। প্যাটেল সাহেব মনে মনে খুসি হইলেন, যে তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরকে এমন গুরুতর বিষয়ে নৈরাশ করিলেন,

দ্বারকানাথবাবু আহ্লাদিত হইলেন যে তিনি তাঁহার বৈরঙ্গকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম হইলেন এবং জমিদারেরা তাঁহাদের চেষ্টা সার্থক হইল, দেখিয়া হর্ষচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহাত গেল পূর্ব্বকালেব, এখন আমাদেব সময়ের কয়েকটা কথা বলিব। কৃষ্ণনগরে একজন আসিষ্টাণ্ট সাহেব ছিলেন। তাঁহার নাম ব্যক্ত করার আবশ্যক নাই। তাঁহার নিকট মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও কলেক্টর সাহেব বিচারের নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজদারী ও খাজনার মোকদ্দমা অর্পণ করিতেন। সেই সময়ে খাজনা আদায়ের জন্য পূর্ব্বকালেব হপ্তম পঞ্চম কানুন প্রচলিত ছিল, ১০ আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। খাজানার এই সকল মোকদ্দমাকে সরাসরি মোকদ্দমা বলিয়া লোকে বলিত। আসিষ্টাণ্ট সাহেবের নিকট নথী-পাঠ কবিতে ও হুকুম লিখিতে ফৌজদারী হইতে ফৌজদারীর পেষ্কার উমাকান্ত বসু ও সরাসরি মোকদ্দমার জন্য কলেক্টবীর মোহরর ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ফৌজদারী মোকদ্দমাব শুন'নীব সময় উমাকান্ত এবং সরাসরি মোকদ্দমার শুনানীব সময় ব্রজগোপাল আসিষ্টাণ্ট সাহেবের নিকট উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এখনকার ন্যায় তখন বিলাতের ডাক প্রতি সপ্তাহে আসিত না, পক্ষান্তে আসিত। বিশেষত ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ছিল না, সুতরাং একটা ডাকের দিন মারা গেলে পুনবায় পনের দিবস অপেক্ষা না করিলে বিলাতে পুনরায় চিঠি পাঠানর সুযোগ হইত না। এই নিমিত্ত বিলাতি ডাকের দিবসে সাহেবেবা সকলেই বিলাতে চিঠি-পত্র লিখিতে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন এবং এমনও কখন কখন ঘটিত যে হাকিমেরা সেই দিবস কাছাবীর কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া কেবল পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐরূপ এক বিলাতি ডাকের দিবস এই আসিষ্টাণ্ট সাহেব কাছারীতে আসিয়া বিলাতী পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কাছারীর কার্য্যের ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্য যে আমলা উপস্থিত থাকে, তাহাকে ডাকিয়া কার্য্য আরম্ভ

করিতে চাপরাশিকে হুকুম দিয়া মাথা গুঁজিয়া পত্র লিখিতে মগ্ন হইলেন। সেই তলবমতে কলেক্টরীর মোহরের ব্রজগোপাল এজলাসে আসিয়া খাড়া হইল। সাহেব ঘাড় তুলিয়া তাহাকে দেখিলেন না, কিন্তু ব্রজগোপালের কাগজপত্র নাড়া-চাড়ার শব্দে বুঝিতে পারিলেন, যে আমলা উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহা বুঝিয়া তিনি সেই ভাবেই "পড়ো" বলিয়া হুকুম করিলেন। ব্রজগোপাল তদনুযায়ী এক খাজনার মোকদ্দমার নথী পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। ওদিকে সাহেবের চিঠি লেখাও চলিতে লাগিল। কিন্তু সাহেবের মন কেবল চিঠি লেখাতেই নিবিষ্ট। আমলা কি ছাইভস্ম পড়িতেছে তাহা তাঁহার কর্ণে কেবলমাত্র স্পর্শ করিতেছে কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়ের স্নায়ু সকল এমনই স্পন্দহীন যে তদ্দারা ব্রজগোপালের উচ্চারিত শব্দগুলি অন্তরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। কাছারী ঘরে টুঁ-শব্দটি নাই, কেবল একদিকে ব্রজগোপালের নথী পাঠের গড়গড়ানী শব্দ আর একদিকে সাহেবের কলমের চড়চড়ানী শব্দ ; এই দুই শব্দ বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর উপন্যাসে লিখিত "উজ্জ্বলে মধুরে" মিলনের ন্যায় মিলিত হইতেছে। কিয়ৎকাল পরে ব্রজগোপালের নথী পাঠ করা সমাপ্ত হইল, কিন্তু সাহেবের পত্র লেখার বিরাম নাই। আমলা চুপ করিল দেখিয়া সাহেব পুনরায় বলিলেন "পড়ো" আমলা উত্তর করিল যে "খোদাবন্দ তামাম হুয়া।" তাহাতে সাহেব সেইরূপ ঘাড় গুঁজিয়া কলম চালাইতে চালাইতে বলিলেন যে "আচ্ছা লিখো হুকুম, তিন মাস ফাটক, আওর দশ রূপিয়া জরিমানা, না দেয় ত আর ১৫ রোজ ফাটক বা জিঞ্জীর।" ব্রজগোপাল হুকুম শুনিয়া স্তম্ভিত, খাজনার মোকদ্দমায় চোরের শাস্তি ; কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, এবং সাহেবকেও ত্যক্ত করিতে সাহস করিল না, এমতাবস্থায় সে এক হস্তে নথী আর এক হস্তে কলম লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণেক বাদে সাহেব হুকুম দস্তখত করার মনস্থে নথীটা লইবার নিমিত্ত এক হস্ত প্রসারণ করিবায় আমলা

অবকাশ পাইয়া বলিল যে "খোদাবন্দ ইয়ে সরাসবি মোকদ্দমাকা নথী হেয়।" এই কথা শুনিয়া তখন সাহেব ঘাড় তুলিয়া আমলাব প্রতি দৃষ্টি করিলেন এবং কোন্ আমলা নথী পড়িতেছিল তাহাকে দেখিয়া বলিলেন যে "ও তোম্ ব্রজগোপাল হেয়, হাম জাস্তা, তোম্ উমাকান্ত, আচ্ছা লিখো, মোকদ্দমা ডিসমিস।"

হৌষ্টন এবং স্কিনব নামক দুইজন সিবিলিয়ান ছিলেন, ইঁহাদিগকে লোকে "পাগলা" বলিয়া অভিহিত করিত। ইহাব মধ্যে হৌষ্টন সাহেব উচ্চবংশোদ্ভব ছিলেন। তিনি আমাদেব এককালের বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর জ্ঞাতি অথবা কুটুম্ব হইতেন। সেই নিমিত্ত তিনি নীচবংশোদ্ভব সাহেবদিগকে বড় গ্রাহ্য করিতেন না। বঙ্গেব প্রথম ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবকে তিনি "ফিতা ফেবোযকা লড়কা" অর্থাৎ ফিতা বিক্রেতাব পুত্র বলিয়া তুচ্ছ করিতেন। হৌষ্টন নিজে যেমন বড় ঘবেব লোক, তেমনই এদেশীয় ভদ্রলোককে যথেষ্ট খাতিব করিতেন। তাঁহাব অধীনে চাকবী খালি হইলে অগ্রে বেগেব গাঙ্গুলী তারপবে ফুলের মুখুটি প্রভৃতি কুলীনকে নিযুক্ত কবিতেন এবং কায়স্থেব মধ্যে বসু, ঘোষ, মিত্র পাইলে অন্য কাহাকেও দিতেন না। বিক্রমপুরেব লোকের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সেই স্থানেব লোকেরা লেখাপড়ায় বড় মজবুত। আমলাদিগেব কাহাবও কোন পীড়া হইলে শ্রীফল ছিল তাঁহার নিকট সর্ব্বৌষধ মহৌষধ। ব্যামোহের কথা উপস্থিত হইলেই তিনি "বেল খাও" "বেল খাও" বলিয়া পরামর্শ দিতেন এবং নিজেও অনেক বেল ধ্বংস করিতেন। হৌষ্টন কৃষ্ণনগরে কলেক্টর হইয়া আসিলেন। গ্রীষ্মকালে কাছারীর বাহিরে বৃক্ষতলায় বসিয়া কাছারী করিতেন এবং সকলকে পাগড়ী ও চাপকান ইত্যাদি পোষাক পরিয়া কাছারী আসিতে নিষেধ করিতেন। তিনি বলিতেন যে বাঙ্গালীরা বাড়ীতে কেবল ধুতি চাদর পরিয়া থাকে অতএব সেই পরিচ্ছদে তাহারা কর্ম্ম করিতে কষ্টবোধ করিবে না। কাছারীর আসল কাজ তিনি কিছুই

করিতেন না, কিম্বা করিতে পারিতেন না। কেবল আজ এক ঘর হইতে আর এক ঘরে কেরাণীখানা ও কল্য এজলাসের মেজটা উত্তর দিক হইতে পূর্ব্বদিকে স্থানান্তর করা ইত্যাদি মিথ্যা কার্য্যে সময় অতিবাহিত করিতেন। লর্ড ড্যালহৌসী এই হৌইন সাহেবকে এক বিভাগের কমিসনর করিয়াছিলেন কিন্তু রেবিনিউ বোর্ড হৌইনের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে লর্ড ড্যালহৌসী বোর্ডকে এমন তিরস্কার করিয়াছিলেন যে কোন সিবিলিয়ানের প্রতি পূর্ব্বে এমন কটুবাক্য কেহ প্রয়োগ করে নাই। লর্ড ড্যালহৌসী বোর্ড সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই যে "It is an unparallelled presumption on the part of the Board" অর্থাৎ "বোর্ডের ইহা অনির্ব্বচনীয় গোস্তাকী।"

স্কিনর সাহেব হৌইনের ন্যায় তত অকর্ম্মা ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার পেটে পেটে নষ্টামি ছিল। তিনি ঢাকায় থাকনাবস্থায় এক-দিবস কাছারী আসিয়া লাটসাহেব আসিয়াছেন বলিয়া আমলাদিগকে কাছারী বন্ধ করিতে বলিলেন। আমলারা অবাক। তাহারা কহিল যে এমন বৃহৎ ব্যাপার পূর্ব্বে কিছুমাত্র সংবাদ নাই, বিশেষ লাটসাহেব আসিলে তোপধ্বনি হইবে, তাহাও হইল না,—ইহা কেমন কথা? তাহাতে স্কিনর সাহেব উত্তর করিলেন, যে "তোমলোক্ পাগল, গবর্ণর লাটসাহেব নেহি, হাম্‌রা লাটসাহেব, হামারা মেম সাহেবকা ভাই।" স্কিনর সাহেব পরে ঢাকায় মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন, তখন পুলিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকাতে আমলারা প্রাতঃকালে সাহেবের কুঠীতে যাইয়া থানা সকল হইতে আগত রিপোর্ট পাঠ করিয়া শুনাইত। স্কিনর সাহেবের কুঠীর যে কামরায় এইরূপ রিপোর্ট শুনানি হইত তাহাতে একবার নূতন কলিচূণ ফিরান হইয়াছিল। চূণ ফিরান হইলে পরে যে দিবস পুনরায় সেই ঘরে সাহেবের বৈঠক হইল, সেই দিবস সাহেব রিপোর্ট শুনিবার সময় একজন অতি কৃষ্ণবর্ণ আমলাকে ডাকিয়া দেয়ালের দিকে মুখ

করিয়া দাঁড়াইতে আজ্ঞা করিলেন এবং তাহার পশ্চাদ্দিকে স্বয়ং দাঁড়াইয়া দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া তুড়ি দিতে দিতে সেই আমলাকে "চলো চলো" বলিয়া দেয়ালে যে পর্য্যন্ত তাহার মুখ না ঠেকিল, সে পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গেলেন। দেয়ালের চূণ আমলার মুখে লাগিয়া বিকৃত হইল, দেখিয়া স্কিনর সাহেব উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবশেষে একজন চাপরাশি সঙ্গে দিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিলেন, যে পথের লোকও তাহাকে দেখিয়া হাসিবে। শেষে স্কিনর সাহেব কৃষ্ণনগরের জজ হইয়াছিলেন। সেখানে আসিয়া বিচার করা যেমন তেমন, আমলাদিগকে জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছিলেন। কাছারীর সম্মুখে বৃক্ষের উপরে কাক কিম্বা অন্য কোন পক্ষী ডাকিতে পারিত না। একদিন কয়েকটা কাক সেই বৃক্ষের উপরে বসিয়া কা কা করিয়াছিল বলিয়া তিনি "নাজির হাম্‌কো খুন কিয়া, নাজির হাম্‌কো খুন কিয়া" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাছারী ঘর ফাটাইয়া দিয়াছিলেন এবং অবশেষে নাজিরকে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া ২৫ টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। উকীলদের বক্তৃতা করিবার সময় জজসাহেব মুখ বিকৃতি করিয়া তাঁহাদিগকে ভেঙ্গাইতেন। তাঁহার সেরেস্তাদার সেকালের বৃদ্ধ একটি ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি খিড়কীদার পাগড়ী ও জামাজোড়া পরিয়া কাছারী আসিতেন। একদিন স্কিনর সাহেব সেরেস্তাদারকে খাসকামরায় নির্জ্জনে পাইয়া সেরেস্তাদারের কোমর ধরিয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত খেমটানাচ নাচিয়াছিলেন। আর একদিন সেরেস্তাদারকে তিনি তাঁহার কুঠীতে কোন কার্য্যের নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেরেস্তাদার হাতার বাহিরে পালকি রাখিয়া পদব্রজে হাতার মধ্য দিয়া যাইতেছিল। ইতিমধ্যে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। স্কিনর সাহেব তাহা দেখিয়া শীঘ্র তাঁহার কুঠীর সকল দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রহিলেন। বুড়া সেরেস্তাদারের মাথার উপরে সেই বৃষ্টি যতক্ষণ পড়িয়াছিল ততক্ষণ সাহেব দরজা খুলিলেন না, বৃষ্টি শেষ হইলে চাপরাশি [illegible]

সেরেস্তাদারকে কাছারী ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। এইরূপ স্কিনর সাহেবের কত কাহিনী আছে, বলিতে হইলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া যায়, অতএব ক্ষান্ত রহিলাম।

এই প্রবন্ধ এখনই আমার সংকল্পের অতিরিক্ত লম্বা হইয়া পড়িয়াছে অতএব কেবলমাত্র আর্ একটি ঘটনার কথা বিবৃত করিয়া ইহার উপসংহার করিব। কৃষ্ণনগরে স্কোন্স নামক একজন জজ আসিয়াছিলেন। তিনি যেমন সুবিচারক তেমনই অতি নম্রপ্রকৃতি-বিশিষ্ট ছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষাতেও তাহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল।তিনি যথার্থই দেবপ্রকৃতির লোক ছিলেন এবং যে অল্পকাল কৃষ্ণনগরে জজিয়তি করিয়াছিলেন তাহাতেই তিনি বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। একটি অতি নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মোকদ্দমা এই স্কোন্স সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণের কয়েক বিঘা ব্রহ্মত্র ভূমি একজন জমিদার বাজেয়াপ্ত করার নিমিত্ত আদালতে নালিশ করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের সৌভাগ্যক্রমে তাহা স্কোন্স সাহেবের হস্তে পড়িয়াছিল। যে দিবস উভয় পক্ষের উকীলের সওয়াল জবাব হয়, সেই দিবস ব্রাহ্মণটি প্রথম হইতে গলবস্ত্র হইয়া জজসাহেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। উকীলের বক্তৃতা শেষ হইলে পরে সাহেব ব্যক্ত করেন যে তিনি শেষ কাছারীতে অর্থাৎ টিফিনের পরে এই মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিবেন। ব্রাহ্মণটি তাহা শুনিয়া কাছারী ঘরেতেই রহিল। টিফিনের সময় দেখিল যে তিনি আহারের পরে একটি গ্লাসে করিয়া শেরী সরাব পান করিলেন এবং ইচ্ছা হইলে আরও পান করিবার নিমিত্ত খানসামা সরাবের বোতলটা মেজের উপরে রাখিয়া গেল। ব্রাহ্মণ কখনও সুরা বা সরাব দেখে নাই, লাল রঙ্গের জল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে অবগত হইল যে উহা সরাব। টিফিনের পরে কাছারী পুনরায় আরম্ভ হইলে পর সাহেব ব্রাহ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন যে এখন তিনি তাঁহারই রায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ

অগ্রসর হইয়া দুই হাত জোড় করিয়া বলিল যে “দোহাই সাহেব আজ আমার মোকদ্দমার রায় লিখিবেন না, কল্য কিম্বা অন্য যে দিন ইচ্ছা প্রাতে লিখিবেন।”

সাহেব। কেন, অদ্য নিষ্পত্তি করিলে তোমার কি আপত্তি আছে?

ব্রাহ্মণ। সাহেব বেজার না হয়েন, তবে বলি।

সাহেব। না আমি বেজার হইব না, তুমি নির্ভয়ে বল।

ব্রাহ্মণ। সাহেব তুমি যে এইমাত্র সরাব খাইলা; আরও দেখিতেছি খাইবা, সরাব খাইলে নেশা হইবে; তখন কি লিখিতে কি লিখিবা; হয়ত আমার সত্য মোকদ্দমাটি নষ্ট করিবা। আমি দেখিয়াছি আমাদের গ্রামে একজন ভদ্রলোক মদ খাইয়া তাহার মাতাকে শালী বলিয়া গালি দিয়াছিল; অতএব সাহেব মাপ কর, অদ্য অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়া আমার মোকদ্দমায় ক্ষান্ত থাক।

সাহেব। ইহা সে প্রকার সরাব নহে, ইহাতে আমরা মাতাল হই না, বরং ইহাতে আমাদের মস্তিষ্ক আরও পরিষ্কার হয়—

ব্রাহ্মণ। আমার পরিষ্কারে কাজ নাই সাহেব, যাহা আছে তাহাই ভাল,—আপনি আজ ক্ষান্ত থাকিয়া কাল আমার মোকদ্দমা করিতে আজ্ঞা হউক।

সাহেব। না অদ্যই করিব।

ব্রাহ্মণ। দোহাই সাহেব, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এই ভূমিটি ভোগ করিয়া আমি একটি টোল চালাই, তাহা হারাইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আপনার সুখ্যাতি শুনিয়া আমার বড়ই ভরসা হইয়াছিল, কিন্তু এখন দেখিতেছি পরমেশ্বর আমাতে বৈমুখ হইলেন।

সাহেব। না তোমার কিছু ডর নাই, আমি সুবিচার করিতে চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মণ। সাহেব নেশা হইলে আপনি তাহা কখনই পারিবেন না।

ব্রাহ্মণ সাহেবকে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিল কারণ ব্রাহ্মণ ত শেরী কিম্বা অন্য ভাল সরাবের গুণ অবগত ছিল না, সে জানিত যে সকল সরাবই একপ্রকার ; সরাব খাইলে হাড়ী, ডোম, চণ্ডালের ন্যায় মাতাল হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। সাহেব ব্রাহ্মণের অকপটতায় রোষ না করিয়া বরং আমোদিত হইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বারম্বার তাঁহাকে ত্যক্ত করাতে তিনি তাহাকে কাছারীর বাহিরে লইয়া যাইতে নাজিরকে ইঙ্গিত করিলেন। ব্রাহ্মণ বাহিরে যাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং সাহেবের নিকট পুনরায় যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নাজির তাহা করিতে দিল না। অবশেষে প্রায় দুই ঘণ্টা বাদে সাহেব তাহাকে ডাকাইয়া শুনাইয়া দিলেন যে তিনি তাঁহাকে ডিক্রী দিলেন। ডিক্রীবাক্য শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ দুই হস্ত উঠাইয়া বলিল যে "সাহেব তোমার জয়জয়কার, তোমার গঙ্গালাভ হউক!" আমিও বলি যে পাঠকগণ যাঁহারা সহিষ্ণুতার সহিত আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাঁহাদেরও জয়জয়কার এবং গঙ্গালাভ হউক।

বেদিয়াজাতি ও বেদিয়াচোরের কথা

য়ুরোপ এবং এদেশ

নানা বিষয়ের নিমিত্ত নদীয়া জেলা বঙ্গদেশের মধ্যে একটি অতি প্রসিদ্ধ প্রদেশ ছিল। আদৌ কৃষ্ণনগরের স্বাস্থ্যকর বায়ু। খড়িয়া নদীর নির্ম্মল জল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কৃষ্ণনগরের সরভাজা। নবদ্বীপের মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব, চতুষ্পাঠী ও পণ্ডিতমণ্ডলী। শান্তিপুরের বস্ত্র। গড়ের ঘি। ফুলিয়ার মুখুটি। রাণাঘাটের পাল-চৌধুরী। উলার পাগল। হিঙ্গলীর তামাকু। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ। সিমহাটীর খড়্গা। কাঁচড়াপাড়ার বৈদ্য। উলাশীর কা'ন। এইসকল নিমিত্তই নদীয়া জেলা প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এইক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ অবস্থান্তর হইয়াছে। কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়া জ্বর; এখন কলিকাতা হইয়াছে স্বাস্থ্যকর। খড়িয়া নদীর জল স্থানে স্থানে শুখাইয়া গিয়াছে। রাজার কেবল নামমাত্র ঠাট আছে। অনেক স্থানের মোদকেরাই এক্ষণ সরভাজা প্রস্তুত করিতে পারে। এদিকে গৌরাঙ্গদেবের প্রতি লোকের ভক্তি কমিয়া আসিতেছে, অন্যদিকে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যও প্রায় অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। বিলাতি বস্ত্র কেবল শান্তিপুরের কেন, বঙ্গদেশের সমুদয় তাঁতিকুলের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। গড়ের ঘৃতে আর পূর্ব্ববৎ সৌরভ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের সম্মুখে কৌলীন্য মর্য্যাদার মস্তক নত হইয়াছে। পিনাল কোডের শাসনে পাল-চৌধুরীদিগের সেকালের প্রাদুর্ভাব নাই। জ্বরে উলা ছারখার হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ফেলিয়া এখন আর কেহ বৈদ্যের নিকট যায় না, এবং থিয়েটার এবং নাটকের

সম্মুখে লোকের নিকট আর কানের গীত ভাল লাগে না। একদিকে যেমন কৃষ্ণনগর জেলা সুলোক এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, অন্যদিকে এই জেলায় বদমায়েসের ও চোর ডাকাতেরও অভাব ছিল না। দারোগার কাহিনীতে কৃষ্ণনগর জেলার গোপজাতীয় মনুষ্যদিগের সাধারণ চরিত্রের কথা বর্ণনা হইয়াছে। এক্ষণে আর একপ্রকার বদমায়েসের বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে। এই প্রবন্ধে কৃষ্ণনগর জেলার সিন্ধাল চোরের কথা বিবৃত করিতে ইচ্ছা করি।

সিন্ধাল চোর সর্ব্বত্রই সকল জাতীয় মনুষ্যমধ্যে আছে, কিন্তু কৃষ্ণনগর জেলার কয়েকখানি গ্রামের সমুদায় অধিবাসীরা যেমন এই কার্য্যে রত এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

পৃথিবীর অনেক দেশে বেদিয়া জাতির বাস আছে। ইহাদের আদি বৃত্তান্ত এমন ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন যে ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা এখনও কিছুমাত্র ভেদ করিতে পারেন নাই। স্বভাব প্রকৃতিও ইহাদের সকল স্থানে একই প্রকার দৃষ্টি হয়। নানাস্থানে ভ্রমণই ইহাদের সকলের বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহারা স্থির হইয়া এক স্থানে থাকে না। অদ্য এখানে কল্য আর এক স্থানে চলিয়া যায়; সেইজন্য ইহাদের মধ্যে ঘর দুয়ার তৈয়ার করার রীতি নাই। চর্ম্মের কিম্বা অতি সামান্য বস্ত্রের অনুচ্চ শিবিরের মধ্যে ইহারা জীবন যাপন করে। ঐ শিবির সকল এমন হালকা, যে তাহা অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লওয়া যাইতে পারে। ইংলণ্ডে ইহাদিগকে জিপ্‌সী এবং ইউরোপ খণ্ডের কোন স্থানে জিঙ্গারী, কোনও স্থানে জিমরী প্রভৃতি নামে ইহারা খ্যাত। চৌর্য্যবৃত্তিই ইহাদের প্রধান ব্যবসায় এবং সেই নিমিত্ত ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে ইহাদের বিরুদ্ধে অনেক অনেক কঠিন আইন বিধিবদ্ধ আছে। যদিও ইহারা যখন যে দেশে অবস্থিতি করে তখন সেই দেশের ভাষা অবলম্বন করে তথাপি ইহাদের নিজের এক স্বতন্ত্র ভাষা আছে; উহা কেবল উহারাই বুঝিতে পারে. দেশের অন্য লোকে

বুঝিতে পারে না। ইহাদের আপনাদের মধ্যে প্রত্যেক দেশে এক এক জন রাজা আছে এবং তাহাদের সামাজিক বিষয়ে সেই রাজার মীমাংসাই অলঙ্ঘনীয়। চুরি করার স্বভাবটা ইহাদের এমন মজ্জাগত যে ইংলণ্ডে কোন গ্রামে কিম্বা পল্লীতে নূতন এক দল জিপ্‌সী আসিলে অধিবাসীরা শশব্যস্ত হইয়া পড়ে। লোকের হংস, কুক্কুট, মেষ শাবক ও ছাগ ছাগী এবং বাগিচার ফল প্রভৃতি সর্ব্বদাই এই সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, এবং চুরিবিদ্যায় ইহারা এমন পটু এবং ইহারা এমন বেমালুম চুরি করিতে পারে, যে তাহাদের হস্তে চোরামাল আবিষ্কার করা পুলিশের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। কেবল দ্রব্য কিম্বা পশুপক্ষী অপহরণ করিয়া জিপ্‌সীরা ক্ষান্ত থাকে না, সুবিধা পাইলে অধিবাসীদিগের শিশু বালক বালিকাও চুরি করিয়া স্থানান্তরে বিক্রয় করে। যাঁহারা ইংরাজীতে সর ওয়ালটার স্কট সাহেবের অপূর্ব্ব গাই ম্যানরিং প্রভৃতি নবেল পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই জাতীয় লোকের বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্যক হইবে না; কারণ ঐ সকল পুস্তকে জিপ্‌সীদিগের প্রচুর বর্ণনা আছে।

চুরি ভিন্ন জিপ্‌সীদিগের আর এক বিদ্যা আছে, তদ্দারা তাহারা সভ্য ইংলণ্ডেও বিলক্ষণ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। ইহারা বলে যে মনুষ্যের কর (কোষ্ঠী) দেখিয়া তাহারা সেই ব্যক্তির অদৃষ্টের ফলাফল ব্যক্ত করিতে পারে। সভ্য ইউরোপ খণ্ডের মহিলাদিগের মধ্যে স্বামীশিকার একটি প্রধান রোগ এবং সেই উদ্দেশ্যে এমন কোনও কার্য্য নাই, যাহা তাহারা করিতে প্রস্তুত না। জিপ্‌সীরাও মহিলাদিগের এই প্রবৃত্তি জানিয়া প্রচার করে যে তাহারা যুবতীর করস্থিত রেখা দেখিয়া বলিতে পারে যে সেই মহিলার মনোমত স্বামী জুটিবে কি না এবং সেই নিমিত্ত কুমারীরাও ঝাঁকে ঝাঁকে জিপ্‌সীদিগের নিকট কর (কোষ্ঠী) দেখাইতে যায়। অনেক কৃতবিদ্য মহিলা বলেন যে তাঁহারা জিপ্‌সীদিগের কথায় বিশ্বাস করেন না,

কেবল তামাশা দেখিবার জন্য করকোষ্ঠী দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু ফল কথা এই যে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, শীঘ্র একটি সুন্দর এবং ধনবান স্বামী পাওয়ার কথা জিপ্‌সীর মুখে শুনিলে, সেই মহিলার হৃদয় যে আহ্লাদে পুলকিত না হয়, এমন কখনও বোধ হয় না। পক্ষান্তবে জিপ্‌সীদিগেব গণনায় যে কিছু সাব নাই এমন কথা বলাও দায়। যাহারা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে জোসেফাইন নাম্নী মহিলা নেপোলিয়ানকে তাঁহার যুবা বয়সে প্রণয়পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহার বালিকাবস্থায় এক জিপ্‌সী তাঁহার কর দেখিয়া বলিয়াছিল যে জোসেফাইন এক সময় রাজ্ঞী হইবে কিন্তু কিছুকাল পরে তাহার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ফলেও জোসেফাইনের অদৃষ্টে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। নেপোলিয়ান জোসেফাইনকে বিবাহ করেন, এবং নেপোলিয়ান ফ্রান্সের সম্রাট হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে জোসেফাইনও রাজ্ঞী হইয়াছিলেন। কিন্তু জোসেফাইনের গর্ভে পুত্রসন্তান না হওয়াতে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অষ্ট্রিয়ার এক রাজকন্যাকে পুনরায় বিবাহ করেন। জিপ্‌সী যখন জোসেফাইনের কর দেখিয়া গণনা করিয়াছিল তখন নেপোলিয়ানের সহিত জোসেফাইনের আলাপ পরিচয়ও ছিল না এবং নেপোলিয়ানের সম্রাট হওয়ারও বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। বরং সেই সময় ফ্রান্সদেশ যে আর কখনও রাজার শাসনাধীন হইবে না, তাহাই সেই দেশের অধিবাসীদিগের স্থির বিশ্বাস ছিল। ঘটনার এত দীর্ঘকাল পূর্ব্বে একজন জিপ্‌সী কি প্রকারে জোসেফাইনের অভাবনীয় অদৃষ্ট ঠিক ব্যক্ত করিয়াছিল তাহা দেখিয়া ইউরোপ খণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা চমৎকার বোধ করিয়াছিলেন। যাঁহারা ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যবোধ করেন না। কিন্তু যাঁহাদের উহাতে বিশ্বাস নাই তাঁহারা নির্ব্বাক্। এইরূপ শত সহস্র ঘটনায় জিপ্‌সীদিগের কথার উপরে ইউরোপ খণ্ডের

মহিলাদিগের বিষম আস্থা হইয়াছে।

ইউরোপ খণ্ডের বেদিয়া সম্বন্ধে আমি এই স্থানে আর একটা সত্য উপন্যাস পাঠকগণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ব্যক্ত করিব। অনেক জিপ্‌সী স্ত্রীলোক ইউরোপের অন্যান্য জাতীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় সুন্দরী হইয়া থাকে এবং তাহারই একজন সুলক্ষণা যুবতীকে দেখিয়া হঙ্গেরি দেশের একজন বড় ঘরের যুবক মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেই যুবকের পদমর্য্যাদা ধন এবং সম্পত্তি এত অধিক ছিল যে ইউরোপের যে রাজার ঘরে ইচ্ছা সে বিবাহ করিতে চাহিলে. রাজারা তাহাকে কন্যা দিতে অসম্মান বিবেচনা করিতেন না। কিন্তু কেমনই তাহার মস্তিষ্কের ঝোক যে কেবল সেই জিপ্‌সী যুবতীর প্রতিই তাঁহার মন ধাবিত হইল। কিন্তু ইহার এক রহস্য এই যে এই যুবক, যাহার পাণিগ্রহণ করিলে তাহার স্বদেশের লক্ষ লক্ষ নারী আপনাকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিত, তাহাকে বিবাহ করিতে সেই জিপ্‌সী কন্যা বা কন্যার পিতামাতা প্রথমে কেহই সম্মত হইলেন না। কিন্তু যুবক তাহ'তে হতাশ না হইয়া বহু কষ্টে এবং জিপ্‌সী কন্যার পিতামাতাকে অনেক ধন দিয়া এবং কন্যাকে সুখভোগের লালসা দেখাইয়া, পরিণামে আপন অভীষ্ট-সিদ্ধ করিল। বিবাহ করিয়া যুবক তাহার সখের স্ত্রীকে হীরা মুক্তায় ভূষিত বহুমূল্যের পোষাকে সজ্জিত করিয়া সম্রাটের দরবারে লইয়া যাইয়া পরিচিত করিয়া দিল ও গৃহে যাহাতে যুবতীর মনস্তুষ্টি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হয় তাহা করিতে ব্যয়ের ত্রুটি করিল না। এইরূপে প্রায় একবৎসরকাল যুবক যুবতীকে লইয়া অতিবাহিত করিল কিন্তু তাহার পরেই জিপ্‌সীর মনের ভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ সে আমোদ প্রমোদ ছাড়িয়া নির্জ্জনে বাস করিতে আরম্ভ করিল। মফঃস্বলে এক পর্ব্বতের উপরে তাহাদের যে এক গৃহ ছিল সেই গৃহের গবাক্ষ দিয়া সমস্ত দিন কেবল দূরস্থিত শৈলমালার শোভা দৃষ্টি করিত। তাহার স্বামী তাহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কতরূপ কত চেষ্টা করিত কিন্তু কিছুতেই তাহাকে উল্লসিত

করিতে পারিত না। সর্ব্বদাই ম্লান বদনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিত এবং কেহ তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর করিত যে কি জন্য তাহাব মন এমন করে, তাহা সে নিজে বুঝিতে পারে না। অবশেষে একদিবস সে নিরুদ্দেশ হইল। কোথায় যে চলিয়া গেল, তাহা কেহ আর অনুসন্ধান করিতে পারিল না। তাহার স্বামী স্বয়ং নানা দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইল; দূত, চব চতুর্দ্দিকে পাঠাইয়া দিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। তাহাকে হারাইয়া সেই যুবক একপ্রকাব পাগলেব ন্যায় হইল। বিষয়কর্ম্ম পবিত্যাগ করিয়া কেবল নির্জ্জনে বসিযা কাল কাটাইত। এই ঘটনাব ৩।৪ বৎসব পরে স্বামীব নিকট সংবাদ আসিল যে রুসিযাব এক প্রান্তে একদল জিপ্‌সীব সঙ্গে সেই যুবতীকে তাহাব কযেকজন প্রজা দেখিয়া আসিয়াছে। স্বামী তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে যাইযা তাহাব স্ত্রীকে দেখিতে পাইল এবং তাহাব সঙ্গে পুনবায় তাহাব গৃহে যাইতে সাধ্য-সাধনা করিল। কিন্তু যুবতী কিছুতেই সম্মত হইল না। বলিল যে এক স্থানে স্থিব হইয়া থাকা তাহাব স্বভাববিরুদ্ধ। বিবাহের পবে প্রথম কয়েকমাস বাজসভা নৃত্য-গীত নাট্যশালা প্রভৃতি দেখিয়া তাহার বিলক্ষণ আনন্দভোগ হইয়াছিল বটে কিন্তু পবে তাহাতে তাহাব বিরক্তি জন্মিয়া উঠিল। গৃহস্থ লোকে যাহাকে সংসার বলে তাহা তাহার ভাল লাগিল না। গৃহ এবং প্রাসাদ—কাবাগার ও অঙ্গের অলঙ্কার—শৃঙ্খল বিশেষ বোধ হইত। তখন তাহার জাতীয় স্বাধীনতার নিমিত্ত তাহার প্রাণ কান্দিতে আরম্ভ করিল। সেই মফঃস্বলের অট্টালিকার গবাক্ষ দিয়া যখন সে পর্ব্বত ও জঙ্গল দেখিত, তখন পূর্ব্ববৎ জঙ্গলে যাইয়া ক্রীড়া করিতে ও পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ হইতে আর এক শৃঙ্গ ভ্রমণ করিতে আকাঙ্ক্ষা হইত। ইহা নিবারণ করার জন্য সে বহু চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারিল না। অবশেষে সেই গ্রামে একদল জিপ্‌সী দেখিয়া মনের বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাদের সহিত পলায়ন করিয়া আসিয়াছে। এত ধনদৌলত

এবং সুখ-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্টবোধ হয় নাই বরং সে এক্ষণে সুখেই আছে। স্বামী তথাপি তাহাকে অনেক অনুরোধ করিল কিন্তু তাহা সে শুনিল না। স্বামী অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া ও যুবতীর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া পিস্তলের গুলি খাইয়া আত্মহত্যা করিল। জাতীয় ধর্ম্মে এমনই একটু গুরুত্ব আছে যে জিপ্‌সী নারীও অতুল ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া তাহা অবলম্বন করে; কেবল পারি না আমরা হতভাগা বাঙ্গালী। জাতীয় ধর্ম্মটা যেন আমাদের চক্ষের বিষ, ত্যাগ করিতে পারিলেই বাঁচি।

এই ত গেল ইউরোপ খণ্ডের বেদিয়াদিগের কথা। ভারতবর্ষেও এই জাতীয় লোকের অভাব নাই। ইহাদিগকে হিন্দুস্থানের সকল প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাদিগকে বয়েদ বলে। দলবদ্ধ হইয়া ইহারা ভারতবর্ষের নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। প্রত্যেক দলের সঙ্গে কয়েকটা করিয়া টাট্টু ঘোড়া থাকে এবং সেইগুলা উহাদের তাঁবু এবং দ্রব্যাদি বহন করে। বালক বালিকারা ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা মধ্যে মধ্যে ঐ সকল ঘোড়া চড়িয়া বেড়ায়। বয়েদদিগেরও স্বতন্ত্র ভাষা আছে, কিন্তু অন্যের সহিত হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বেশ বলবান এবং যুবতীরা দেখিতে কুৎসিতা নহে। প্রকাশ্যে ইহাদের কোনও দল কবিরাজী, কোনও দল ভোজবাজী করিয়া ফিরে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অপহরণ করাই ইহাদের মুখ্য ব্যবসা। পথিমধ্যে নিরাশ্রয় একাকী পথিক পাইলে কিম্বা ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিলে, ইহারা অম্লান চিত্তে আক্রমণ করিয়া যতদূর পারে, লুঠপাট করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। ইহাদের যে কি ধর্ম্ম তাহা কেহ বলিতে পারে না। দেখিতে ইহাদিগকে মুসলমান বোধ হয়, কিন্তু ইহারা মুসলমান নহে। ইহারা অত্যন্ত সুরাপায়ী। হস্তে কিঞ্চিৎ পয়সা হইলেই, প্রথমে শুঁড়িখানায় যাইয়া উপস্থিত হয় এবং স্ত্রীলোকেরা পথের পার্শ্বস্থ গ্রামের হাঁস মুর্গী ও মন্দ তরকারী অপহরণ করিয়া

আহারের যোগাড় করে। কিছু হস্তগত করিতে না পারিলে· অবশেষে ভিক্ষা করিয়া কার্য্য সমাধা করে।

কিন্তু হিন্দুস্থানের অন্যান্য প্রদেশের বেদিয়াদিগের অপেক্ষায় বঙ্গদেশীয় বেদিয়ারা অনেক সভ্য হইয়াছে। প্রকৃত বাঙ্গালী বেদিয়াদিগের মধ্যে উহাদেব জাতীয় পরিভ্রামক স্বভাব এককালে অন্তর্হিত না হইয়া থাকিলেও, বহু পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এইক্ষণে বেদিয়ারা ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া চাষ আবাদ করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ তাহাদিগের মধ্যে লক্ষ্মীশ্রীও প্রকটিত হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে বেদিয়াবা মৃত্তিকায় বাস করে না, জলেব উপবে নৌকার মধ্যে বাস করে। নৌকাই ইহাদেব ঘববাড়ী এবং নৌকাতে ইহাদের জন্ম মৃত্যু হয়। নৌকাতে সাংসাবিক সকল দ্রব্য থাকে। প্রত্যেক বেদিয়ারা এক একখানা পৃথক নৌকা আছে। দরিদ্র হইলেও অন্তত একখানা ডিঙ্গিতে ইহারা বাস করে। বেদিয়া যে পর্য্যন্ত পৃথক নৌকা করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত সে বিবাহ করে না এবং কেহ তাহাকে কন্যাও দেয় না। এই বেদিয়ারা স্ত্রী-পুরুষে নৌকা বায়। যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের নদী দিয়া যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন, যে বেদিয়াব নৌকায় বেদিয়ানী হাল ধরিয়া বসিয়া কিম্বা খাড়া হইয়া আছে, স্বামী তাহার দাঁড় কিম্বা গুণ টানিতেছে। নৌকার ছাপরের উপরে খাঁচার মধ্যে হাঁস মুর্গী কবুতর এবং কোনও নৌকায় পোষা বানর ও বকরী বান্ধা থাকে। ছাপরের ভিতরে বালক বালিকারা খেলা করে এবং নৌকার ছাপর এমন শক্ত করিয়া এবং যত্নের সহিত প্রস্তুত করা, যে তাহা হইতে বালকদের বাহির হইয়া জলে পড়িবার আশঙ্কা থাকে না। বর্ষাকালে পূর্ব্ববঙ্গে প্রতি বৎসর অনেক বালক বালিকা জলে ডুবিয়া মরে, কিন্তু বেদিয়ারা ২৪ঘন্টা জলেরই উপরে বাস করে অথচ তাহাদের মধ্যে ঐরূপ ঘটনা কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। তথা-

কালে নদীর ধারে এক এক স্থানে নৌকা লাগাইয়া বেদিয়ার স্ত্রীলোকেরা দুই-তিনজনে দলবদ্ধ হইয়া গ্রামের মধ্যে গৃহস্থদিগের নিকট সূচ সূতা ছুরি কাঁকই প্রভৃতি মনিহারি দ্রব্য সকল বিক্রয় করিতে যায়। ইহাদের পুরুষেরা সর্প খেলাইয়া কিম্বা ভোজবাজীর তামাশা দেখাইয়া, পয়সা উপার্জ্জন করে। কোনও কোনও স্থানে বেদিয়ারা অনেকে ধনাঢ্য হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি যে বরিশালে একজন বেদিয়ার লক্ষাধিক নগদ টাকার মহাজনী কারবার আছে এবং জনরব এই যে সে একবার প্রচার করিয়াছিল, যে যদি কোন ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থের বালক তাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় তাহা হইলে সে তাহাকে লক্ষটাকা যৌতুক দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু বেদিয়াদিগের যাহার যে ব্যবসা থাকুক, সকলের মধ্যেই চুরি করা কার্যটা পাপ বলিয়া পরিগণিত নহে। যখন দেশেতে পুলিশের শাসন শিথিল ছিল তখন অনেক বেদিয়ারা নৌকায় চুরি ও ডাকাতী করিত। এখনও বোধ হয় সুযোগ পাইলে তাহারা ঐ কার্য্য করিতে ছাড়ে না।

বর্ষাকালে যখন দেশের খাল বিলে জল আইসে, তখন এই বেদিয়াদিগের উৎসব ও আনন্দ কার্য্য করিবার সময় হয় এবং তাহাদের বিবাহ সাদীও এই ঋতুতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোনও বিবাহ উপস্থিত হইলে নানাদিক হইতে এক নির্দ্দিষ্ট বিলের কিম্বা খালের ধারে সেই সম্প্রদায়ের সকল বেদিয়ার নৌকা আসিয়া একত্রিত হয়। বেদিয়ার মর্য্যাদা এবং উপলক্ষ বিবেচনায় এক এক বিবাহে একশতেরও অধিক নৌকা সমবেত হয় এবং ১০।১৫ দিবস পর্য্যন্ত সেই স্থানে মৃত্তিকার উপরে উঠিয়া স্ত্রী-পুরুষে গীতবাদ্য ও নৃত্য করে। এই সময় ইহাদের মধ্যে অনেক সরাব খরচ হয়। সকল নৌকার আগা পাছা নূতন সিন্দুর এবং অন্যান্য রঙ্গ দিয়া সুসজ্জিত করে এবং মাস্তুলের উপরে নানাপ্রকার নিশান উড্ডীয়মান হইতে থাকে। উৎসবের কয়েক দিবস ধরিয়া ইহাদের আহারও

কোন কার্য্য থাকে না, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমোদে মত্ত হয়। স্ত্রীলোকে নূতন বস্ত্রাভরণ পরিয়া সকলের সম্মুখে নৃত্য করে এবং তাহাদের পিতা ভ্রাতা স্বামীব সঙ্গে সঙ্গে ঢোলক ও তবলা বাজায়। উৎসবারম্ভে সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাহার যে স্থানে ইচ্ছা চলিয়া যায়। মৃত্তিকার সহিত এই সকল বেদিয়ার দুই সময় ভিন্ন আর কখনও কোন সংস্রব হয় না। কেবল বিবাহেব উৎসবে ও মবিলে গোর দিতে মাটির আবশ্যক হয়, কিন্তু যে স্থানে এই দুই কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহা তাহারা মূল্য দিয়া ক্রয় করে; কারণ অন্যের মাটিতে তাহা হওয়া বীতি নাই সুতরাং টাকা দিয়া ক্রয় না কবিলে মাটি নিজেব মাটি বলিয়া পবিগণিত হয় না। এই দুই উপলক্ষে ভূম্যধিকারীরা বিলক্ষণ ধন উপার্জ্জন করে। ধনবান বেদিয়া হইলে পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত জমিদারকে দিয়া সন্তুষ্ট করে। বিবাহের উৎসব বা গোব দেওয়া হইয়া গেলে এই ভূমির সহিত বেদিয়ার আর কোন দাবী কিম্বা সম্বন্ধ থাকে না সুতরাং জমিদারের ইহা একটি বিলক্ষণ রোজগাবের পন্থা হয়। বেদিয়াদিগের মধ্যে আর এক রীতি আছে যে তাহারা কখনও মৃত্তিকার উপর শয়ন করে না, যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহারা বাঁশের একটা সামান্য মঞ্চ করিয়া নৌকার ছাপরের ন্যায় এক আবরণের দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া, সেই মঞ্চের উপরে শয়ন করে। জালিয়াদিগের মধ্যে যেমন জালো, মালো কৈবর্ত্ত, তিয়র প্রভৃতি অন্তর্জাতি আছে, সেইরূপ এই নৌ-বেদিয়াদিগের মধ্যেও বেদিয়া, বেবাদিয়া, সান্দার প্রভৃতি জাতি আছে কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সাদী চলে কি না, তাহা আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের নৌ-বেদিয়ার স্ত্রীলোকেরা যেমন নৌকা বায়, এমন প্রথা কেবল চীন রাজ্যে ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে প্রচলিত নাই। চীনদেশেও অনেক বৃহৎ নদী আছে এবং নদীর উপরে ভেলা বান্ধিয়া ও নৌকার উপরে বহুসংখ্যক লোকের বাস। সেই রাজ্যে

সাম্পান নামক একপ্রকার নৌকা আছে, তাহা স্ত্রীলোকে বাহিয়া থাকে। যুবতী স্ত্রীলোকে সুসজ্জিত হইয়া সেই সাম্পান নৌকা চালায় এবং সৌখিন চিনানী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার জন্য সাম্পান পাইলে, অন্য কোন নৌকা কিম্বা যান ব্যবহার করে না। কিন্তু চীন রাজ্যের সাম্পানের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের বেদিয়ার নৌকাব এই একটি প্রভেদ আছে, যে সাম্পান উপার্জ্জনের জন্য চালান হয়; তাহাতে চড়ন্দার প্রভৃতি উঠাইয়া চীনদেশের স্ত্রীলোকেরা পয়সা রোজগার করে। পূর্ব্ববঙ্গের বেদিয়ার নৌকা তাহাদের ঘব বাড়ী এবং তাহাতে তাহারা বাস করা ভিন্ন অন্য নৌকার ন্যায় চড়ন্দার কিম্বা মাল বোঝাই করিয়া ব্যবসা করে না। সাম্পান চালক চিনানী পূর্ব্ববঙ্গেব ন্যায় বেদিয়া জাতীয় স্ত্রীলোক কি না, তাহা আমি জানি না এবং চীন রাজ্যে বেদিয়া জাতির কোন শাখা আছে কিনা তাহা আমি অবগত নহি। কিন্তু যে স্থলে ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডের সকল বিভাগেই এই জাতির বসতি দেখিতে পাওয়া যায়; সে স্থলে চীন দেশে বেদিয়া জাতি একবারে না থাকা, বড় সম্ভবপর বোধ হয় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বেদিয়া জাতির এক বিশেষ স্বভাব এই যে তাহারা পরিভ্রামক কিন্তু কেবল কৃষ্ণনগর ও বারাসত জেলাতে এই ভাবের ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। নদীয়া জেলার কাগজপুকুরিয়া থানার এলাকায় বেলিয়া বিষহরি প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রাম আছে, সেই সকল গ্রামে বেদিয়ার বাস। এই সকল বেদিয়ারা গৃহস্থ এবং হিন্দু মুসলমান প্রজার ন্যায় ইহারা ঘরবাড়ী বানাইয়া তাহাতে পুরুষানুক্রমে বসতি করিয়া আসিতেছে এবং অনেকে চাষ আবাদও করিয়া থাকে। দেখিতে এবং চালচলনে হিন্দু মুসলমানের সহিত ইহাদের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে এই বেদিয়ারা না হিন্দু, না মুসলমান। হিন্দুর ঠাকুর দেবতা মানে এবং পক্ষান্তরে মুর্গীও আহার করে। কিন্তু ইহারা গোমাংস ভোজী নহে। অন্যান্য বেদিয়াদিগের ন্যায় ইহাদেরও এক গুপ্ত ভাষা আছে, কিন্তু সাধারণত তাহারা

বাঙ্গালা ভাষাই ব্যবহার করে। জমিদার এবং তালুকদারের ইহারা অত্যন্ত আজ্ঞাবহ। যাহাদের ভূমিতে ইহারা বাস করে তাহাদিগকে ইহারা খুব সম্মান করে। কলিকাতা অঞ্চলে যে সকল বেদিয়ানী "বাতের বেম ভাল করি, দাঁতের পোকা বাহির করি" বলিয়া মিষ্ট স্বরে রাস্তায় রাস্তায় ডাকিয়া কিম্বা ভানুমতীব বাজী দেখাইয়া বেড়ায়, তাহারা এই সকল স্থায়ী বেদিয়ার দলভুক্ত নহে। কৃষ্ণনগরের বেদিয়ারা যদিও অন্যান্য প্রজার ন্যায় প্রকাশ্যরূপে কাববার করে, তথাপি ইহাদের প্রধান ব্যবসা সিঁধ চুরি। এই কয়েক গ্রামের বেদিয়ারা প্রসিদ্ধ চোর এবং ইহাদের এই স্বভাব বাজপুরুষদিগের নিকটও অবিদিত ছিল না; সেই কাবণে পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের হুকুম ছিল যে, যখন কোন বেদিয়াব নিজ গ্রাম হইতে স্থানান্তর গমন কবার প্রয়োজন হইবে, তখন সে তাহার নিজ থানায় উপস্থিত হইয়া কি উদ্দেশে কোন্ স্থানে যাইবে, তাহা থানার দৈনিক বহিতে লিখাইয়া যাইবে, তাহা হইলে থানাব কর্ম্মচারীরা সেই স্থানের পুলিসের নিকট লিখিলে, তাহারা ঐ বেদিয়ার উপরে দৃষ্টি বাখিতে পারিবে। আব এক নিয়ম ছিল যে, বেদিয়ারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিবার সময় তাহারা নিকটস্থ ফাঁড়ি কিম্বা থানাঘরে উপস্থিত হইয়া তথায় রাত্রিযাপন করিবে এবং থানার রোজনামচা বহিতে বেদিয়ার নাম প্রভৃতি সংবাদ লিপিবদ্ধ থাকিবে। ফাঁড়ি কিম্বা থানাঘরে পৌঁছিতে না পারিলে যে গ্রামে বেদিয়ার বাস করিতে হইবে, সেই গ্রামের চৌকীদার এবং মণ্ডলকে তাহার আত্মপরিচয় দিয়া বাস করিবে। আমি যখন কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালীতে ছিলাম তখন মধ্যে মধ্যে দুই একজন বেদিয়া আসিয়া ঐরূপ থানাঘরে রাত্রিতে বাস করিয়া প্রাতে চলিয়া যাইত। ইহারই এক ব্যক্তির নিকট তাহারা কি প্রকারে চুরি করে তাহার অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে বহুদিনের কথা হইল সকল কথা আমার ভাল করিয়া স্মরণ নাই, যাহা কিছু মনে

আছে, তাহা এই স্থানে বিবৃত করিব। বেদিয়ার বর্ণনা তাহার কথার ভঙ্গিতে লিখিলাম।

"আমাদের প্রধান ব্যবসাই চুরি, লোকে আমাদের ব্যবসার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা মিথ্যা কথা বলি না। আমরা বলি যে আমরা "ছুরি কাঁচির ব্যবসা করি," কিন্তু ছ-শব্দটি এমন মৃদুভাবে উচ্চারণ করি যে তাহাতে ছুরির স্থলে শ্রোতা চুরিই শুনে। নানা-প্রকার চুরির মধ্যে সিঁধ চুরিই, আমাদের প্রধান অবলম্বনীয় এবং অনায়াসে যাহাতে আমরা সেই কার্য্য-সিদ্ধি করিতে পারি, তাহার জন্য আমাদের পুস্তক লেখা আছে। আমরা বাল্যকাল হইতে সিঁধ কাটিবার বিদ্যায় শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমাদের বৃদ্ধ লোকে বালকদিগকে শিশুকাল হইতে এই বিদ্যায় অভ্যস্ত করে। এক নিয়মে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়াতে আমরা সিঁধ দেখিয়া বলিতে পারি, যে তাহা বেদিয়া না অন্য কোন আতাইয়ের হস্তাক্ষর। আমরা নিজ গ্রামে কিম্বা নিজ থানার এলাকায় কখনই এবং পারিলে নিজ জেলাতেও চুরি করি না। শীত ঋতুর আগমনে আমরা দলে দলে বঙ্গদেশের নানা দিকে চলিয়া যাই এবং বর্ষার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়া আসি। ইহাতে আমাদের এক এক দলের এক এক দিন নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং সেই সেই দলের নিকট সেই সেই প্রদেশের অধিবাসীদিগের অবস্থার সংবাদ সংগৃহীত থাকে। আমরা গ্রাম হইতে অনেকে একত্র হইয়া নিষ্ক্রান্ত হই না, কারণ তাহা হইলে পুলিশের সন্দেহ হয়। এক আধজন করিয়া ক্রমে ক্রমে গোপনে বাহির হইয়া এক নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকি। আমরা কেবল চুরি-বিদ্যায় শিক্ষা-প্রাপ্ত হই এমন নহে, কোনও স্থানে ধৃত হইলে পুলিশের যন্ত্রণা পাইয়া একরার না করি, তজ্জন্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেও আমরা অভ্যস্ত হইয়া থাকি, এমন কি, আমাদের এক এক জন নির্দ্দয় গুরু লোহা পোড়াইয়া আমাদের শরীর দগ্ধ করিয়া দেখে, যে আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি কি না। আমরা সোনা রূপার অলঙ্কার, নগদ

টাকা ও মোহর ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য চুরি করি না। তামা, পিত্তল, কাঁসার তৈজসপত্র কিম্বা কোনও প্রকার বস্ত্র আমরা স্পর্শ করি না কারণ এই সমস্ত বস্তু গোপন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। আমাদের মহাজন আছে; তাহাদিগের নিকট আমরা অপহৃত মাল আনিয়া দাখিল করিলে, তাহারা আমাদিগকে সোনার ভরি ১০টাকা ও রূপার ভরি ॥৵০ আনা হিসাবে দেয়। আমরা যদি কখনও আলস্যবশতঃ বাড়ীতে বসিয়া থাকি, যথাসময় চুরি করিতে বাহির না হই, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তি আমাদিগকে উত্তেজনা করিয়া বাড়ী হইতে চুরি করিতে পাঠাইয়া দেয় এবং বৎসরের মধ্যে আমাদের টাকার প্রয়োজন হইলে ইহারা কোনও প্রতিভূ না লইয়া আমাদের যত টাকার আবশ্যক, তাহা প্রদান করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করে; কারণ আমরা তাহাদের রোজগারে পুত এবং আমরাও মহাজনের সহিত কোন প্রবঞ্চনা কিম্বা চাতুরী করি না।

"সিঁধ কাটা, চুরি করা, ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে শিক্ষা পাওয়া ভিন্ন অধিকন্তু আমাদের নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিতে শিখিতে হয়। হিন্দুপ্রধান গ্রামে যাইয়া বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, সন্ন্যাসী, মুসলমানের গ্রামে যাইয়া ফকির মোল্লা মুস্কিল আসান প্রভৃতি সাজিতে হয়। তদ্ভিন্ন অনেক ছদ্মবেশ করিতে আমরা জানি। কখনও আমরা সাপ খেলাই কখনও বানর নাচাই, কখনও দৈবজ্ঞ সাজিয়া লোকের শুভাশুভ গণনা করি। ইহা সকলই আমাদের চুরির উপকরণ স্বরূপে আবশ্যক হয়। আমরা যখন চুরি-যাত্রায় বাহির হই তখন আমাদের প্রত্যেক দলের সঙ্গে দুই-তিনজন করিয়া আমাদের জাতীয় শঠ এবং চতুরা স্ত্রীলোক থাকে তাহারা আমাদের প্রভূত সাহায্য করে এবং যে প্রকারে তাহা করে, তাহা আমি পরে ব্যক্ত করিতেছি। আমরা যখন গ্রাম হইতে বাহির হই, তখন আমরা বলি যে অমুক জেলায় আমরা গরু কিম্বা ছাগল কিনিতে যাইতেছি, কিন্তু আমরা যদি পূর্ব্বে যাই তবে দক্ষিণের নাম করি, এইরূপে লোকের নিকট মিথ্যা বলিয়া আমরা

বাড়ী হইতে চলিয়া যাই। পথে আহারের নিমিত্ত আমাদের নিজের কিছুমাত্র ব্যয় করিতে হয় না কারণ পথিমধ্যে যে সকল স্থানে অতিথি সেবা আছে তাহা আমরা জ্ঞাত থাকিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হই, অভাবে অন্ততঃ ভিক্ষা করিয়া দিনযাপন করি। কার্য্যক্ষেত্রে পৌঁছিয়া হাট-বাজারের কোন এক জনশূন্য স্থানে বাসের জন্য স্থান নির্ণয় করি। আমরা জানি যে প্রত্যেক গ্রামে বদমায়েস এবং চোর আছে, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে আমাদের সহযোগী করি না এবং কাহারও নিকট উপযাচক হইয়া গ্রামের কোন সংবাদ অবগত হইতে চেষ্টা করি না।

"আমাদের দুই প্রকার কার্য্য-প্রণালী আছে তাহাব এক প্রণালী এই যে আমরা সকল সময়ে সকল গ্রামে চুরি করিতে প্রবৃত্ত হই না। এক বৎসব আমরা কয়েকখানা গ্রামের কেবল সংবাদ সংগ্রহ করি এবং সেই যাত্রায় সেই স্থানে ১০।১৫ দিন অবস্থিতি কবিয়া অধিবাসীদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেও আমাদের কোনরূপ ক্ষতি হয় না এবং গ্রামে চুরি না হইলে কেহ আমাদিগকে সন্দেহও করে না। এক বৎসর এইরূপ কেবল সংবাদ আহরণ করিয়া তাহার দুই এক বৎসর পরে সেই স্থানে আমাদের কার্য্য করিতে বিলক্ষণ সুবিধা হয়। যখন আমরা চুরির মানসে সেই স্থানে পুনরাগমন করি তখন আমরা লোকের সহিত অধিক আলাপ না করিয়া ৫।৭ দিবসের মধ্যেই কার্য্য সমাপ্ত করিয়া চলিয়া যাই। চুরি করার মনস্থে গ্রামে উপস্থিত হইলে আমাদের বিবেচনায় ছদ্মবেশ ধারণ করা উচিত; তাহা ধারণ করিয়া গ্রামের মধ্যে লক্ষিত গৃহের চতুর্দ্দিকে সেই বেশ উপযোগী কার্য্য উপলক্ষ করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। যথা আমাদের স্ত্রীলোকেরা বৈষ্ণবী সাজিলে পুরুষেরা দৈবজ্ঞ নচেৎ সাপুড়িয়া হইয়া সেই পল্লীর ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও অন্যান্য অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইতে চেষ্টা করে। গ্রামের যে পুষ্করিণী কিম্বা দীঘিতে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা স্নান করে,

স্নানের সময় আমাদের ছদ্মবেশী বৈষ্ণবীরা হাত মুখ ধুইবার কিম্বা অন্য কোন ছুতা করিয়া সেই ঘাটে যাইয়া কোন্ বৌয়ের কিম্বা ঝিউড়ির অঙ্গে অধিক অলঙ্কার তাহা নিরীক্ষণ কবিয়া দেখে; পরে সেই বৌয়ের স্নান সমাপ্ত হইলে তাহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হয় এবং তাহার সহিত এক সময়ে "জয় রাধে কৃষ্ণ" বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বৌ কিম্বা ঝিউড়ি কোন্ ঘরে যায় তাহা দৃষ্টি করে। আমাদের জানা আছে যে পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকের একটি স্বভাব এই যে, ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিয়া তাহাবা কাপড় ছাড়িবার জন্য আপন আপন শয়ন ঘরে প্রবেশ করে। ছদ্মবেশী বৈষ্ণবীবা সেই কক্ষ নির্ণয় করিলে পবে পুরুষেরা অর্থাৎ আমরা সেই ঘরের পিছাড়া অনাবৃত কি না এবং গৃহ প্রাচীর দ্বাবা বেষ্টিত কি খোলা, বেষ্টিত হইলে কোন্ দিকে কয়টা দ্বাব ইত্যাদি সমুদয় আবশ্যকীয় বৃত্তান্ত যত্নের সহিত ঠিক করি। যে ঘরে কচি শিশু, পীড়িত কিম্বা বৃদ্ধ ব্যক্তি শয়ন করে, তাহাতে আমরা চুরি করিতে চেষ্টা করি না। যে ঘরে চুরি করিব বলিয়া স্থির করি তাহার পুরুষ লম্পট কি না এবং সে কোন্ সময়ে ঘরে আসিয়া শয়ন করে তাহাও আমাদের অবগত হওয়া আবশ্যক। এইরূপে সকল বিষয়ের সুবিধা দৃষ্টি হইলে যে রাত্রিতে চুরি করিব তাহার পূর্ব্বেই কোন্ স্থানে আসিয়া অপহৃত মাল গোপন করিতে হইবে, তাহা স্থিব করিয়া রাখি। মাঠ কিম্বা জঙ্গলের অগম্য স্থানে যেখানে বিষ্ঠা অথবা শ্মশানের বস্ত্র কিম্বা শয্যাখণ্ড থাকে সেই স্থানই আমরা এই কার্য্যের নিমিত্ত মনোনীত করি। যে রাত্রিতে চুরি করি তাহার পরদিবসেই আমরা সেই গ্রাম হইতে পলায়ন করি না কারণ তাহা হইলে আমাদের প্রতি অধিবাসীদিগের সন্দেহ হইলে, তাহারা আমাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে বরং ঘটনার পরে আমাদিগকে সেই স্থানে থাকিতে দেখিলে সন্দেহের কারণ হয় না এবং সন্দেহ হইলে তল্লাস করিয়া আমাদের নিকট চোরা মাল না পাইলে, আমাদের আরও শ্লাঘার কারণ হয়। যে রাত্রিতে চুরি

করিতে হইবে তাহাতে আমরা পারতপক্ষে কখনও অধিক রাত্রে প্রবেশ করি না। বেদিয়া চোরমাত্রেই সন্ধ্যার পরে কার্য্য আরম্ভ করে। সিঁধ দিবার ঘরের পিছাড়া যদি অনাবৃত হয়, তাহা হইলে আমরা নিকটস্থ কোন এক বৃক্ষের বহুপল্লববিশিষ্ট এক শাখা কাটিয়া আনিয়া সংকল্পিত সিন্ধের ঠিক সম্মুখস্থিত স্থানে এমন করিয়া রোপণ করি কিম্বা লাগাইয়া রাখি, যে তাহার অন্তরালে বসিয়া থাকিলে মনুষ্যের দৃষ্টিতে পতিত হইতে হয় না। এইরূপ শাখা সংস্থাপনের উপকার এই যে, রাত্রিকালে হঠাৎ কেহ তাহা দেখিলে স্বাভাবিক ঝোপড়া বন বলিয়া বিবেচনা করে, অন্য কোন সন্দেহ করে না। ঘরের পিছাড়া অনাবৃত না হইলেও আমরা সুবিধামতে ঐরূপ আবরণ অবলম্বন করিতে পারিলে তাহা পরিত্যাগ করি না কারণ উহার অন্তবালে বসিয়া খুব নিঃশঙ্কচিত্তে কার্য্য করিতে পারি। শাখার অন্তরালে সংস্থাপিত হইয়া আমরা তৎক্ষণাৎ সিন্ধ ফুটাইতে আরম্ভ করি। ওদিকে বাড়ীর মধ্যে গৃহস্থেরা স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকে এদিকে আমরা নির্জ্জনে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের সর্ব্বনাশের পন্থায় অগ্রসর হইতে থাকি ; পরন্তু যখন বুঝিতে পাবি যে, মৃত্তিকার প্রাচীব হইলে কেবল এক অঙ্গুলি পরিমাণ মাটি কাটিতে কিম্বা ইটের প্রাচীর হইলে কেবল একখানামাত্র ইট খুলিতে বাকি আছে, তখন আমরা ক্ষান্ত হইয়া নিবিষ্ট মনে বাড়ীর, বিশেষত ঘরের মধ্যে কে কি করিতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করি। ক্রমশঃ গৃহস্থদিগের আহারাদি চুকিয়া যায়, ঘরের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ আসিয়া পান তামাক সেবনান্তে অন্য কোন কার্য্য থাকিলে, তাহা সমাধা করিয়া শয়ন করে। ইতিমধ্যে সমস্ত বাড়ীও নিস্তব্ধ হয়। আমাদের বহিতে লেখা আছে যে, রাত্রের ভাতঘুমই বড় গভীর ঘুম, শীঘ্র ভাঙ্গে না ; অতএব তখনই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার উপযুক্ত সময়। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনেক চোরে অনেক বিপদগ্রস্ত হইয়াছে সুতরাং পারতপক্ষে আমরা তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অবহেলন করি না।

যাই ঘরের লোকের নাসিকা ডাকিতে আরম্ভ করে, অমনি আমরা আর বিলম্ব না করিয়া অবশিষ্ট মাটিটুকু কাটিয়া কিম্বা ইষ্টক কয়েকখানা টানিয়া বাহির করিয়া, সিন্ধটা সমাপ্ত করি। নাসিকার শব্দ নির্ব্বাচন করা বড় সহজ কার্য্য নহে। স্বামী স্ত্রী উভয়ের নাসিকাব শব্দ শুনিতে পাইলেই সুবিধা নচেৎ এমনও কখন কখন ঘটে যে স্ত্রীটা ভ্রষ্টা, স্বামীর নিদ্রার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। তাহা হইলেই আমাদের মুস্কিল উপস্থিত। কিন্তু এমন ঘটনা অতি বিরল ; তথাপি আমাদের কত হিসাব করিয়া কার্য্য করিতে হয় তাহাই আপনাকে বুঝাইবার নিমিত্ত ইহার উল্লেখ করিলাম। যদি ঘরের লোকেরা প্রদীপ নির্ব্বাণ না করিয়া নিদ্রা যায়, তাহা হইলে আমাদের অধিক কষ্ট পাইতে হয় না কিন্তু আলোক নির্ব্বাপিত হইলে আমাদের অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। অনেক মুর্খ লোকের বিশ্বাস আছে যে, মন্ত্রবলে শৃগাল কুকুরের ন্যায় রাত্রিকালে চোরের চক্ষু জ্বলে, নচেৎ কি প্রকারে আমরা অপরিচিত ঘরের মধ্যে অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া কোনও জিনিষপত্র ফেলিয়া না দিয়া অনায়াসে নিস্তব্ধে কেবল বহুমূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করিতে কৃতকার্য্য হই। কিন্তু এইটি ভ্রমাত্মক বিশ্বাস। আসল কথা, এই যে গ্রীষ্মকালে আমাদের নিকট চকমকি ও গন্ধকের দিয়াসলাই* এবং শীতকালে ছোট একটা হাঁড়িতে তুঁষের আগুন থাকে। এই চকমকি এবং দিয়াসলাই আমাদের মহামন্ত্র এবং ইহা দ্বারাই আমরা নিরাপদে আমাদের অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারি। সিন্ধ ফুটাইয়া তাহার মধ্যে প্রথমে আমরা প্রথমে মাথা দিয়া প্রবেশ করি না, প্রথমে দুই পা চালাইয়া তদ্দ্বারা সিন্ধের মুখে কোন প্রতিবন্ধক আছে কি না স্থির করিয়া পরে সমস্ত শরীর চালাইয়া দি এবং ঘরের মধ্যে যাইয়া অন্ধকারে দণ্ডায়মান হইলে উপরিস্থিত কোন দ্রব্য মাথায় ঠেকিয়া

* পাঠকগণের এই স্থানে স্মরণ রাখা উচিত যে আমার সহিত এই বেদিয়ার যখন কথাবার্ত্তা হইয়াছিল; তখন বিলাতি দিয়াসলাইয়ের প্রচলন হয় নাই।

আঘাত পাইবার এবং তাহাতে শব্দ হইবার আশঙ্কা থাকে, অতএব আমরা প্রথমে খাড়া হই না, বসিয়াই থাকি এবং সেই অবস্থায় দিয়াসলাই জ্বালি। সিন্ধের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বাহিরে চকমকি ঠুকিয়া একখানা কুল কাষ্ঠের কয়লা জ্বালিয়া হস্তে করিয়া তাহা ঘরের ভিতর আনয়ন করি। সিন্ধের বাহিরে থাকিয়াই গৃহস্থদিগের কথার শব্দে বিছানা সিন্ধের কোন্‌দিকে স্থিত তাহা বুঝিতে পারি এবং দিয়াসলাই জ্বালিয়া সেই অনুমানের বলে বিছানাব দিকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ছায়া করিয়া বাম হস্তে দিয়াসলাই ধরিয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এবং দিয়াসলাই খুব প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পূর্ব্বে ঘরের সমস্ত দিক নজর করিয়া কোন্ স্থানে কোন্ বাক্স সিন্দুক কিভাবে আছে, তাহা নির্ণয় করি। বিশেষ অনেকবার এইরূপ কার্য্য করিয়া তাহাতে আমাদের এমন দক্ষতা জন্মে, যে চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে আমরা সেই গন্ধকের টিপ্‌টিপনী আলোকের দ্বারা ঘরের সমগ্র অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারি। পরে দিয়াসলাই সম্পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পূর্ব্বে আমরা তাহা নির্ব্বাণ করিয়া ফেলি, এবং তাহার পরে আমাদের আর আলোকের আবশ্যক হয় না। অনেক স্ত্রীলোকের শয়নের পূর্ব্বে অঙ্গের গহনা খুলিয়া বিছানার নীচে রাখিবার অভ্যাস আছে এবং দুই এক সময় আমরা তাহা শব্দে বুঝিতেও পারি। সেই নিমিত্ত আমরা বিছানার নীচে অনুসন্ধান না করিয়া ঘর পরিত্যাগ করি না। মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকের অঙ্গ হইতে আমাদের অলঙ্কার খুলিয়া লইতে হয় কিন্তু তাহা করিতে যাইয়া আমরা নাসিকা কিম্বা কর্ণের অলঙ্কার কখনও স্পর্শ করি না, কারণ নিদ্রিত ব্যক্তির নাসিকা কিম্বা কর্ণ ছুঁইলে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। গলার, হাতের, কোমরের এবং পায়ের অলঙ্কার আমরা খুলিয়া কিম্বা কাটিয়া লইতে চেষ্টা করি। কিন্তু ইহা বড় কঠিন কার্য্য, বিশেষ পটুতা না জন্মিলে, সকল চোরে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে পারে না। শীতকালের

রাত্রিতে অঙ্গের গহনা খুলিয়া লইতে হইলে নিদ্রিত ব্যক্তির গাত্রে হাত দিবার অগ্রে আগুনের হাঁড়িতে আমাদের দুই হস্তই সেঁকিয়া গরম করিয়া লইতে হয়, কারণ তাহা না হইলে ঘুমন্ত স্ত্রীলোকের শরীরে ঠাণ্ডা হাত লাগিলে, তাহার জাগিবার সম্ভাবনা থাকে। বাক্স সিন্দুক বাহিরে আনিয়া ভাঙ্গি। মাল হস্তগত করা হইলেই বেদিয়া চোর গৃহ পরিত্যাগ করে না। রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া হাঁড়িতে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা আমরা আহার করি, কারণ তাহা না হইলে সেই রাত্রে আমাদের আর আহার জুটিবার উপায় থাকে না। আমরা আহার করিয়া সেই রসুইঘরে শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করি। ইহা আমাদের একটি নিয়ম। আমাদের বিশ্বাস যে এই কার্য্য না করিলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। মাল হস্তগত করিয়া তাহা দিবসের স্থিরীকৃত স্থানে লইয়া যাইয়া গোপন করিয়া রাখি। আমরা এক গ্রামে এক সময়ে কখনও দুই বাড়ীতে চুরি করি না, তবে সহর বাজার ব্যাপক স্থানে তাহা করিয়া থাকি। এইরূপ ৫।৭ গ্রামে কার্য্য করিয়া যদি আমাদের বিবেচনায় পর্য্যাপ্ত টাকার মাল সংগৃহীত হওয়া বোধ হয় তাহা হইলে আমরা ঝটিতি গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করি। বিদেশ হইতে চোরামাল লইয়া সহসা আমরা আমাদের গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করি না। গ্রামের বাহিরে কোন অপরিষ্কার স্থানে লুকাইয়া রাখি, পরে মহাজনকে তাহা দিবার সময় হইলে আমাদের স্ত্রীলোকেরা সেই লুক্কায়িত দ্রব্য সকল বাহির করিয়া লইয়া আইসে।"

বেদিয়ার উপরিউক্ত বিবরণ শেষ হইলে পরে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে "ধরা পরিলে তাহারা কি করে?" "কি আর করিব? মার খাই। প্রথমে যাহাদের বাটীতে চুরি করিতে যাই তাহারা এক পত্তন খুব মারে, পরে প্রতিবাসীরা আসে এবং ক্রমে গ্রামের সমস্ত লোকে আসিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা মারে, গালি দেয়, এবং কেহ বা গাত্রে থুথু এবং প্রস্রাব করিয়া দেয়। কোনও কোনও গ্রামে

অধিবাসীরা তাহাদের নিজের প্রহার প্রচুর শাস্তি বিবেচনা করে এবং থানায় চালান না করিয়া, অমনি ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু কেহ কেহ পুলিশে না দিয়া থাকিতে পারে না এবং তাহা হইলে আমাদের বিপদ। গ্রামবাসীরা চোরকে মারিলেও তাহাদের দয়ামায়া আছে কিন্তু পুলিশের ব্যাটাদের প্রাণে কিছুমাত্র দয়ামায়া নাই। কি প্রকারে একরার করাইবে কেবল তাহাই তাহাদের চেষ্টা এবং তাহা হইলেই তাহাদের খুব খোসনাম হয়।”

এই স্থানে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে “সে কখনও একরার করিয়াছে কি না?” উত্তর “হ্যাঁ এক ব্যাটা দারোগার কুহকে পড়িয়া আমি আমার জন্মের মধ্যে একবার একরার করিয়াছিলাম। এক চুরি মোকদ্দমায় আমাকে সন্দেহ করিয়া ধরে। চুরিটা আমিই করিয়াছিলাম এবং মালও অনেক টাকার বাহির করিয়াছিলাম, দারোগার মনে নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে আমিই চুরি করিয়াছি কিন্তু প্রথমে আমি কিছুতেই একরার করিলাম না। দারোগা তাহা দেখিয়া ৬।৭ জন চৌকীদারকে ডাকিয়া একটা গর্ত্ত খুঁড়িতে হুকুম দিয়া বলিল যে এ ব্যাটা ত দেখিতেছি একরার করিবে না, তবে ইহাকে গোর দিয়া প্রাণে মারিব। আমি এই কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিলাম, ভাবিলাম, যে কেবল ভয় দেখাইতেছে। কিন্তু সত্য সত্যই চৌকীদার ব্যাটারা দারোগার কথামতে একটা গভীর খাদ করিয়া আমাকে তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিতে আরম্ভ করিল। দারোগা কেবল ‘ফ্যাল মাটি, ফ্যাল মাটি’ বলিয়া হুকুম দেয়, আর চৌকীদারেরা আমার নাকে মুখে ঝুড়ি ঝুড়ি করিয়া, মাটি ফেলিতে থাকে। মাটি যতক্ষণ বুক পর্য্যন্ত ছিল ততক্ষণও আমার মনে কোন ভয় হয় নাই কিন্তু যখন দেখিলাম যে মাটি গলা ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে লাগিল এবং মাটি ফেলা ক্ষান্ত হয় না তখন আমি মনে করিলাম যে ব্যাটারা বুঝি যথার্থই আমাকে জীবন্ত গোর দিয়া মারিবে। কাজেই তখন আমি একরার করিয়া মালগুলি দারোগাকে

দেখাইয়া দিলাম এবং তিন বৎসর মেয়াদ খাটিলাম।” আমি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে খুব এক পেট আহার দিয়া বিদায় করিলাম। ইহারাই ব্যবসায়ী সিন্ধাল চোর। অন্যান্য অনেক হঠকারী সিন্ধাল চোর আছে বটে কিন্তু তাহারা কোন নিয়মমতে চুরি করে না। মনে যাহা আইসে তাহাই করে এবং তন্নিমিত্ত তাহারা সর্ব্বদাই ধরা পড়ে।

সাহেব চোর

বাঙ্গালীর ন্যায় সাহেবদিগের মধ্যেও চোরের অভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গালীতে এবং সাহেবে যেমন বলবীর্য্যে এবং বুদ্ধি-কৌশলে প্রভূত প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তেমন বাঙ্গালী এবং সাহেব চোরেও বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। বাঙ্গালীর মধ্যে প্রায়ই অতি হীনজাতীয় লোকে দস্যুবৃত্তি করে, কিন্তু সাহেবদিগের মধ্যে তাহা নহে। বাঙ্গালী চোর কদাচিৎ লেখাপড়া জানে। আমি দীর্ঘকাল পুলিশ আমলা ছিলাম এবং বহু চোর ডাকাত আমি দেখিয়াছি, কিন্তু এই শ্রেণীর লোক আমার এমন একজনও স্মরণ হয় না, যাহাকে নাম দস্তখত করিতে পারিতে কিম্বা অন্যরূপ লেখাপড়া জানিতে দেখিয়াছি। কিন্তু সাহেব চোর সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। আমি অবশ্যই বিলাত যাই নাই এবং সাহেবদিগের সহিত আমার এমন্ গতিবিধি কিম্বা সংসর্গ করা হয় নাই যদ্দারা সাহেবদিগের সকল বিষয়ে তাহাদের সাধারণ স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমি অভিমত প্রকাশ করিতে পারি, কিম্বা আমার অভিমত বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। কেবল আমি বলিয়া নহে আমার ন্যায় অনেক বঙ্গবাসীরই সাহেবদিগের ভিতরের কথা জানিবার একমাত্র উপায় তাহাদিগের নিজের লিখিত পুস্তক সকল। যে এক মুষ্টিভরা বাঙ্গালী ইংলণ্ডে যাইয়া সেই স্থানে বাস করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অবশ্যই প্রামাণ্য বটে—কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে বিলাত ফেরত বাবুরা অতি যুবা বয়সে কেবল বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। স্বীয় কার্য্যসাধনের নিমিত্ত দিবারাত্র ব্যস্ত ছিলেন। ইংলণ্ডের সমস্ত দৃশ্য দেখিতে কিম্বা

অধিবাসীদিগের সহিত সংসর্গ করিতে অতি অল্প সময় ব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন। পরীক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত বিলাত গিয়াছেন, যাহাতে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন তাহাতেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অহর্নিশি লিপ্ত ছিলেন এবং পরীক্ষা দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের ইংলণ্ডে বাসাবস্থায় তাঁহারা কেবল বিদ্যার্থী এবং পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত থাকিতেন। সজ্জন এবং সচ্চরিত্রান্বিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য রকমের ইংলণ্ডের অধিবাসীগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার আবশ্যক কিম্বা সাবকাশ হইত না। অতএব ইহাঁদের মনে ইংলণ্ডের কেবল ভাল ভিন্ন মন্দ চিত্র অঙ্কিত হয় নাই এবং তাঁহাদের বিশ্বাস যে তাঁহাদের অধ্যাপক এবং শিক্ষকদিগের ন্যায় এবং সেই সকল অধ্যাপক এবং শিক্ষকের স্ত্রী কন্যা ভগিনী প্রভৃতির ন্যায় ইংলণ্ডের সকল নরনারীই ধার্ম্মিক, নির্দ্দোষ এবং পবিত্র। সুতরাং আমাদের বিলাত যাত্রীদিগের মুখে শুনিতে হইলে, কেবল ইংলণ্ড নহে, সমুদায় ইউরোপ খণ্ডই পৃথিবীর স্বর্গীয় ভাগ বোধ হইবে। ফলকথা তাহা নহে ; দর্পণের যেমন একদিক উজ্জ্বল এবং আর একদিক মলিন থাকে, ইউরোপীয় সমাজেরও সেইরূপ দুই দিক আছে ; কিন্তু সেই বিভিন্নতা আমাদের স্বদেশের অবস্থা দৃষ্টে পরিমাণ করিতে পারা যায় না। আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ বলিয়া একটা কথা আছে বটে কিন্তু সেই প্রভেদ অনুযায়ী সাহেবদিগের ভাল মন্দের বিবেচনা করা অসাধ্য। ইউরোপ খণ্ডের ভাল মানুষেরা খুবই ভাল এবং মন্দ লোক এমনই মন্দ, যে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আকৃতি প্রকৃতি, ধন, বিদ্যা বুদ্ধি—প্রভৃতি সকল বিষয়ে এই বিভিন্নতার সীমা নাই। শুনিলে আমাদের স্তম্ভিত হইতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাহেবদিগের কথা জানিবার জন্য, তাঁহাদের পুস্তকই আমাদের প্রধান উপায়। তদ্ভিন্ন কলিকাতা নগরের রাস্তা-ঘাটে যে অল্পবিস্তর ইউরোপবাসীদিগকে আমরা দেখিতে পাই,

তাহাতেই আমরা বুঝিতে পারি, যে ইতর সাহেব এক ভয়ানক জীব। তথাপি ইহারা ইউরোপের ইতর লোকের যথার্থ আদর্শ নহে। ইহাদের অপেক্ষা যে আরও কত পরিমাণে অপকৃষ্ট মনুষ্য আছে, তাহা আমাদেব জানিবাব উপায় নাই; কেবল অনুমানেব উপব নির্ভর কবিয়া মনকে প্রবোধ দিতে হয়। তাই বলিতেছি যে বাঙ্গালী চোরেব সহিত সাহেব চোবের তুলনা হইতে পাবে না। আদৌ শাবীবিক বলবীর্য্য সম্বন্ধে সকল শ্রেণীরই বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীব সাহেবেবা যে আমাদিগের অপেক্ষা শত শত পবিমাণে উৎকৃষ্ট, তাহা আব এক্ষণে বাঙ্গালীদিগকে চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না। সকলে যাহা জানে তাহার পুনরুল্লেখ কবা কেবল সময় নষ্ট করা ভিন্ন নহে; তথাপি পাঠকবৃন্দেব মনোবঞ্জনেব নিমিত্ত আমি এই স্থানে একটি দৃষ্টান্ত বিবৃত করিব।

সাহেবদিগেব প্রথম আমলে যখন তাঁহাদেব লৌহ কিম্বা কলের জাহাজ সৃষ্টি হয় নাই, কেবল কাষ্ঠে জাহাজ নির্ম্মিত এবং বাতাসের দ্বারা চালিত হইত, তখন একখানা মানোয়ার অর্থাৎ যুদ্ধের জাহাজ বঙ্গসাগব হইতে কলিকাতায় আসিতে জোয়াবেব প্রতীক্ষা করিয়া সাগর দ্বীপের ধারে নোঙ্গর করিয়াছিল। জাহাজখানা বহু দিন ধরিয়া জলে জলে ভ্রমণ করিবার পরে ভূমির নিকট উপস্থিত হওয়াতে মনোয়ারের কয়েকজন নাবিক সুন্দরবনের মনোহর দৃশ্য দেখিয়া তাহাব মধ্যে যাইয়া ভ্রমণ করার নিমিত্ত কর্ত্তাসাহেবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল, তিনি তাহাদিগকে দুই ঘণ্টার বিদায় দিলেন। তদনুযায়ী ৭।৮ জন নাবিক একখানা ডিঙ্গি করিয়া দ্বীপের কূলে আসিল এবং সেই স্থানে এক বৃক্ষের সহিত নৌকাখানা বন্ধন করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। এখন অপেক্ষা তখন জঙ্গল অত্যন্ত গভীর ছিল। আবাদের জন্য মনুষ্যে হস্তক্ষেপণ করে নাই সুতরাং ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তু যে তাহাতে অধিক সংখ্যায় ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। লোকেরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ

করার পরে হঠাৎ এক ব্যাঘ্র তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। জন্মে তাহারা ব্যাঘ্র কিম্বা ব্যাঘ্রের চিত্র দেখে নাই, অতএব ইহা যে ব্যাঘ্র তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। জন্তুটা অতি সুন্দর দেখিয়া তাহা ধরিয়া জাহাজে লইয়া যাইতে ব্যস্ত হইল। ইতিমধ্যে ব্যাঘ্র নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করিল। লোকেরা নগ্ন-হস্তে জাহাজ হইতে আসিয়াছিল কোনও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আইসে নাই। জন্তুটা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল দেখিয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে কেবল মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা ব্যাঘ্রকে মারিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র তাহাদের সকলকে তাহার দন্ত ও নখ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিল, কিন্তু বীরপুরুষেরা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। কি প্রকারে জন্তুটা হস্তগত করিবে কেবল তাহার দিকেই তাহাদের লক্ষ্য। এইরূপে বহুক্ষণ ঘোরতর সংগ্রামের পরে নাবিকেরা কেবল শরীরের বলে এবং সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সেই সুন্দরবনের হুমা বাঘটাকে মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা বধ করিয়া ক'জনে তাহা কষ্টে তুলিয়া উল্লাসের সহিত হু-র-রা হু-র-রা দিতে দিতে জলের ধারে লইয়া উপস্থিত হইল। কর্ত্তা কাপ্তান সাহেব উহাদিগের সেই জয়ধ্বনি শুনিয়া দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেন, যে নাবিকেরা এক ব্যাঘ্র শিকার করিয়া আনিতেছে। তাহারা জাহাজে আরোহণ করিলে পর দেখিলেন যে সকলের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। কাপ্তেনকে সেলাম করিয়া তাহারা তাঁহাকে এই জন্তুটা উপঢৌকন দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে জন্তু তাহারা মারিয়া আনিয়াছে, তাহার নাম তাহারা জানে কি না? নাবিকেরা "না" বলিয়া উত্তর করাতে তিনি বলিলেন যে ইহাই ভারতবর্ষের ব্যাঘ্র। এই নাম উচ্চারিত হইবামাত্র তাহাদের সাহস অন্তর্হিত হইয়া ভয়ে শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। পরে কাপ্তান সাহেব ইহাদিগকে দুই তিন মাসের চিকিৎসায় আরোগ্য করিতে

সমর্থ হইয়াছিলেন। বলুন দেখি, ইহা কি মনুষ্যেব না অসুরের কার্য্য! মনুষ্যের হইলে বাঙ্গালী মনুষ্যের দ্বারা এই কার্য্য কখনও সম্ভব হয় না। যে বীর জাতি প্রথমে পলাশী, তৎপরে আসাই, তাহার পরে মহারাজপুর পণিয়ার, তৎপরে মূদকী, সোব্রায়ান ও গুজরাট যুদ্ধ-জয় করিয়া এবং অবশেষে বহুসংখ্যক বিদ্রোহী সিপাহী সৈন্য দমন কবিয়া এই বৃহৎ সাম্রাজ্য অপেক্ষাকৃত অতি অল্প সময়ের মধ্যে করতলস্থ করিয়াছে, ইহা তাহাদেরই কার্য্য, অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। এক একটা কীর্ত্তি শুনিলে মনুষ্য-জীবন ধন্য বলিয়া মনে উল্লাসের উদ্ভব হয়।

ভাল কথার কি আকর্ষণ দেখুন, কোন্ কথার প্রসঙ্গে আমি কি কথা বলিতে এত সময় ক্ষয় করিলাম। চোরের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া সাহেবদিগেব বলবীর্য্যের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক এইক্ষণে সাহেব চোর যে কত নির্দ্দয় এবং প্রাণ নষ্ট করিবার যে স্থলে কোনও আবশ্যক নাই, সে স্থলে তাহারা যে ঐরূপ কুকার্য্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না, তাহার এক দৃষ্টান্ত দেখাইব। রুসিয়া দেশেব এক গ্রামে এক গৃহে একটি পুরুষ ও তাহার স্ত্রী ও তাহাদের একটি যুবতী কন্যা বাস করিত। এক রুসিয়ার দৃষ্টান্তে ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপ খণ্ডেব প্রায় সকল দেশের নিম্নশ্রেণীর চরিত্র বুঝা যাইতে পারে, কারণ ইহাদের সকলের স্বভাবই এক ছাঁচে গঠিত বলিলে বলা যাইতে পারে। ঐ গৃহস্থ নিতান্ত দরিদ্র ছিল না, পরিশ্রম করিয়া যে কিছু উপার্জ্জন করিত তদ্দ্বারা তাহাদের সকলের সচ্ছন্দে দিনপাত হইত। গ্রামের কিঞ্চিৎ দূরে সপ্তাহের মধ্যে একদিন এক স্থানে এক হাট হইত এবং সপ্তাহের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার নিমিত্ত সেই গ্রামের অধিবাসীরা সেই হাটে যাইত। ইহারই এক হাটের দিন ঐ গৃহস্থের স্ত্রীপুরুষ দুইজনে তাহাদের কন্যাকে গৃহে রাখিয়া হাট করিতে গিয়াছিল। পিতামাতা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পরে কন্যা গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের

মধ্যে বসিয়া গৃহস্থালী এক কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। এই স্থানে বিবৃত করা আবশ্যক, যে গ্রামের অধিবাসীদিগের গৃহ সকল সহর কিম্বা নগরের গৃহের ন্যায় এক স্থানে সংলগ্ন ছিল না। গৃহ সমস্ত পরস্পর ব্যবধানে ছিল। কিন্তু এই গৃহস্থের গৃহখানা অন্যান্য গৃহ হইতে অধিক দূরে সংস্থাপিত ছিল। সুতরাং ইহাতে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা প্রতিবেশী সহজে দেখিতে কিম্বা জানিতে পারিত না। দ্বার বন্ধ করিবার কিছুকাল পরে কন্যা শুনিতে পাইল, যেন কে তাহাকে ডাকিয়া দ্বাব খুলিতে বলিতেছে। দ্বার মোচন করিবা-মাত্র একজন অপবিচিত কদাকার এবং মলিন ও ছিন্ন বস্ত্রধারী মনুষ্য কন্যাকে ঠেলিয়া বলপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং কন্যার হস্ত হইতে দ্বারের চাবি কাড়িয়া লইয়া পুনরায় দ্বারের তালা বন্ধ করিয়া চাবিটা আপনার পকেটের মধ্যে বাখিল এবং পোষাকের ভিতর হইতে একখানা লম্বা চক্‌চকে ছুরি বাহির করিয়া কন্যাকে দেখাইয়া বলিল, যে কন্যা তাহার কথার অবাধ্য হইয়া কার্য্য করিলে কিম্বা চীৎকার করিলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গে ছুরি বসাইয়া তাহাকে বধ করিয়া ফেলিবে। এই ব্যাপার দেখিয়া কন্যা যে ভয়ে স্তম্ভিত হইল, তাহা আর বলিতে হইবে না। সে নির্ব্বাক হইয়া এক স্থানে খাড়া হইয়া কাঁপিতে লাগিল এবং চোর ব্যাটা যাহা কিছু তাহাকে করিতে বলে, তাহাই সে কলের পুত্তলিকাব ন্যায় করিতে লাগিল। প্রথমে গৃহের মধ্যে যে সকল আহার্য্য বস্তু ছিল তাহা ঐ ব্যক্তি উদরস্থ করিল, পরে বাক্স সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকাকড়ি এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য যাহা পাইল, তাহা হস্তগত করিলে কন্যা বিবেচনা করিল, যে এখন সে চলিয়া যাইবে এবং তাহার নিস্তার হইবে, কিন্তু কন্যার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। দ্রব্য সকল হস্তগত করিয়া চোর কন্যার নিকট আসিয়া কহিল, যে কন্যাকে গৃহমধ্যে ছাড়িয়া দিয়া কিম্বা জীবিত রাখিয়া গেলে, গৃহস্বামী প্রত্যাগমন করিলে, সে তাহাকে সকল কথা বলিয়া দিবে এবং তাহা হইলে

পুলিশের অনুসন্ধান দ্বারা তাহাকে ধৃত করিয়া দণ্ডনীয় করিবে। এই স্থানে বলা আবশ্যক, যে রুসিয়ার পুলিশ বড় পরাক্রান্ত এবং চোর ধরিতে বড় মজবুত। তাহার উপরে চোরেব শাস্তি অতি ভয়ানক। ফাটক এবং নির্ব্বাসন ত আছেই, তদতিরিক্ত নাউট নামক এক ভয়ঙ্কব শাস্তি আছে। আমাদের বেত্রাঘাতেব স্থলে রুসিয়ার নাউট। উহা নাকি চর্ম্মেব এবং শোণ পাটের বজ্জু দ্বারা নিৰ্ম্মিত হয় এবং উহাব আঘাত এমনই বেদনাদায়ক যে রুসের ন্যায় বলবান মনুষ্যও ইহাব কয়েক আঘাতে মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। দস্যু বলিল যে "তোমাকে জীবিত রাখিয়া গেলে আমার নিশ্চয়ই নাউট খাইতে হইবে, অতএব তোমাকে মারিয়া যাইব ; তবে তুমি অতি নম্রভাবে আমাব আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছ, সেইজন্য তোমাব প্রতি আমাব দয়া হইয়াছে, তোমাকে অধিক কষ্ট দিব না। তুমি বল যে তুমি কোন্ প্রকারে মরিতে ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে সেই প্রকাবে মাবিব। তুমি শীঘ্র বল, বিলম্ব হইতেছে।" যুবতী ভূমিতে পডিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, কিন্তু সে পাপাত্মার কিছুতেই দয়া হইল না। অবশেষে সে বলিল যে, "বুঝিয়াছি যে তুমি ছুরির আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না, তোমাকে ফাঁসি দিয়া মারিব, তাহা হইলেই তোমার কম যন্ত্রণা হইবে।" এই বলিয়া সে একগাছা শোণের দড়ি সংগ্রহ করিয়া তাহার এক আগায় একটা ফাঁস করিয়া অপর আগা সেই ছুরির মধ্যস্থানে শক্ত করিয়া বান্ধিল। পরন্তু বসিবার একটা কাষ্ঠের টুল ঘরের মধ্যস্থলে আনিয়া মুদগরের ন্যায় আর একটা কাষ্ঠ লইয়া সেই টুলের উপরে দণ্ডায়মান হইল এবং সেই অবস্থায় মাথার উপরে দুই হস্ত প্রসাবণ করত মুদগরের দ্বারা আঘাত করিয়া ছাদের একটা কড়িকাষ্ঠের মধ্যে খুব জোরে সেই ছুরিখানা বসাইয়া দিল। ছুরির অর্দ্ধভাগের অধিক কড়িকাষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিল পরে তাহা শক্ত হইয়া বসিয়াছে কি না এবং তাহাতে এ কন্যার শরীরের ভার অনায়াসে ঝুলিতে পারিবে কি না, তাহার

পরীক্ষা কবার নিমিত্ত সে দড়ির ফাঁসটা তাহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যে গলাইয়া দিয়া সজোরে তাহা টানিয়া দেখিতে লাগিল। মনে করিয়াছিল, যে দড়িটা পরীক্ষায় টিকিলে সে ঐ মেয়েটিকে টুলের উপরে উঠাইয়া তাহার গলায় ফাঁসী দিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু ভগবানেব ইচ্ছায় বিপরীত ফল ঘটিয়া উঠিল। পবীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার পদতলেব টুলটা সবিয়া কিঞ্চিৎ দূরে ভূমিতে কাত হইয়া পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরও অবলম্বন অভাবে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে ভূমিতে পডিয়া যাইত, কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্তটা দড়িব ফাঁসের মধ্যে থাকাতে, হস্তখানায় ফাঁসী লাগিয়া, তাহার শবীর ঝুলিতে এবং নূতন দড়ির শক্ত পাক নিবন্ধন বন্ বন্ করিয়া ঘুবিতে লাগিল। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়াব নিমিত্ত দড়ি ছিঁড়িয়া ভূমিতে পডিতে অথবা পায়েব দ্বারা টুলটা টানিয়া পুনরায় পদতলে আনিতে সে চেষ্টা করিতে আরম্ভ কবিল। কিন্তু তাহার হিতে বিপবীত হইল। কারণ, সে যত অধিক বলপ্রয়োগ করিতে লাগিল, ততই দৃঢ়রূপে তাহাব হস্তের ফাঁস চর্ম্মের মধ্যে বসিতে লাগিল এবং কতক্ষণ পরে তাহাব পঞ্চ অঙ্গুলির মাথাতে রক্ত জমাতে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে সে তাহার আপন চেষ্টা নিস্ফল দেখিয়া যুবতীকে প্রথমে রূঢ় বাক্যে টুলখানা টানিয়া দিতে কহিল, ক্রমে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিল এবং অন্তে কাকুতি মিনতিও কবিল কিন্তু কিছুই হইল না। কারণ মেয়েটি তখনও স্পন্দহীন। তাহাকে বধ করিবে শুনিয়া তাহার প্রথম হইতেই জ্ঞান লোপ হইয়াছিল এবং এমনই তাহার হতবুদ্ধি হইয়াছিল যে যদিও এই দুরাত্ম'র সমস্ত কার্য্য তাহার চক্ষের উপরে নির্ব্বাহিত হইতেছিল, তথাপি সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। ভয়ে তাহার বাক্‌রোধ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। চোর ব্যাটার কাকুতি মিনতি তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশিয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহার কার্য্য করিবার কিম্বা কথা কহিবার শক্তি, কিছুমাত্র ছিল না। বোধ হয়, ইহা যুবতীর প্রাণ-

রক্ষার একটি মহত্নুপায় স্বরূপ হইয়াছিল কারণ যুবতীর কার্য্য করার৲ শক্তি থাকিলে সে নির্ব্বোধতা বশত কিম্বা ভয়ে, দুরাত্মার কথামতে তাহার পায়ের নিকট টুল আনিয়া দিত, আর চোর মুক্ত হইয়া তাহাকে বধ করিতে ছাড়িত না। সে যাহা হউক এইরূপে কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত হইলে পরে গৃহস্থেরা প্রত্যাগমন করিল এবং কন্যার কোন উত্তর না পাইয়া কবাট ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দুইজনের সে অবস্থা দেখিয়া অবাক হইল। পুলিশ কর্ম্মচারীরা দুর্ব্বৃত্তকে একজন পুরাতন বদমায়েস বলিয়া জানিতে পারিয়া দণ্ডের নিমিত্ত রাজদ্বারে অর্পণ করিল।

ইহা ত হইল ইউরোপের ঘটনা কিন্তু অদ্য ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কলিকাতা নগরে যে এক ঘটনা হইয়াছিল তাহাও কম লোমহর্ষণ কাণ্ড নহে। ইহা সকলেই জানেন ,যে কলে কৃত্রিম বরফ প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সাহেবদিগের বিলাস-ভোগের নিমিত্ত আমেরিকা খণ্ডের ক্যানেডা প্রদেশ হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া কলিকাতায় স্বাভাবিক বরফ আসিত এবং বার মাস সেই বরফ রক্ষা করিয়া রাখিবার জন্য এইক্ষণে যেস্থানে ছোট আদালতের নিমিত্ত নূতন প্রাসাদ হইয়াছে তাহার ঠিক পশ্চিম ধারে বরফ গুদাম নামে এক গৃহ নির্ম্মিত হয় এবং তাহাতে বরফগুদামের দুই একজন কর্ত্তা সাহেবও মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় একবার ববফগুদামে অনেক টাকা জমা হইয়াছিল। কি কারণে বলিতে পারি না, সেই টাকা ব্যাঙ্কে চালান করিতে কয়েক দিবস শৈথিল্য করা হয়। কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, কেবল একজন সাহেবের অসুস্থতা। সেই সাহেবটি বরফগুদামে বাস করিতেন, সেই স্থানে তাঁহার পীড়া হয়, এবং পীড়িতাবস্থায় সেইখানেই ছিলেন। পীড়া শীঘ্র আরাম না হওয়াতে একদিবস টাকাগুলি হঠাৎ ব্যাঙ্কে চালান করা হইল, তাহার পরদিবস প্রাতে সেই পীড়িত সাহেবের খানসামা সাহেবের৲

কামরায় যাইয়া দেখে যে সাহেবকে কে খুন করিয়া গিয়াছে, দেহটা পালঙ্গ হইতে নামাইয়া ঘরের কোণে চিত করিয়া রাখিয়াছে ; পালঙ্গের বিছানায় এবং ঘরের স্থানে স্থানে রক্তে আচ্ছাদিত। এই সংবাদ প্রচার হওয়া মাত্র, সাহেব মহলে খুব একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল এবং দোষী ব্যক্তিদিগকে আবিষ্কার করার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হইল। তখন লো সাহেব কলিকাতায় পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। প্রথম দিবস মৃত সাহেবের খানসামা খিদমদ্গার প্রভৃতি দেশীয় লোকের উপরে সন্দেহ হয় কিন্তু সকল অবস্থা অনুধাবন করিয়া দেখার পরে, এই কার্য্য যে কোন দেশীয় লোক দ্বারা হয় নাই, সাহেবের দ্বারা হইয়াছে, তাহাই স্থির হইল। কারণ মৃত শরীরের এবং কক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা দৃষ্টে সকলেরই প্রতীয়মান হইল যে বিনা যুদ্ধে হত্যাকারী ব্যক্তি হতার প্রাণ নষ্ট করিতে পারে নাই ববং বিলক্ষণ প্রমাণ দৃষ্ট হইল যে, মৃত সাহেবটি আপনার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপ সংগ্রাম সাহেবের সহিত বাঙ্গালীর সম্ভব পায় না অতএব পুলিশ কর্ম্মচারীরা দেশী ভৃত্যদিগের উপরে শোভা সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কোন্ সাহেব কর্ত্তৃক এই খুন হইল তাহার অনুধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেবকে কি কারণে বধ করা হইল, তাহারও কোন দ্রষ্টব্য কারণ বুঝিতে পারিল না ; কারণ খুনের সঙ্গে বরফগুদামে কোন দ্রব্য অপহৃত হয় নাই এবং সাহেবটিও বিলাত হইতে নবাগত, এবং তাঁহার সহিত কাহারও কোন বিবাদ বিসম্বাদ ছিল বলিয়া কেহ জানে না ; অতএব বিনা কারণে হঠাৎ এরূপ খুন হইতে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। কলিকাতার সাহেবমণ্ডলীর মধ্যে এই ব্যাপারে অত্যন্ত আশঙ্কা উপস্থিত হইল। প্রত্যেক সাহেবের মনে ভয় হইল যে এই নরঘাতক ধৃত না হইলে প্রশ্রয় পাইয়া পুনরায় আর একজনের প্রতিও ঐরূপ ব্যবহার করিবে। তখন বড়লাট সাহেবেরা বৎসরের অধিক ভাগই কলিকাতায় কাটাইতেন, সিমলা সবাটু কিম্বা

দারজিলিঙ্গের নাম কেহ জানিত না, জানিলেও ঐ সকলে যাওয়ার আবশুকতা বিলাসভোগী সাহেবদিগের মনে উদ্ভূত হয় নাই। আমার ঠিক স্মরণ নাই কিন্তু বোধ হয় মহা পরাক্রান্ত লর্ড ডেলহৌসীই সেই সময়ে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল ও বঙ্গদেশের গবর্ণর ছিলেন। বাঙ্গালায় লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের পদ সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বড়লাট বাঙ্গালারও ছোটলাট হইতেন এবং যদিও তাঁহার অধীনে বাঙ্গালার জন্য ডেপুটী গবর্ণর খ্যাতিতে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিল তথাপি প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা বেহার এবং উড়িষ্যার মূল শাসনভার বড়-লাটের উপরেই ন্যস্ত ছিল। গবর্ণর জেনেরেল এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ অবগত হইয়া মৃত সাহেবের প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কঠিন হুকুম প্রচার করিলেন যে কলিকাতার পুলিশ কর্ম্মচারীরা হত্যাকারী ব্যক্তিকে আবিষ্কার করিয়া দণ্ডনীয় করিতে অসমর্থ হইলে, তাহাদের সকলকে তিনি কর্ম্মচ্যুত কবিবেন। কলিকাতাব সাহেবমণ্ডলীর মধ্যেও এই বিষয় সম্বন্ধে যারপরনাই সহানুভূতি উদ্ভূত হইল এবং সাহেবেরা সকলে পুলিশের সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে এই সময় লো সাহেব কলিকাতার পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি ইত্যগ্রে শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখনও বোধ হয় কলিকাতায় নূতন পুলিশের সৃষ্টি হয় নাই, পুরাতন চৌকীদারী পুলিশ ছিল এবং নূতন পুলিশ হইয়া থাকিলেও তাহা অতি অল্পদিনের সৃষ্টি এবং বর্ত্তমানের ন্যায় তখন পৃথক পৃথক কার্য্যের জন্য পৃথক পৃথক রকমের সুশিক্ষিত অধিক সংখ্যার কর্ম্মচারী ছিল না সুতরাং এই হত্যাকাণ্ডের দণ্ডের গুরুতর ভার একমাত্র লো সাহেবের স্কন্ধেই পতিত হইয়াছিল। লো সাহেব বিবেচনা করিলেন যে বয়রুগুদামের সাহেবকে বধ করার কার্য্যে কোন ভদ্র সাহেবের যোগ থাকিলেও তাহার সহিত অবশ্যই দুই একজন ইতর গোরা লিপ্ত ছিল এবং বধের কার্য্যটা সেই ইতর

গোরা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, অতএব তাহাকে ধরিতে পারিলেই সমুদায় কথা প্রচারিত হইবে। তজ্জন্য যিনি লালবাজার, কসাইটোলা, চান্দনী প্রভৃতি যে সকল স্থানে জাহাজী এবং ইতর গোরাদিগের থাকিবার নিমিত্ত হোটেল এবং বাসা-বাড়ী সকল সংস্থাপিত আছে, তাহার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে গবর্ণমেণ্ট এবং বরফগুদামের কর্ত্তৃপক্ষরা যে ব্যক্তি এই বিষয়ের যথার্থ সংবাদ দিতে পারিবে তাহাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্থানে স্থানে ঘোষণাপত্র লটকাইয়া দিলেন। এইরূপ কয়েকদিন চেষ্টার পরে লো সাহেব একজন হোটেলওয়ালার নিকট কথায় কথায় শুনিতে পাইলেন যে হত্যাকাণ্ডের দুই-একদিবস পূর্ব্বে সে দুই-জন গোরাকে তাহার হোটেলের এক নির্জ্জন কোণে বসিয়া অনেক গোপনে পরামর্শ করিতে দেখিয়াছিল। কি কি বিষয়ে তাহারা পরামর্শ করিতেছিল, তাহা সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে নাই এবং জানেও না। উহার দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি তাহার হোটেলে বাস করিত, দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্য স্থানের অধিবাসী। তাহার হোটেলে যে ব্যক্তি বাস করিত, সে সেই দিবস ধরিয়া আমেরিকা যাত্রী এক জাহাজে নাবিকের কর্ম্ম লইয়া সেই জাহাজে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির সংবাদ অর্থাৎ সে কোন হোটেলে থাকে কিম্বা কি কার্য্য করে তাহা সে অবগত নহে। লো সাহেব এই সংবাদ পাইয়া অনেক সুসন্ধানের পরে এক ব্যক্তিকে সন্দেহ করিয়া ধৃত করেন এবং হোটেলওয়ালাও তাহাকে চিনিল। প্রথমে সে ইহার কিছুই জানে না বলিয়া প্রকাশ করে কিন্তু সাহেব বোধ হয় অগ্রে তাহাকে কিঞ্চিৎ যন্ত্রণা দিয়া পরে অনেক প্রলোভন দেখানতে সে স্বীকার করিল যে ঘটনার দুই তিন দিবস পূর্ব্বে বরফ ক্রয় করিতে যাইয়া বরফগুদামের ঘরে ঘরে বেড়াইয়া তাহাতে কয়েকটা লোহার সিন্দুক দেখিয়া তাহার মধ্যে তাহার অনেক টাকা থাকার বিষয় সন্দেহ হইয়াছিল। ইহা বলিবার আবশ্যক নাই, যে কলিকাতার সকল

স্থানেই কি ইতর কি ভদ্র সকল প্রকার সাহেবের অবাবিত দ্বার। প্রহরীরা অপরিচিত সাহেব দেখিলে কিছু বলে না সুতরাং তাহারা যেখানে ইচ্ছা পদার্পণ কবিতে পারে। এই সাহেব তাহার পরদিবস পুনরায় বরফগুদামে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া কত টাকা মজুদ আছে এবং কে কোন্ স্থানে শয়ন করে ইত্যাদি তাহার আবশ্যকীয় সমুদায় তথ্য অবগত হইল এবং টাকা অপহরণ করার মানসে ষড়যন্ত্র করিয়া একজন সজীব চেষ্টায় বাহির হইল। অবশেষ এস বেরী নামক এক আমেরিকান যুবক নাবিকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে বেরী তাহার সহকাবী হইতে সম্মত হইল। ইহাদের এক পরামর্শের সময় লো সাহেবেব সংবাদদাতা হোটেলওয়ালা তাহাদিগকে দেখিয়াছিল। পরদিবস প্রাতে পুনরায় সেই চোর বরফগুদামে যাইয়া টাকা পূর্ব্ববৎ সেই স্থানে থাকিতে দেখিয়া আইসে। সন্ধ্যার সময় বেবীর সহিত একত্র হইয়া দুইজনে অধিক রাত্রে জানালা দিয়া ববফগুদামের ভিতর প্রবেশ কবে। প্রধান ব্যক্তির নিকট তালা কুলুপ খুলিবার ইস্পাতেব শলাকা ও দ্বাব ও জানালা ভাঙ্গিবার করাত ও রেতী ও দুইজনের কোমরে নাবিকেব ছুরি ভিন্ন আর কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহাবা যাহা দেখিল তাহাতে তাহারা অত্যন্ত নৈরাশ হইল। কারণ দেখিল যে প্রাতে যে যে স্থানে সিন্দুক ছিল সেখানে তাহা নাই বারান্দায় খোলা পডিয়া রহিয়াছে, ইহাতে তাহারা অনুভব করিল, যে মুদ্রা সকল দিনের মধ্যেই স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এইরূপ নিরাশ্বাস হইয়া প্রধান চোর বেরীর হাত ধবিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল কিন্তু বেরী তাহা না শুনিয়া যে ঘরে সাহেবটি শয়ন করিয়াছিল তাহাতে প্রবেশ কবিল দেখিয়া সে বাহিরে দাঁড়াইয়া বেরীর প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। বেরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে পরে ঐ ব্যক্তি বাহির হইতে শুনিতে পাইল যেন ঘরের ভিতরে কেহ হাতাহাতি করিতেছে কিন্তু কি হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিল না এবং ঘরে

প্রবেশ করিতেও সাহস করিল না। কিয়ৎকাল পরে বেরী ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে অতি ব্যস্ত ভাবে বাহিরে আসিয়া তাহার সঙ্গীকে "চল" বলিয়া সম্বোধন করিল। সঙ্গী দেখিল যে বেরী উন্মাদের প্রায় হইয়াছে; সে বেরীর হস্ত ধরিতে তাহা সিক্ত বোধ হওয়াতে মনে করিল যে শরীরের ঘর্ম্ম দ্বারা তাহার বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বরফগুদাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পরে পথের প্রদীপে আলোতে দেখিল যে বেরীর পোষাক ও শরীর রক্তে রক্তময়। বেরীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কহিল যে সে ঐ ব্যাটাকে খুন করিয়া আসিয়াছে এবং শীঘ্র নদীতে যাইয়া রক্ত ধুইয়া ফেলিতে চাহিল। যদিও সে স্থান হইতে নদী অনতিদূর ছিল তথাপি নদীধারের রাস্তায় বহু দেশী এবং সাহেব প্রহরী থাকে বিশেষ গোরা নাবিকেরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেই রাস্তা দিয়া গতিবিধি করে অধিকন্তু ঘাটে ঘাটে সহস্রাধিক দেশী নৌকা ও জাহাজ লাগান আছে জানিয়া সেই অবস্থায় তাহাকে লইয়া নদীধারে রাস্তায় যাওয়া বিঘ্ন বোধ করিলাম। অতএব তাহাকে লালদীঘির মধ্য দিয়া পরে মেঙ্গো লেন প্রভৃতি ছোট ছোট গলি অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মতলার পশ্চিম দিকে এক জলের প্রণালীর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং প্রণালীর মধ্যে বেরীর শরীর ও বস্ত্র ধৌত করিয়া তাহার রুমাল যাহাতে অত্যন্ত রক্ত লাগিয়াছিল তদ্দ্বারা তাহার ছুরিখানা বেষ্টন করিয়া প্রণালীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। তদনন্তর বেরী সেই আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া সঙ্গীর সহিত বিদায় হইয়া জাহাজে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পরে বেরীর সহিত তাহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই, শুনিয়াছে যে বেরীর জাহাজ তাহার পরদিবসেই পারমিট মুক্ত লইয়া কলিকাতা বন্দর হইতে রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। লো সাহেব ঐ ব্যক্তির কথা পরীক্ষা করার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া সেই প্রণালী অন্বেষণ করিলেন এবং তাহার মধ্যে বেরীর ছুরি ও রুমাল প্রাপ্ত হইলেন। অতএব তাহার কথার প্রতি আর কোন সন্দেহ না

থাকাতে তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে তাহার দুই দিবস পূর্ব্বে একখানা জাহাজ খুলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা এখনও ডায়মণ্ডহারবার পার হইয়া সমুদ্রে যায় নাই।

বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের পূর্ব্বে যে প্রকার টেলিগ্রাফ ছিল, তাহা কি আমার যুবা পাঠকগণ অবগত আছেন ? তাহা সাহেবেরা সিমাফোর টেলিগ্রাফ বলিয়া অভিহিত করিতেন। স্থানে স্থানে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবধানে একটা উচ্চস্তম্ভের উপরে একটা দীর্ঘ কাষ্ঠের মাস্তুলের গাত্রে ছিদ্র করিয়া কয়েকখানা তক্তা এমনভাবে লাগান থাকিত যে তাহা স্তম্ভের মধ্য হইতে দড়ি দ্বারা টানিলে মাস্তুলের উভয় ধারে ঐ সকল তক্তা উঠিত ও নামিত এবং সেই তক্তাগুলির উঠা নামার পরিমাণেই কথার এবং অক্ষরের ইঙ্গিত হইত। ইহার একটি কলিকাতায় একশ্চেঞ্জে ঘরের ছাদের উপরে, দ্বিতীয়টি কেল্লার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে স্তম্ভের উপর হইতে গোলা পড়িলে এইক্ষণে দুই প্রহর এক ঘণ্টার তোপধ্বনি হয় সেই স্তম্ভের উপরে এবং ঐরূপ ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে ডায়মণ্ড-হারবার পর্য্যন্ত কতকগুলি স্তম্ভ ছিল এবং উহাদের দ্বারাই তখন জাহাজের সংবাদ আসিত এবং যাইত। এই টেলিগ্রাফে দিবস ভিন্ন রাত্রে কোন কার্য্য হইত না এবং এখন যেমন ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের দ্বারা চক্ষের পলক মধ্যে সহস্র ক্রোশ হইতে সংবাদ আইসে তখন তাহা হইত না। কলাগাছিয়া হইতে কলিকাতায় পুরাতন টেলিগ্রাফের দ্বারা সংবাদ আসিতে অন্তত তিন চারি ঘণ্টার কমে হইত না। কিন্তু এত বিলম্ব হইলেও সেই ধীরগতি টেলিগ্রাফের দ্বারা অনেক উপকার হইত। বেরীর জাহাজ কলাগাছিয়া পার হইয়া যায় নাই শুনিয়া লো সাহেব সেই স্থানে তিনি না পৌঁছিলে জাহাজ সমুদ্রে যাইতে না পারে এবং জাহাজ হইতে কোন নাবিক তীরে আসিতে না পারে তদ্বিষয়ে ডায়মণ্ড হারবারের জল পুলিশের কর্ত্তা সাহেবের নিকট টেলিগ্রাফের সংবাদ

পাঠাইয়া নিজে তাঁহার সংবাদদাতা চোর ও কয়েকজন সাহেব পুলিশ কর্ম্মচারীর সমভিব্যাহারে এক দ্রুতগামী নৌকায় বেরীকে ধরিবার নিমিত্ত ডায়মণ্ডহারবার মুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে তাঁহার নৌকা জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলে, জাহাজের সমুদায় নাবিক কি জন্য পুলিশের নৌকা জাহাজে আসিতেছে তাহার কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত জাহাজের ধারে আসিয়া খাড়া হইল কিন্তু বেরীই বুঝিতে পারিল যে তাহার অদৃষ্টে আগুন লাগিয়াছে ; অতএব সে অন্যান্য নাবিকেব ন্যায় জাহাজের ধাবে না আসিয়া গুপ্তভাবে জাহাজেব পিছাড়ার কাছি অবলম্বন কবিয়া হাইলের পার্শ্বে নামিয়া সেই স্থানে সমস্ত শবীব ডুবাইয়া কেবল মাথাটা জাগাইয়া রহিল ; ভাবিল যে কেহ আব সেইখানে তাহাকে অন্বেষণ করিবে না। কিন্তু পুলিশের কর্ম্মচারীরা জাহাজের কাপ্তেন সাহেবের সাহায্যে তাহাকে তাহাব গুপ্ত স্থানে আবিষ্কাব করিয়া জল হইতে টানিয়া তুলিল এবং তাহার সঙ্গী লোক তাহাকে তৎক্ষণাৎ বেরী বলিয়া সনাক্ত করাতে লো সাহেব তাহাকে হাতকড়ি দিতে উদ্যত হইলে সে তাচ্ছিল্যভাবে বলিয়া উঠিল যে "অনর্থক কেন কষ্ট পাও, আমি খুন করিয়াছি, ইচ্ছা কবিলে আমায় * * * ফাঁসী দিয়া আমাকে ঝুলাইতে পার, "Now hang me by my * * * !" তদনন্তর কলিকাতায় আনীত হইলে সে প্রধান মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে যে একরার করিয়াছিল তাহার স্থূল মর্ম্ম আমার এইরূপ স্মরণ হইতেছে। "আমি আমেবিকার দেশের এক ভদ্রলোকের সন্তান, আমার বয়স ২০ বৎসরের অধিক নহে কিন্তু স্বদেশে নরহত্যা ও চুরি প্রভৃতি কুকার্য্য করায় আমার পিতা-মাতার ও পুলিশের দৌরাত্ম্যে আমি এক জাহাজের নাবিক হইয়া ভারতবর্ষে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলাম। পরন্তু এখানে আমার চিত্ত স্থির না হওয়াতে অন্য স্থানে যাইয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করার নিমিত্ত পুনরায় এক জাহাজের নাবিক হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে জাহাজ খুলিবার অল্পকাল

পূর্ব্বে এই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বরফগুদামে চুরি করিলে অনেক টাকা পাইবার প্রলোভন দেখাইয়া আমাকে সেই কার্য্য করিতে সম্মত করে। বহু ধনের কথা কথা শুনিয়া আমার আশা হইয়াছিল যে তাহা হস্তগত করিতে পারিলে, আমি পুনবায় স্বদেশে যাইয়া আমার পিতামাতার স্বাধীন হইয়া সচ্ছন্দে থাকিতে পারিব এবং যেহেতু জাহাজও শীঘ্র কলিকাতা হইতে খুলিয়া যাইবে অতএব চুরির পরে কলিকাতার পুলিশও আমাকে ধরিতে পারিবে না। এই সকল কথা ভাবিয়া আমার মনে অত্যান্ত সুখের আশা হইয়াছিল অতএব যখন বরফগুদামের সকল ঘর অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম যে কিছুই পাইলাম না, তখন নৈরাশে আমার অত্যগু ক্রোধ উপস্থিত হইল। একবার ভাবিলাম যে আমার সঙ্গীকে হত্যা কবি কিন্তু পরক্ষণে একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলাম এবং খাটের উপরে একজন পুরুষ শয়ন করিয়া আছে দেখিয়া তাহার মশারি উঠাইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে এক চপেটাঘাত করিলাম। কি কারণে আমি ঐরূপ কার্য্য করিলাম তাহা আমি এখনও আপনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু মানুষ দেখিয়া তাহাকে আমার মারিতে ইচ্ছা হইল এবং আমি সেই বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার শরীরে হস্তক্ষেপ করিলাম। কিন্তু সেই পুরুষটি পীড়িত হইলেও তাহার স্নায়ুতে এঙ্‌লো স্যাকসন জাতীয় শোণিত বহিতেছিল, অতএব আমার আঘাত প্রাপ্ত হইবামাত্র সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া আমাকে ধরিতে চেষ্টা করাতে আমি আমার ছুরির দ্বারা তাহাকে সাঙ্ঘাতিক কয়েকটা আঘাত করিলে সে শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি বোধ করি যে পীড়ার গতিক তাহার কায়িক দুর্ব্বলতা না থাকিলে আমি তাহাকে পরাজয় করিতে পাবিতাম না। সে যাহা হউক খাটের উপর অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল দেখিয়া আমি তাহাকে নামাইয়া ঘরের এক কোণে রাখিলাম এবং যাহাতে পুনরায় জীবন প্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য

আরও দুই এক ছুরির আঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করিলাম। তদনন্তর যে যে কার্য্য করিয়াছিলাম তাহা আমার সহকারীর বর্ণনাতেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং তদ্বিষয়ে আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই। মোটকথা এই যে আমার সঙ্গী এই হত্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দোষী।" লো সাহেবের খুব প্রশংসা ও পদবৃদ্ধি এবং বেরীর ফাঁসীর হুকুম হইল। কিন্তু মনুষ্যের হৃদয়ের এমনই গতি যে বেরীর অল্প বয়স দেখিয়া এবং বোধহয় বাঙ্গালীর সম্মুখে একজন সাহেবের ফাঁসীর হুকুম প্রচারিত হওয়ার ভয়ে কলিকাতার বহুতর পাদ্রী ও সাহেবেরা একত্র হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে কিম্বা ফাঁসীর পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ রাখিতে লাটসাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই দুরাচার নরঘাতকের প্রতি অন্যায় সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া সুপ্রিম কোর্টের দণ্ডভোগের প্রতি হস্তক্ষেপণ করিলেন না। বেরীর কলিকাতায় ফাঁসী হইল।